মহামানব মহাত্মা গান্ধী

গান্ধীজীর জীবন-ভাষ্য

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় : শ্রীসুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়

সরস্বতী বুক ডিপো, ৮১, সিমলা স্ট্রীট : কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ : অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৫৫

প্রকাশ করেছেন
সরস্বতী বুক ডিপোর পক্ষে
শ্রীসৌমেন্দ্রকুমার মণ্ডল
৮১নং সিমলা ষ্ট্রীট থেকে

*

ছেপেছেন
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র ঘোষ
৮১নং সিমলা ষ্ট্রীট্
শ্রীলক্ষ্মী প্রেস থেকে

*

মলাট এঁকেছেন
শ্রীতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

*

প্রুফ্ দেখেছেন
শ্রীশিশিরকুমার পাল (রিডার
থ্যাকার্স্ প্রেস
এণ্ড ডাইরেক্টরিজ্ লিমিটেড

*

ছবির ব্লক তৈরী করেছেন
ন্যাশনাল হাফটোন কোং
৬৮নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট্ থেকে

*

ছবি ছেপেছেন
নিউ গয়া আর্ট প্রেস
৫০/সি, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট্ থেকে

*

কাগজ সরবরাহ করেছেন
শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত
পি. সি. মিত্র এণ্ড্ কোম্পানী থেকে

শ্রদ্ধা-তর্পণ

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

যে সূর্য্য আমাদিগকে তাপ দিয়াছে, আমাদের জীবনকে গৌরব-দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা আজ অস্তমিত। অন্ধকারে আমরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু উহা তাঁহার কাম্য ছিল না। অন্তরলোকে দৃষ্টিপাত করিয়া আজও দেখিতে পাইতেছি, তিনি যে দীপশিখা জ্বালিয়া গিয়াছেন, তাহা অনির্ব্বাপিত রহিয়াছে। এই দীপশিখা আমাদের দেশের অন্ধকার দূর করিবে। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি লইয়াই আমরা তাঁহাকে স্মরণ করিব, তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিব এবং তিনি যে আলোক-বর্ত্তিকা রাখিয়া গিয়াছেন উহারই সাহায্যে সমগ্র দেশকে পুনরায় আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিব।

—জয়হিন্দ্—

ভূমিকা

ঊনআশী বছর আগে পোর-বন্দরে যে শিশু একদিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কত সাধনা, কত ত্যাগ, কত সংগ্রাম ও পরীক্ষার ভিতর দিয়া সেই মানবাঙ্কুরটি ক্রমশঃ বিরাট মহত্ব লাভ করিয়া বিশ্বের 'মহাত্মা'-রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন, সে কাহিনী উপন্যাসের মত রোমাঞ্চকর, মহাকাব্যের মত বিরাট ব্যাপক ও ধীরোদাত্ত-গুণসম্পন্ন। সেই মহামানব মহাত্মা গান্ধীর বিপুল আত্মার বিকাশ-কাহিনী বর্ণনাই আমাদের এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সেই বিরাট পুরুষের জীবনারম্ভকাল হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার জীবনাবসানের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী পর্য্যন্ত সকল ঘটনাই এই গ্রন্থে আমরা সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

মহাত্মাজীর জীবন হিমালযের মত বিরাট বিশাল, তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল সমুদ্রের মত অসীমতাব্যঞ্জক। কেহ যদি হিমালযের পাদদেশে দাঁড়াইয়া তাহার ধ্যানগম্ভীর রূপ প্রত্যক্ষ করেন—কেহ যদি সমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়া তাহার অসীম বিস্তার লক্ষ্য করেন, তবে তিনি যেমন বিস্ময়মূঢ় হইযা যান, মহাত্মাজীর জীবনকাহিনী অনুশীলন করিলেও তিনি সেইরূপ বিস্ময়মুগ্ধচিত্ত হইয়া যাইবেন। সত্য শিব ও সুন্দরের মর্য্যাদারক্ষাই ছিল তাঁহার আজীবনের সাধনা। অসত্যের মধ্য হইতে সত্যকে, অমঙ্গলের মধ্য হইতে মঙ্গলকে, অসুন্দরের মধ্য হইতে সুন্দরকে আবিষ্কার ও তাহার প্রতিষ্ঠাই ছিল গান্ধীজীর আজীবনের সাধনা। এই সাধনায তাঁহার মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাস পুরাণ ও মহাকাব্যের বিরাট পুরুষসকলের জীবনলীলার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে আমরা দেখিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের মত তিনি একটি ঐক্যবদ্ধ হিংসাদ্বেষহীন 'মহা-ভারত' স্থাপনা করিতে চাহিয়াছিলেন, দধীচির মত পরার্থে তিনি জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, নীলকণ্ঠের মত পৃথিবীর সমস্ত গরলটুকু নিঃশেষে পান করিয়া মানব-সভ্যতার অমৃতরূপ ফুটাইয়া তুলিবার ঐকান্তিক সাধনা তিনি করিয়া গিয়াছেন, উপনিষদের নাচিকেতার মত সত্য ও অমৃতের সন্ধানে মৃত্যুলোকে বারংবার অভিযান তিনি করিয়া গিয়াছেন। যীশুর মত প্রীতি ক্ষমা ও নম্রতার বাণী

প্রচার করিয়া তিনি ভারতের কত পল্লী-পরিক্রমা করিয়াছেন, আঘাতকারীকে ক্ষমা করিয়া তাহার শুভবুদ্ধি ও মনুষ্যত্ববোধকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। বুদ্ধের মত অবিচলিত নিষ্ঠায় অহিংসার বাণী, মৈত্রীর বাণী তিনি প্রচার করিয়াছেন। এইরূপ এক মহামানবের জীবনী ও তাঁহার মতবাদের সহিত স্পষ্ট এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটাইয়া দেওয়া এক দুরূহ ব্রত। আমরা সেই দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপনে ব্রতী হইয়াছি। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

ভারতের ইতিহাসে মহাত্মাজীর আবির্ভাব এক যুগান্তরকারী বৈপ্লবিক ঘটনা। ভারতের জাতীয়তাবোধের ইতিহাসে তাঁহার প্রভাব নানাভাবে বিস্তৃত হইয়াছে। দেশে আত্মসম্মানবোধের উন্মেষ, ভারতীয়দের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা এ সকলই মহাত্মাজীর জীবনব্যাপী সাধনার অবশ্যম্ভাবী ফল। আমাদের ভারতভূমির মত এই অচলায়তনের দেশে তিনি অন্যায় অসত্য অধর্ম্ম হইতে মুক্তির সাগবকল্লোল তুলিয়া গিয়াছেন। আজ ভারতের যে শক্তির স্ফুরণ হইয়াছে, কর্ম্মে ও চিন্তায়, দেশাত্মবোধে রাজনীতিক্ষেত্রে—সে সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে মহাত্মা গান্ধীকে জানিতে হয়। বর্ত্তমান ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসের সহিত মহাত্মা গান্ধীর জীবনব্যাপী সাধনা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং সেই মহামানবের আকুতি ও উৎকণ্ঠা, রাজনৈতিক আদর্শ, আত্মপ্রত্যয়, ব্যক্তিগত অনুরাগ-বিরাগ বাসনা-কল্পনা সে সমস্তই জানা প্রয়োজন। তাঁহাকে জানার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভারতের জাতীয়তা-বোধের ইতিহাসও জানিতে পারিব।

তাঁহার জীবনকালে নানাবিধ সংশয়-সঙ্কটের মধ্যে ভারতবাসী তাঁহার প্রতি অটুট বিশ্বাসে চাহিয়াছে ; সঙ্কটকালে নির্দ্দেশ পাইবে বলিয়া জানিয়াছে এবং পাইয়াছেও। সঙ্কট-সংশয়ের মুহূর্ত্তে সর্ব্বদাই তিনি ভারতীয়দিগকে শুভ পথে পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন। আজ তাঁহার অবর্ত্তমানে আমরা নিরুৎসাহ বা হতোদ্যম হইব না। যে আলোক তিনি বিকীরণ করিয়া গিয়াছেন তাহারই আলোকে আমরা ভবিষ্যৎদিনের সঙ্কট-মুহূর্ত্তে আমাদের পথ দেখিয়া লইব, কর্ত্তব্য নিরূপণ করিব। জীবনকালে তিনি অনেক বাণী

প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবনে তাঁহার বাণীসকল মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার জীবনী অনুশীলন করিয়া আমরা তাঁহার আদর্শে গড়িয়া তুলিব ভবিষ্যৎযুগের ভারতবর্ষকে। তাঁহার সত্য ও অহিংসার আদর্শের মধ্যে যে অসীম শক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল তাহাই ভবিষ্যৎযুগের ভারতবর্ষকে পথ দেখাইবে, শক্তি জোগাইবে।

এই গ্রন্থরচনায় আমরা নিম্নলিখিত গ্রন্থসকল ও পত্রিকাসমূহের সাহায্য গ্রহণ করিয়া এই মহামানবের জীবনী রচনার উপকরণ সংগ্রহ করিযাছি। সেইজন্য কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করিতেছি :—

গান্ধীজীর আত্মকথা—দুইখণ্ড—(খাদি-প্রতিষ্ঠান), দক্ষিণ-আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ—সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, Discovery of India—জহরলাল নেহেরু, History of the Congress—Dr. P. Sitaramiya, চম্পারণ সত্যাগ্রহ—সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, মহাত্মা গান্ধী—রোমা রোলাঁ, হরিজন পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা, মুক্তির সন্ধানে ভারত—যোগেশচন্দ্র বাগল, আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃতবাজার প্রভৃতি পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাসমূহ, দেশ (গান্ধী-সংখ্যা), নোয়াখালিতে মহাত্মা—শ্রীসুকুমার রায়, শান্তি-অভিযানে—শ্রীগোপাল রায়, ভারতের মুক্তি সংগ্রাম—অনাদি পাল, বিলাতের বক্তৃতাবলী—হেমেন্দ্রকুমার রায, সিংহলে গান্ধীজী, Gandhiji—C. F. Andrews, Early Life of Gandhiji—M. Desai, প্রভৃতি।

এই গ্রন্থের মধ্যে মুদ্রিত দুইখানি ছবির ব্লক শ্রদ্ধাভাজন ভারতবর্ষ-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ও প্রীতিভাজন বন্ধু ও সুলেখক সাংবাদিক শ্রীগোপাল রাযের সৌজন্যে লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের প্রতি এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ পরিতৃপ্ত হইলে আমরা আমাদের সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

গ্রন্থকারদ্বয়

সূচীপত্র

'তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর,
নাহি কোন মানা নাহি কোন ভয়।'

রবীন্দ্রনাথ

এক

বংশ-পরিচয় ও শুভজন্ম

১৯২৫ সম্বৎ ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষের বারই তারিখে, ইংরাজী ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর কাথিযাওয়াড় রাজ্যের পোরবন্দর সহরে গান্ধী পরিবারে করমচাঁদ গান্ধীর সংসারে তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেন।

জন্মলগ্নে মঙ্গল-শঙ্খ বাজিল,…পরিজনগণ শিশুকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, ভাইযেরা কৌতূহলী হৃদয়ে দুই-একবার বাহির হইতে ঘরের ভিতর উঁকি-ঝুঁকি দিলেন, পিতা কাবা গান্ধী (উহা করমচাঁদ..গান্ধীর ডাক নাম ছিল) শুনিয়া প্রীত হইলেন।

দূর দেশের আত্মীয়স্বজনগণও যথাসময়ে শুভ-সংবাদ পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

কিন্তু তাঁহাদের আনন্দ ও প্রীতি নিতান্ত ব্যক্তিগত ও নিজস্ব,…তাঁহারা যদি সেদিন জানিতেন, এই শিশুটিই একদিন পূর্ণ অবয়ব লইয়া অহিংসা ও প্রেমের পূর্ণ শক্তিতে সমগ্র বিশ্ববাসীর অন্তরকে প্রীত ও সন্তুষ্ট করিবেন, তাহা হইলে তাঁহারা সেদিন শুধু আনন্দ নয়, আনন্দের সঙ্গে গর্ব্বও অনুভব করিতেন,……তৃপ্তি অনুভব করিতেন! কিন্তু তাঁহারা জানিবেনই বা কেমন

করিয়া ! মানুষের মধ্যে যখন কোন মহামানব বা মহাত্মা আসেন, তাঁহারা তো স্বাভাবিক জাগতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই আগমন করেন।

তবে সেদিন তাঁহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহারা না পাইলেও আমরা জানি এই নবজাত শিশুই আজিকার বিশ্ববিশ্রুত শান্তির অগ্রদূত মহামানব মহাত্মা গান্ধী !

অন্যান্য মহাপুরুষ বা বিখ্যাত ব্যক্তিবিশেষের জন্মসময়ে বা তাহার পরে যে সব অলৌকিক বা আশ্চর্য্য ঘটনার দুই-একটির সমাবেশ ঘটে, মোহনদাস গান্ধীর বেলায় কিন্তু সেই রকম কিছুই ঘটে নাই। তাঁহার শিশুকাল এমন কি যৌবন পর্য্যন্ত তিনি সাধারণ মানুষের মতই কাটাইয়া দিয়াছেন। তবে এক্ষেত্রেও রীতির ব্যতিক্রম ঘটে নাই। অলৌকিকত্ব বা আশ্চর্য্য ঘটনা তাঁহার বাহ্যিক জীবনে না ঘটিলেও, তাঁহার মানসিক জীবনে, তাঁহার বিকাশোন্মুখ মনে লোকচক্ষুর অন্তরালে যে সব নব নব চিন্তা, আলো ও আদর্শ জাগিযাছিল, তাহা সর্ব্বযুগের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধীর জীবনেই কেবলমাত্র সম্ভব ছিল।

কিন্তু তাঁহার পরিচয় জানিতে হইলে তাঁহার বংশের পরিচয়ও জানা দরকার।

খৃষ্ট জন্মিয়াছিলেন শান্ত, ধীর-স্থির পশুপালকের গৃহে,····· সংসারে তাঁহাদের পরিচয় দিবার মত বিশেষ কিছুই ছিল না, কিন্তু অন্তরে তাঁহারা পবিত্র ও নির্ম্মল······অন্তরের বিশেষত্ব জানিয়াই মহামতি ত্রাণকর্ত্তা দীন পশুপালকের বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণ জন্মিয়াছিলেন কারারুদ্ধ নিপীড়িত ও অবজ্ঞাত বসুদেবের গৃহে, পরিচয় দিবার মত কিছু বিশেষত্ব থাকিলেও সেই বিশেষত্ব অত্যাচারী কংসের অত্যাচারে ধূলিতে অবলুণ্ঠিত।······

কিন্তু বাহ্যিক পরিচয়ের তলায়······তাঁহারা ছিলেন ধৈর্য্যশীল ও ভক্তিপরায়ণ, ······হৃদয়ের ধৈর্য্য ও ভক্তির ফল্গুধারাকে সার্থক করিবার জন্যই শ্রীভগবান বন্দীর ব্যথিত সংসারে আগমন করিয়াছিলেন।

মহামানব মহাত্মার জন্মগ্রহণের মধ্যেও এই বিচিত্র যোগাযোগের ব্যতিক্রম হয় নাই।

গান্ধীজীর পিতামহ ছিলেন উত্তমচাঁদ গান্ধী, তাঁহার চলিত নাম ছিল উতা গান্ধী।

গান্ধী শব্দের অর্থ মুদী*। গান্ধী পরিবার বা বংশও জাতিতে বণিক ছিলেন। কিন্তু মহাত্মার পূর্ব্বপুরুষগণ স্বজাতীয় পেশা অবলম্বন করেন নাই। উতা গান্ধী হইতে তাঁহার উর্দ্ধে দুই পুরুষ কাথিয়াওয়াড় রাজ্যের পোরবন্দরের দেওয়ানী বা প্রধান মন্ত্রীত্ব করিয়াছিলেন। এই বৈশ্য বংশটি বৈশ্যোচিত স্বভাবের পরিবর্ত্তে ক্ষাত্রোচিত গুণগুলিই যেন বিশেষ ভাবে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ছিলেন শাসনদক্ষ, নির্ভীক ধর্ম্মভীরু আর দানশীল। আর আশ্চর্য্যের কথা, পুরুষানুক্রমে বংশের প্রত্যেকটি পুরুষ এই বিশেষ স্বভাবগুলি পরিপূর্ণ মাত্রায় লাভ করিয়াছিলেন ও রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গান্ধীপরিবার বড়ই অমিতব্যয়ী ছিলেন। উতা গান্ধীর পূর্ব্বপুরুষগণ দেওয়ানী করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের অমিতব্যয়িতার ফলে তাঁহাদের বংশধরদের জন্য তাঁহারা কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

কিন্তু অর্থ না পাইলেও উতা গান্ধী পূর্ব্বপুরুষের তীক্ষবুদ্ধি, কর্ম্মপটুতা ও বিচক্ষণতা পরিপূর্ণ মাত্রায় লাভ করিয়াছিলেন। আর ঐগুলি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনিও যথাসময়ে কাথিয়াওযাড়ের একজন সাধারণ রাজকর্ম্মচারীর কার্য্য করিতে করিতে বংশের ন্যায্যপ্রাপ্য পদ (দেওযানী) পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন।

*মুদী নামক বেণিয়াগণ (গান্ধীবংশ) বৈশ্যজাতির একটি উপবিভাগ, ইঁহাদের আদিম বৃত্তি ছিল ব্যবসা বা কৃষি (মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাধারা—Gandhi's Ideas সি, এফ, এণ্ড্রুজ প্রণীত)।

উত্তমচাঁদও পূর্ব্বপুরুষদের মত অর্থ সঞ্চয়ে উদাসীন ছিলেন। দেওয়ানী করিয়া যে বেতন পাইতেন, তাহার বেশীর ভাগই সাধুসন্ন্যাসী বা গরীব দুঃখীদের দান করিয়া দিতেন। বাকী অর্থের দ্বারা পরিবারের ভরণপোষণ করিতেন।

কিন্তু শান্তির সঙ্গে দেওয়ানী করা তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। ধার্ম্মিক ও সরল উত্তমচাঁদেরও শত্রু জুটিল। সামান্য কর্ম্মচারী হইতে তিনি রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়াছিলেন। এইজন্য রাজ্যের কতকগুলি দুষ্ট কর্ম্মচারী সর্ব্বদা তাঁহাকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিতেন, তাঁহার ক্ষতি ও অপমানের সুযোগ খুঁজিতেন। একবার তাঁহাদের এই সুবর্ণ সুযোগ জুটিয়া গেল। পোরবন্দরের রাজা বা রাণা তখন দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। বিধবা রাণী রূপালিকা নাবালক পুত্রের অছিরূপে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। রাণী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ-স্বভাবা ছিলেন। একবার রাজ-ভাণ্ডারের একজন ভাঁড়ারী রাণীর কোপে পতিত হইলেন। ভাঁড়ারী বুঝিল, এ বিপদে তাহাকে উত্তমচাঁদ ভিন্ন এখানে আর কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। সে ব্যাকুলভাবে উত্তমচাঁদকে সমস্ত বলিয়া তাঁহার আশ্রয় লইল। উত্তমচাঁদ উভয়-সঙ্কটে পড়িলেন। একদিকে আর্ত্ত ও অসহায় আশ্রয়প্রার্থী, অন্যদিকে ক্রুদ্ধ প্রভুশক্তি!......

কিন্তু তাঁহার ধার্ম্মিক ও নির্ভীক বিবেক তাঁহাকে কর্ত্তব্য দেখাইয়া দিল,... উত্তমচাঁদ ভাঁড়ারীকে আশ্রয় দিলেন......অভয় দিলেন!

রাণী এ খবর শুনিলেন। আরো ক্রুদ্ধা হইলেন, তৎক্ষণাৎ ভাঁড়ারীকে রাজ্যের পুলিশ বিভাগের হাতে সমর্পণ করিবার জন্য উত্তমচাঁদকে আদেশ জানাইলেন। কিন্তু নির্ভীক উত্তমচাঁদ বিনয়ের সঙ্গে অথচ দৃঢ়ভাবে জানাইলেন,—শরণাগতকে আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।

রাণী ক্রোধে চঞ্চলা হইলেন......

উত্তমচাঁদের শত্রুগণ সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে রাণীর নিকট আরো অনেক কুপরামর্শ দিলেন, রাণী হিতাহিত জ্ঞানহারা হইলেন......

রাজ্যের সৈন্যদলকে আদেশ করিলেন, অবাধ্য দেওয়ানকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিতে······জীবিত বা মৃত যে উপায়ে সম্ভব!

তীক্ষ্ণবুদ্ধি উত্তমচাঁদ যথাসময়ে এই সংবাদ পাইলেন······পোরবন্দরে অবস্থান আর নিরাপদ নহে বিবেচনা করিয়া গোপনে রাজ্যত্যাগ করিলেন ······তিনি বরোদা পাহাড় ধরিয়া জুনাগড় রাজ্যে চলিয়া গেলেন।

পোরবন্দরের সৈন্য আসিয়া উত্তমচাঁদের গৃহ ধ্বংস করিল, কিন্তু নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতাকে ধরিতে পারিল না। ·····

উত্তমচাঁদ পরিবার পোষণের জন্য জুনাগড়ের নবাবের দরবারে উপস্থিত হইলেন।

নবাবের সম্মুখে যাইবার সময় তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন···কিন্তু অভিবাদন করিলেন তাঁহার বাম হাতে।

নবাব ও তাঁহার পারিষদগণ বিস্মিত হইলেন, তাঁহার আচরণে তাঁহারা কৌতূহলী হইলেন, উত্তমচাঁদকে এই বিচিত্র অভিবাদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

উত্তমচাঁদ বিনীতভাবে জানাইলেন, "নবাব, আমার ডান হাত পোরবন্দরকে সেবার জন্য দান করিয়াছি। ইহা আমার নহে, ইহা পোরবন্দরের সম্পত্তি, তাই বাধ্য হইয়া বামহাতে অভিবাদন করিতেছি,—অনুগ্রহ করিয়া মার্জ্জনা করুন!"

কী অসাধারণ প্রভুভক্তি···কি নির্ভীক স্পষ্ট উত্তর!

গুণগ্রাহী নবাব বাকচতুর উত্তমচাঁদের কথায় রুষ্ট ত হইলেনই না, বরং পরম তুষ্ট হইলেন, তাঁহাকে নবাব-সরকারের যোগ্য পদ দিতে স্বীকৃত হইলেন।

কিন্তু ধার্ম্মিক যে, তেজস্বী নিষ্পাপ যে, সে আবার তাহার লুপ্ত শক্তি ফিরিয়া পাইবেই।

জুনাগড়ের গুণগ্রাহী নবাবের চেষ্টায় উত্তমচাঁদ পোরবন্দরের রাজসরকারে শেষ পর্য্যন্ত নির্দ্দোষী বলিয়া প্রমাণিত হইলেন,··আবার পোরবন্দরে আহুত হইলেন···দেওয়ানীর পদ ফিরিয়া পাইলেন।

উত্তমচাঁদ দুইবার বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে চারিটি এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে দুইটি পুত্র জন্মে। তাঁহার পঞ্চম পুত্রের নাম করমচাঁদ গান্ধী··· তাঁহার ভাল-নাম ছিল কাবা গান্ধী, আর কনিষ্ঠ পুত্রের নাম তুলসীদাস গান্ধী।

পিতার মৃত্যুর পর কাবা গান্ধী এবং তুলসীদাস গান্ধী দুইজনে পর পর পোরবন্দরের দেওয়ানের পদ লাভ করেন। .....

. এই কাবা গান্ধী আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় খৃষ্টপিতা সরল ধার্ম্মিক পশু-পালককে······ধৈর্য্যবান ও ভক্তি-পরায়ণ বসুদেবকে!

কাবা গান্ধী পুঁথিগত বিদ্যা বেশী লাভ করেন নাই, কিন্তু তথাপি গুণী পিতার মতই স্বাভাবিক ব্যবহারিক জ্ঞান ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে লাভ করিয়াছিলেন অন্তরের ধর্ম্মপরায়ণতা ও অকপট সরলতা।

সত্যের নিকট···ধর্ম্মের নিকট এই সরল ও ভক্তি-পরায়ণ মানুষটি আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন—নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়াছিলেন!

এইবার মহামতি খৃষ্ট ও কৃষ্ণের উদাহরণ লইয়া বলিতে ইচ্ছা হয় মহাত্মা গান্ধী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এই কাবা গান্ধীর পুত্ররূপে,······আপাতঃদৃষ্টিতে ছিলেন তিনি রাজ্যের একজন দেওয়ান মাত্র······পৃথিবীর অসংখ্য মানব-সমাজের মধ্যে অখ্যাত ও সাধারণ······কিন্তু ভিতরে তিনি ছিলেন বিরাট ও মহান,······সরলতা পবিত্রতা ও ভক্তিরসে আপ্লুত!

তাঁহার আত্মার এই বিশেষত্ব স্মরণ করিয়াই বোধহয় জগতের সর্ব্বযুগের মহাত্মা,······মহাত্মা গান্ধী আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহার পুত্ররূপে!

গান্ধীজীর কথা-প্রসঙ্গে কাবা গান্ধীর কথা আরো কিছু আলোচনা করা দরকার।

আগেই জানিয়াছি কাবা গান্ধী বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন না। বুদ্ধিবলেই তিনি নিজের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ইহাও জানিয়াছি, তিনি সরলপ্রাণ ও ধার্ম্মিক ছিলেন। কোন ধর্ম্মপুস্তক হইতে তিনি ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করেন নাই। তাঁহার স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা বলেই তিনি ধর্ম্মের জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি নিয়মিতভাবে হাবেলীতে যাইতেন (গুজরাটের বৈষ্ণব মন্দিরগুলিকে হাবেলী বলে)। কথকতা ইত্যাদি শুনিতেন, আর দান ইত্যাদি কর্ম্মে উপার্জ্জিত অর্থের বেশীর ভাগই ব্যয় করিতেন। শেষ জীবনে তিনি গীতা পড়িতে অভ্যাস করেন এবং প্রতিদিন নিত্যপূজার সময়ে গীতার কতকগুলি শ্লোক উচ্চস্বরে পাঠ করিতেন। এই স্বাভাবিক ধর্ম্মানুরক্তি এবং মনের সরলতা আর উদারতা তাঁহার স্বভাবকে বড় মধুর ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল।

কিন্তু শিশুর মত সরল এই কাবা গান্ধী যখন বিষয়কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন, তখন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম প্রশ্নের সমাধান করিতে এবং হাজার হাজার লোকের নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে তাঁহার কোন অসুবিধা হইত না!

ধর্ম্মপরায়ণ গান্ধীজীর মধ্যেও ধর্ম্মের সরলতার সহিত জটিল সমস্যা সমাধান করিবার কূটবুদ্ধি ও কোটি কোটি মানুষের নিকট হইতে কাজ আদায় করিবার দক্ষতা আমাদের আজ স্মরণ করাইয়া দেয় পিতা পুত্রের স্বভাবের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য!

তবে মনে হয় গান্ধীজী তাঁহার মাতার আচরণ হইতেই ধর্ম্মের প্রতি বাল্যকাল হইতে একটা বিশেষ আকর্ষণ লাভ করিয়াছিলেন।*

তাঁহার মাতা ছিলেন একজন সাধ্বী ও ধর্ম্মপরায়ণা রমণী। তাঁহার পিতা পর পর চারিবার বিবাহ করেন। তাঁহার মাতা পুতলীবাঈ ছিলেন কাবা গান্ধীর কনিষ্ঠা স্ত্রী।

পুতলীবাঈয়ের সমস্ত জীবনটাই কাটিয়াছিল ধর্ম্মানুষ্ঠানে আর ব্রত পালনে। তিনি ঘন ঘন চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন করিতেন, ব্রত আচরণের সময় একবেলা করিয়া অন্নগ্রহণ করিতেন। ইহা ছাড়া কোন কিছু পূজা বা ধর্ম্মকর্ম্ম উপলক্ষ্য করিয়া প্রায়ই উপবাস করিতেন, কোন কোন সময়ে একদিন অন্তরও উপবাস করিযাছেন। অবশেষে উপবাস তাঁহার এত অভ্যস্থ হইয়া গিয়াছিল যে মধ্যে মধ্যে তিনি দুইদিন তিনদিন পর্য্যন্ত অন্নগ্রহণ না করিয়া স্বাভাবিকভাবে

কাজকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিতেন। একবার তিনি চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের সঙ্গে সূর্য্য-নারায়ণের ব্রত গ্রহণ করেন। এই ব্রতে সূর্য্য না দেখিলে অন্নগ্রহণ করিতে নাই। তাঁহার এই ব্রত পালন সম্পর্কে স্বয়ং গান্ধীজী একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন—"···আমরা আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিতাম যে, কখন সূর্য্য দেখা দিবেন আর কখন মা আহার করিবেন। এ চার মাস অনেক সময়েই সূর্য্যের দেখা পাওয়া যে দুর্ঘট তাহা আমরা জানিতাম। একদিন আমার মনে আছে যে, সূর্য্য দেখিবা আমি, 'মা, মা, সূর্য্য দেখা গিয়াছে'—বলিয়া উঠিলাম। আর মা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিতেই সূর্য্য মেঘের নীচে পলাইয়া গেল। 'কই না—আজ কপালে খাওয়া নাই' বলিয়া তিনি ফিরিয়া গিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিলেন।"

ইহা ছাড়া সাধারণতঃ প্রতিদিন তিনি হাবেলীতে যাইতেন এবং নিত্যকার পূজা-পাঠ করিতেন, পরে স্নান-ভোজন করিতেন।

মাতার এই ধর্ম্মানুরক্তিই গান্ধীজীর ভবিষ্যৎ-জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পরে তিনি সকল ধর্ম্মগ্রন্থের সার সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার ও প্রচার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু শৈশবকাল ও বাল্যকালের স্মৃতি হইতে প্রাপ্ত মায়ের উদাহরণগুলিই তাঁহাকে জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভক্তিপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান হইতে শক্তি দান করিয়াছিল।

মাতার উপবাসের স্বভাব যে পুত্রের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে জাগিয়াছিল, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ভবিষ্যতে যে গান্ধীজী আত্মশুদ্ধির জন্য অথবা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দিনের পর দিন প্রায়োপবেশনে সময় কাটাইয়াছেন—যে মহাত্মাজী উপবাসের মধ্যেও সহাস্যবদনে স্বাভাবিকভাবে নিজের দৈনন্দিন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন,···সেই গান্ধীজী প্রথমজীবনে বালক মোহনদাস গান্ধীরূপেই তাঁহার উপবাসরতা মাতার নিকট হইতেই এই বিষয়ে প্রথম প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তাই বলিতে হয়, গান্ধীজীর জীবনে তাঁহার মাতার প্রভাব ওতঃপ্রোতঃভাবে বিজড়িত।

দুই

বাল্যকাল ও ছাত্রজীবন

মোহনদাস গান্ধীর বয়স যখন সাত বৎসর তখন কাবা গান্ধী পোরবন্দরের দেওয়ানী ছাড়িয়া রাজস্থানিক কোর্টের সভ্য হইয়া রাজকোটের দরবারে চাকুরী লইলেন।

অবশ্য তাঁহার কর্ম্মদক্ষতার জন্য তিনি রাজকোটের অধিপতি ঠাকুর সাহেবের (অধিপতির উপাধি) বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারও প্রভুর প্রতি একটা অকৃত্রিম ভক্তি ছিল। একবার একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট ঠাকুর সাহেবের প্রতি তাচ্ছিল্যসূচক কোন মন্তব্য করেন। কাবা গান্ধী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রভুনিন্দা শুনিয়া তিনি নির্ভীকভাবে সেই ইংরাজের মন্তব্যের কঠোর প্রতিবাদ করেন। ক্রুদ্ধ রেসিডেণ্ট সাহেব এইজন্য তাঁহাকে বন্দী করিবার ভয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি কাবা গান্ধীর অটুট সাহস ও ধৈর্য্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহার সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হন। তখনকার দিনে তোষামোদ না করিয়া স্পষ্ট কথায় ইংরাজ কর্ম্মচারীর কথা ও কাজের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা যে কত বড় দুঃসাহসের কাজ তাহা তিনি জানিতেন, তবু তাঁহার মহৎ হৃদয় প্রভুনিন্দা সহ্য করে নাই।

রাজকোটেই বালক গান্ধীর ছাত্র-জীবন নিয়মিতভাবে আরম্ভ হইল। পোরবন্দরে থাকার সময়ে তিনি বিশেষ কিছু শিক্ষা লাভ করেন নাই, শুধু কষ্ট করিয়া কতকটা নামতা শিখিয়াছিলেন।

রাজকোটে তাঁহাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল, সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া তিনি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িতে লাগিলেন এবং সেখানকার পড়া শেষ করিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন। বিদ্যালয়ে তিনি কোনদিন বিশেষ ভাল ছাত্র হইয়া উঠিতে পারেন নাই। তবে উপরের শ্রেণীতে উঠিয়া পড়াশুনায় ভাল হওয়ার জন্য দুই একবার

বৃত্তি পাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় মানে কিছু পুরস্কার পাইয়াছিলেন, ৪র্থ ও ৫ম মানে ৪ টাকা ও ৫ টাকা বৃত্তি পান। কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, উহা পাওয়াতে তাঁহার কৃতিত্ব অপেক্ষা ভাগ্যই বেশী ছিল। "কারণ এই বৃত্তিসকল বিদ্যার্থীদের জন্য নহে, যাহারা কাথিযাওয়াড়ের 'সোরট' অঞ্চল হইতে পড়িতে আসে কেবলমাত্র তাহাদেরই জন্য। চল্লিশ পঞ্চাশ জনের ক্লাশে সোরটের ছাত্র আর কয়জনই বা থাকিতে পারে?"*

বাল্যকালে এবং ছাত্রজীবনে গান্ধীজীর স্বভাব ও আচরণ কিন্তু সাধারণ ছেলেদের মত ছিল না।

তিনি ক্লাসে ছেলেদের কাছে এবং শিক্ষক মহাশযদের সামনে অত্যন্ত লাজুক ছিলেন। ক্লাশের পর আর সহপাঠীদের সহিত মিলামিশা করিতেন না, একেবারে সোজা বাড়ী চলিযা গিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাচিতেন। ক্লাসে যতক্ষণ থাকিতেন, কোন রকমে একধারে মুখ গুঁজিযা চুপচাপ বসিযা থাকিতেন।

যিনি একদিন সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে প্রশান্ত হাস্যময মুখখানি তুলিয়া নিজের মিষ্ট কথায় কোটি কোটি মানুষকে আপন করিযা লইযাছিলেন, তাঁহার বাল্যকালের এই লাজুক স্বভাব বেশ একটু বিচিত্র বলিয়াই মনে হয। কিন্তু গান্ধীজীর কার্য্যক্রম এই রকম ছোটখাট অথচ মধুর বিচিত্রতায় সব সময়েই পরিপূর্ণ ছিল। গান্ধীজীর নৈতিক স্বভাব তাঁহার বাল্যকাল হইতেই তাঁহাকে একটা পবিত্র ও উজ্জ্বলতর মহিমা দ্বারা মণ্ডিত করিযা তুলিতেছিল। এই স্বভাববিকাশের ধারাটি অতি মনোরম।

বনের মধ্যে অসংখ্য চারাগাছ....... ...

চারাগাছের দলের মধ্যে একটি বটের চারা ....ছোট হইলে কি হইবে, তাহার ছোট অথচ খাড়া দেহ ছোট ছোট পাতা ছড়াইয়া চারার দলের মধ্যে নিজের গাম্ভীর্য্য ও বিশেষত্ব প্রকাশ করিতেছে.........

*গান্ধীজীর আত্মকথা—অনুবাদক সতীশ দাশগুপ্ত

দেখিয়া মনে হয়·········এ চারা বটের···এ একদিন বড় হইবে···আকাশে মাথা ছোঁয়াইবে·······গোটা বনটার ভিতরে তাহার মোটা মোটা ডাল আর পাতার ঝোপ ছড়াইয়া দিবে·········গোটা বনটার রাজা হইবে।·····তাহার ছায়াতলে কত ক্লান্ত শ্রান্ত পথিককে আশ্রয় দান করিবে!

বিদ্যালয়ের মধ্যে অসংখ্য বালক········ বালকদের মধ্যে ছোট বালক মোহনদাস······ছোট হইলে কি হইবে,······তাহার ক্ষুদ্র কাযার ভিতর হইতে মধ্যে মধ্যে ছোটখাট গুণের বৈচিত্র্য ছড়াইয়া পড়িতেছে·········দেখিয়া মনে হয়······এ বালক একদিন তাহার গুণ সমস্ত জগতে ছড়াইয়া দিবে,······গোটা জগতের গুণীরাজ হইবে।

মোহনদাসের হাইস্কুলের প্রথম বৎসরের একটি দিন। সেদিন স্কুল পরিদর্শক 'জাইলস্ সাহেব' স্কুলে আসিয়াছেন। তিনি ছেলেদের পাঁচ ছযটি শব্দের বানান লিখিতে বলিলেন। ঐ শব্দগুলির মধ্যে একটি শব্দ ছিল—কেট্‌ল্ (Kettle)। উহার বানান মোহনদাস ভুল লিখিলেন। ক্লাসের শিক্ষকমহাশয় উহা লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু তিনি পায়ের বুটের ডগা দিযা মোহনদাসকে সাবধান করিলেন। মোহনদাস বুঝিতেই পারিলেন না যে শিক্ষকমহাশয় তাঁহাকে ঐ বানানটি পাশের বালকের শ্লেট হইতে নকল করিতে ইঙ্গিত করিতেছেন। আর বুঝিবেনই বা কেমন করিয়া? যে বালক কোনদিন নকল করে নাই, সে কি নকলের ইঙ্গিত বুঝিতে পারে! বালক সরলমনে উলটা অর্থ করিল,—শিক্ষক মহাশয় আমাকে সাবধান করিতেছেন, পাছে আমি পাশের বালকের বানান নকল করি!

ফলে দেখা গেল, আর আর বালকদের সমস্ত বানান ঠিক হইল, কিন্তু মোহনদাসের ঐ বানানটি ভুল হইল। পরিদর্শক মহাশয় চলিয়া যাইবার পর শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, মোহনদাস, তুমি আমার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিলে না?

মোহনদাস এবার সব বুঝিল। কিন্তু বুঝিয়াও সে খুশী হইল—"যাক, সে তাহা হইলে পরের নকল করিয়া বাহাদুরী লয় নাই।"

শুধু সেদিন নহে, ইহার পরেও সে কোনদিন ক্লাসে ছেলেদের নিকট হইতে নকল করিয়া লিখিতে শেখে নাই।

তাঁহার ছাত্রজীবনের আর একটি বিশেষ গুণ ছিল, সেটি তাঁহার গুরুভক্তি। গান্ধীজী কোনদিনই শিক্ষকদের কাজের বা শিক্ষার কোন দোষ ধরিবার চেষ্টা করেন নাই। শিক্ষকের দোষ জানিতে পারিয়াও তিনি শিক্ষকমহাশয়কে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়াছেন। কারণ বাল্যকালেই এই ধারণা তাঁহার মনে দৃঢ়ভাবে গাঁথিয়া গিয়াছিল যে গুরুজনকে সব সময়ে মান্য করিতে হয়, কোন কারণে তাঁহাদের কাজের বিচার করিতে নাই।

যিনি একদিন পরিণত বয়সে নিজের ভুল ও অসত্যকে সংশোধন করিয়া ন্যায় ও সত্যকে জগতের চক্ষে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,......বাল্যকালের এই বিচিত্র গুরুভক্তি একমাত্র তাঁহার পক্ষেই স্বাভাবিক ও সম্ভব।

তাঁহার বালক বয়সের আর একটি গুণ......তিনি কোনদিন কাহাকেও ঠকাইতেন না। শিক্ষকদেরও না কিংবা সহপাঠীদেরও না।

তাঁহার পাঠ তৈয়ারী করিবার বিবরণ হইতেই তাঁহার এই সততার কথা জানিতে পারি।

ছাত্রজীবনে প্রথম প্রথম তাঁহার বই পড়িতে ভাল লাগিত না, এমন কি স্কুলের পাঠ্য পুস্তককেও তিনি বিরক্তির চোখে দেখিতেন। কিন্তু পাঠ তৈয়ারী না করিলে শিক্ষকমহাশয় রুষ্ট হইবেন, এই ভয়ে তিনি নিত্যকার পাঠ্য বইগুলি পড়িতেন। ভয়কে এড়াইবার জন্য পড়া না করিবার কৈফিয়ৎ স্বরূপ তিনি কোনদিন শিক্ষক মহাশয়দের কোন মিথ্যা কারণ দেখান নাই। কারণ এই বয়স হইতেই নিজের বিচারশক্তির অজ্ঞাতে এবং সহজ স্বভাববশেই তিনি মিথ্যা অজুহাত ও কারণ দেখাইবার কাজগুলিকে পছন্দ করিতেন না। তবে যেদিন হইতে তাঁহার কল্পনাশক্তি তাঁহার ছোট মনের রুদ্ধ দ্বারটি খুলিয়া জগতের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতে চাহিল, সেইদিন হইতেই কিন্তু আবার তাঁহার পাঠবিমুখ অন্তর অদম্য কৌতূহল লইয়া রূপকথার রাজপুত্রের মত জগতের নব নব দেশের নব নব

দৃশ্য ও কাহিনী শুনিবার, জানিবার ও দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এও বালক গান্ধীর জীবনের এক বিচিত্র ঘটনা!

একদিন তাঁহার পিতার ঘরের মধ্যে তাঁহার পিতার কেনা একখানি বইয়ের উপর তাঁহার নজর পড়িল। বইখানি 'শ্রবণের পিতৃভক্তি'... .. একখানি নাটক। হঠাৎ বইখানি পড়িবার জন্য তাঁহার কেমন ঝোঁক হইল। তিনি উহা আগ্রহের সহিত পড়িলেন। পড়িতে পড়িতে জানিলেন, বালক শ্রবণ কি কঠোর ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত পিতামাতাকে সেবা করিত, পিতামাতার সুখের জন্য কত কঠোর পরিশ্রম ও কষ্টবরণ করিত। নাটকের শ্রবণ আবার একদিন লণ্ঠন 'ছবিওয়ালার শ্রবণের দৃশ্যের সহিত মিলিত হইযা তাঁহার কল্পনাকে আরো দৃঢ় ও প্রসারিত করিযা দিল। তাঁহাদের বাড়ীতে একজন লণ্ঠনছবিওযালা 'লণ্ঠন বায়োস্কোপ' দেখাইতে আসিয়াছিল। ঐ ছবি দেখিবার সময বালক গান্ধী শ্রবণের গল্পের দুইটি ঘটনা দেখিতে পাইলেন। একটি ছবিতে দেখিলেন, শ্রবণ তাহার কাঁধের ঝোলার মধ্যে তাহার বৃদ্ধ পিতামাতাকে লইয়া তীর্থস্থানে চলিযাছে, আর একটিতে দেখিলেন, মৃত শ্রবণের পাশে বসিযা তাহার পিতা ও মাতা আকুলভাবে ক্রন্দন করিতেছেন।

বালক মোহনদাসের হৃদয ব্যথায় গলিযা গেল। শ্রবণের বিযোগে তিনি অশ্রু মোচন করিলেন, আর শ্রবণের মত পিতামাতাকে ভক্তি ও সেবা করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন।

আর একটি ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিযা তাঁহার নবজাত কল্পনার প্রস্রবণ তাঁহার হৃদযতটকে উচ্ছ্বসিত শীতল ধাবায সিক্ত ও সবস কবিয়া তুলিল। ....

একদিন রাজকোটে একটি নাটক কোম্পানী আসে। বালক গান্ধী অন্যান্য বালকদের কাছ হইতে শুনিয়া নাটক দেখিবাব জন্য পিতার অনুমতি চাহিলেন। অনুমতি পাইয়া নাটক দেখিতে গেলেন। নাটকের বিষয় ছিল রাজা হরিশ্চন্দ্রের সত্যপালন। মোহনদাস দেখিলেন, রাজা সত্যরক্ষার জন্য একে একে রাজ্য

ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী, পুত্র সমস্ত দান করিলেন, নিজে দাসত্ব বরণ করিলেন, পুত্রের মৃত্যু দেখিলেন, আবার সত্য পালনের জন্য সব কিছুই ফিরিয়া পাইলেন। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী গান্ধীজীর মনে গাঁথিয়া বসিল, হরিশ্চন্দ্র তাঁহার কল্পনার প্রিয় সহচর হইলেন, হরিশ্চন্দ্রের ত্যাগ তাঁহার সকল সময়ের চিন্তা হইল!

কল্পনার রসে আকুল মোহনদাসের বারবার ঐ নাটক দেখিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু অনুমতির অভাবে উহা আর দেখিতে পাইলেন না। না পাইলেও হরিশ্চন্দ্রকে তিনি নিজের অন্তরে সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেন, আর কচি মনে কঠোর সঙ্কল্প করিতে আরম্ভ করিলেন, 'হরিশ্চন্দ্রের মত সত্যবাদী কেন হইব না?...... হরিশ্চন্দ্রের মত বিপদে পড়িয়া তাঁহার মত সত্য পালন করিব; ইহাই আমার জীবনের লক্ষ্য...একমাত্র সত্য!'

শীতের ভোরে পূর্ব্বাকাশে তরুণ সূর্য্যের লাল আভা ছড়াইযা পড়ে......

নীল গগন সূর্য্যের কিরণে উদ্ভাসিত হয়......

পৃথিবীর মানুষ বোঝে, সকালের ঐ তরুণ-তপন আজ মধ্যাহ্নে তাহার উজ্জ্বল আলোকে জগতের জীবকে উত্তপ্ত ও প্রীত করিবে......

গান্ধীজীর বাল্যকাল......তাহাতো পরাধীন ভারতের শীতের রাতের জড়তার যুগ......

কিন্তু রাতের শেষ না হইলেও ভোরের আগমন অনুভূত হইয়াছিল......

তখন ভারতের জাতীয় মহাসভা উদ্ভূত হইয়াছে...

জাতীয় জাগরণের গুঞ্জরণের অন্তরালে রাজকোটের একটি গৃহে ভারতের স্বাধীনতা সূর্য্যের মূর্ত্ত প্রতীক তাহার সত্যদর্শনের তরুণ কিরণে ভারতের ভাগ্যাকাশ উজ্জ্বল করিবার জন্য ধীরে ধীরে জাগিতেছিলেন......

সেদিনের সেই কাহিনীর সত্যের ক্ষীণরশ্মি ধরিয়া একদিন যিনি ভারতের তথা বিশ্বে সত্যের মহিমা ও আলো প্রকাশ করিয়াছিলেন, একি সেদিনের কোন ভারতবাসী জানিতে পারিয়াছিল—বুঝিতে পারিয়াছিল? কিন্তু কেহ না জানিলেও ভারতের ভাগ্যবিধাতা জানিয়াছিলেন, তাই তিনি অলক্ষ্য হইতে

কচি মনে সত্যের বীজ বপন করিলেন…যে বীজ একদিন মহীরুহে পরিণত হইয়া ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিযাছিল।

এখন বলিতে পারি, গান্ধীর কল্পনার বিচিত্র বিকাশ তাঁহার অন্তরের সত্যের বিকাশেও পরিপূর্ণ সহায়তা করিয়াছিল। বালক গান্ধীর বাল্যের বিচিত্র স্বভাবগুলির সমস্ত বিবরণ দিতে হইলে তাঁহার অপূর্ব্ব পিতৃমাতৃভক্তির ঘটনাগুলিও বলিতে হয।

পিতাকে সেবা ও যত্ন করিবার জন্য তিনি ছাত্রজীবনে স্কুলের ব্যায়াম চর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, দিনের পর দিন আগ্রহের সঙ্গে রুগ্ন পিতার শয্যার পাশে বসিয়া তাঁহাকে শুশ্রূষা করিয়া তৃপ্তি পাইয়াছিলেন, আবার তাঁহারই সেবার ত্রুটিতে তাঁহার অবহেলায় পিতার মৃত্যুকালে পিতার শয্যাপাশে না না থাকার জন্য অনুতাপের অশ্রু বিসর্জ্জন করিযাছিলেন। বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া মাতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া ছোট শিশুর ন্যায অঝোর ধারায় চোখের জল ফেলিযাছিলেন। তাঁহার জীবনকথা আলোচনাক্রমে তাঁহার এই বিচিত্র ও স্বর্গীয পিতৃমাতৃ-ভক্তির বিষয আমরা আরো বিশদভাবে বলিতে চেষ্টা করিব।

তিন

বিদ্যালয়ের দিনগুলি

বিদ্যালযে মোহনদাস প্রথমে বিশেষ ভাল ছেলে না থাকিলেও পরে উচ্চ শ্রেণীতে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ লেখাপড়ায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইহা আমরা আগেই জানিযাছি। এই সঙ্গে নৈতিক চরিত্র বিকাশের কথাও কিছু জানিয়াছি। তবে মোহনদাস নিজের পড়াশুনার কৃতিত্বের বিশেষত্বের জন্য যত না সজাগ ছিলেন, তাহা অপেক্ষা তাঁহার আচরণের দোষগুণের দিকে তিনি বেশী সজাগ ছিলেন। যদি বুঝিতে পারিতেন, তাঁহার আচরণে শিক্ষকমহাশয তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে বা শাস্তি দিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার ভ্রান্ত আচরণের জন্য যত বেশী কষ্ট অনুভব করিতেন, ভর্ৎসনা বা শাস্তি দ্বারা তত কষ্ট তিনি পাইতেন না। একবার শিক্ষকমহাশয় কোন কারণে তাঁহাকে বেত মারেন, কিন্তু তখন তাঁহার বেত্রাঘাতের দুঃখ অপেক্ষা তাঁহার অপরাধের যন্ত্রণাই তাঁহাকে বেশী কষ্ট দিযাছিল।

তাঁহার সময়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন দোরাবজী এদুলজী গীমী। দোরাবজী নিয়ম করেন, ছাত্রগণকে বাধ্যতামূলক ভাবে ব্যাযাম চর্চ্চা করিতে হইবে। লাজুক মোহনদাস মহা মুস্কিলে পড়িলেন। একে ত ছেলেদের সহিত খোলাখুলি মিশিতে তাঁহার লজ্জা হইত, তাহার উপর আবার ব্যায়াম করাটাকেই তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না। তবে বাল্যকাল হইতেই তিনি ভ্রমণ করিতে ভাল বাসিতেন, বাল্যকালে একটি পুস্তকে খোলা হাওয়ায় ভ্রমণের উপকারিতার বিষয পড়িয়া তিনি তখন হইতে নিয়মিত ভ্রমণ করিতেন এবং ভ্রমণের এই অভ্যাস চিরকাল বজায রাখার জন্য তাঁহার স্বাস্থ্য চিরদিনই সুস্থ ও রোগহীন ছিল। যাহা হোক, শুধু লজ্জা বা অনিচ্ছার জন্যই তিনি ব্যায়ামে অস্বীকৃত হইলেন না, সেই সমযে তাঁহার পিতা পীড়িত ছিলেন এবং পিতার পীড়ার জন্য তিনি ছুটির পর ব্যায়াম না করিয়া পিতাকে সেবা করিবার

জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়া আসিতেন। মোহনদাসকে ব্যায়ামক্ষেত্রে অনুপস্থিত দেখিয়া শেষে গীমী সাহেব তাঁহাকে শাস্তির ভয় দেখাইলেন। কিন্তু তিনি বর্ষায় একদিন বৃষ্টির জন্য বেলা ঠিক করিতে পারিলেন না, তাই যখন ব্যায়ামক্ষেত্রে হাজির হইলেন, তখন দেখিলেন ব্যায়ামের সময় চলিয়া গিয়াছে, অন্যান্য বালকগণ ব্যায়াম করিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। পরদিন স্কুলে গেলে গীমী সাহেব তাঁহাকে ব্যায়ামে উপস্থিত না হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বাদল তাঁহাকে কেমন করিয়া ঠকাইয়াছে তাহা জানাইলেন। কিন্তু গীমী সাহেব তাঁহার এই কৈফিয়ৎ বিশ্বাস করিলেন না, তাঁহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়া সামান্য কয়েক আনা জরিমানা করিলেন। সেইদিন বালক মোহনদাসের মনে বড়ই কষ্ট হইল, শেষে শিক্ষকমহাশয় তাঁহাকে মিথ্যাবাদী মনে করিলেন! বালক মোহনদাস জরিমানার কথা চিন্তা না করিয়া নিজের সত্যের মর্য্যাদা নষ্ট হইল চিন্তা করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য একদিন যিনি বিলাতে মাংস ও অন্যান্য আমিষ খাদ্যকে খাদ্যের তালিকা হইতে বাদ দিয়া নিরামিষাহারী হইয়াছিলেন, যিনি আফ্রিকায় জীবন বিপন্ন করিয়াও অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন, যিনি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সত্যাগ্রহের অভিনব অস্ত্র দ্বারা অসীম শক্তিশালী ব্রিটিশ শাসকদের পর্য্যন্ত চঞ্চল ও বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন, শিক্ষকমহাশয়ের বিচারে সত্যের অবমাননা দেখিয়া তাঁহার বুকে যে ব্যথা জাগিবে, . . এ আর বিশেষ বিচিত্র কি!

সেদিনের এই বেদনা তাঁহার ভবিষ্যতের জীবন ও আদর্শকে তখন যেন বিশেষভাবেই ফুটাইয়া তুলিয়াছিল।

সেদিন হইতে তাঁহার জীবনের শেষের দিনটি পর্য্যন্ত তিনি সত্যের অপলাপ দেখিলে ব্যথিত হইয়াছেন, ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, মিথ্যাকে ধ্বংস করিয়া সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ভীক হৃদয়ে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন।

ধর্ম্ম বাহ্যিক আচরণে পৃথক হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মের

অন্তর্নিহিত সত্যটি এক, ইহা প্রমাণ করিয়া ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে মিলন ও সদ্ভাব আনিবার জন্য তিনি কী প্রাণপাত পরিশ্রমই না তিনি করিয়া গিয়াছেন !

অবশেষে মোহনদাস পিতার লিখিত পত্র প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের হাতে দিলেন।

পত্রে পিতা তাঁহার শুশ্রূষার জন্য মোহনদাসকে ছুটির পর ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। মোহনদাস ব্যায়ামের হাত হইতে মুক্তি পাইলেন। কিন্তু ব্যায়াম যে স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ইহা মোহনদাস পরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার আজীবনের নিয়মিত ভ্রমণ তাঁহাকে ব্যায়ামের উপকার প্রদান করিয়াছিল এবং সুস্বাস্থ্য বজায় রাখিতে সাহায্য করিয়াছিল। এই ভ্রমণরূপ ব্যায়ামে তিনি শেষ পর্য্যন্ত এত অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে একনিষ্ঠ ব্যায়ামবীরও তাঁহার মত এরূপ নিয়মিত ও নির্দ্ধারিত সময়ে ব্যায়াম চর্চ্চা করিতেন কি না সন্দেহ।

মহাত্মা গান্ধী ছিলেন নিষ্পাপ, দোষশূন্য মহামানব! কিন্তু বালক মোহনদাস ছিলেন বালকমাত্র,...তাই ছাত্রজীবনে বা বাল্যকালে তিনি দোষও করিয়াছিলেন, অনেক ভুলও করিয়াছিলেন।

বাল্যকালে তাঁহার এই খেয়াল হইয়াছিল যে শিক্ষার সঙ্গে হাতের লেখা ভাল হওয়ার কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহার এই ভুল বিশ্বাস তাঁহার বিলাত যাওয়া পর্য্যন্ত মনের মধ্যে জাগরূক ছিল। কিন্তু পরে আফ্রিকায় উকিলদের ও অন্যান্য শিক্ষিত যুবকদের মুক্তার মত হাতের লেখা দেখিয়া তাঁহার সেই ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি উহাদের লেখার সহিত নিজের শ্রীহীন হস্তাক্ষর মিলাইয়া স্বীকার করিলেন, অস্পষ্ট শ্রীহীন হস্তাক্ষর অসম্পূর্ণ শিক্ষার লক্ষণ বলিয়া গণ্য করা উচিত। নিজের ত্রুটিকে সংশোধন করিবার জন্য তিনি হস্তাক্ষর সংশোধন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তিনি নিজে এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন যে—প্রত্যেক যুবক ও যুবতী

আমার এই উদাহরণ হইতে একথা জানিয়া রাখিবেন যে, ভাল হস্তাক্ষর বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যক অঙ্গ। ভুল করিয়া ভুল স্বীকার করিবার এবং সত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার কী সরল ও অকপট ভঙ্গি!...এই ভঙ্গি ও আচরণ একমাত্র গান্ধীজীর চরিত্রেই সম্ভব হইযাছে, এবং এই স্বীকৃতি ও সত্যানুসন্ধানই তাহার কার্য্য ও স্বভাবকে লোকচক্ষে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল। এক কথায় বলা যায, এই আত্মদোষ স্বীকার ও স্বীকারের দ্বারা স্বভাব সংস্কারের চেষ্টা গান্ধীজীর চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তাঁহার জীবনে আমরা বহুবার পাইযাছি।

ছাত্র মোহনদাস ছাত্রজীবনে আরো দুইটি ছোটখাট সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু নিজের চেষ্টাতেই সেই সমস্যার সমাধান করিযাছিলেন।

এইখানে বলা প্রয়োজন যে তাঁহার মাত্র তের বৎসর বয়সে বিবাহ হইযাছিল, এই বিবাহের বিবরণ আমরা পরে বলিব। কিন্তু বিবাহের ফলে তাঁহার পড়াশুনা এক বৎসরের জন্য বন্ধ ছিল। তবে ঐ এক বৎসরের বিলম্ব সারিয়া লইবার জন্য মাষ্টার মহাশয়গণ একটি বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন, তাঁহাকে ছযমাসের জন্য অর্থাৎ গ্রীষ্মের বন্ধ পর্য্যন্ত তৃতীয মানে পড়াইলেন। কিন্তু গ্রীষ্মাবকাশের পর চতুর্থ মানে উঠাইয়া দিলেন। চতুর্থ মানে আসিয়া কিন্তু তাঁহার পাঠ তৈয়ার করা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। কারণ ঐ শ্রেণীর সমস্ত পাঠ্য তখনকার নিয়মানুসারে ইংরাজীতে পড়ান হইত। অন্যান্য বিষয কোন রকমে বুঝিতে পারিলেও জ্যামিতি লইয়া তিনি বিশেষ ফাঁপরে পড়িলেন। জ্যামিতির প্রতিপাদ্যগুলি ইংরাজিতে থাকার জন্য তিনি ঐগুলি কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারিতেছিলেন না। শেষে তিনি হতাশ হইযা পড়িলেন। তৃতীয় মানে না পড়িয়া তাড়াতাড়ি চতুর্থ মানে উঠিবার জন্য অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে ছাড়িলেন না। অবশেষে তাঁহার একাগ্র চেষ্টার ফলে একদিন

জ্যামিতির জটিল প্রতিজ্ঞাগুলি তাঁহার কাছে সরল ও সহজ হইয়া উঠিল। তোতাপাখীর মত মুখস্থ না করিয়া নিজে বুঝিয়া পড়ার জন্য জ্যামিতির জটিল বিষয়গুলি শেষ পর্য্যন্ত তিনি অতি সহজে বুঝিতে ও শিখিতে লাগিলেন। পাঠ্য বিষয়গুলি না বুঝিয়া মুখস্থ করা অপেক্ষা বুঝিয়া পড়িবার ফল যে কত ভাল তাহা তিনি সেই সময় বিশেষভাবে জানিতে পারিলেন।

তিনি যখন ষষ্ঠ মানে উঠিলেন। তখন সংস্কৃত পাঠ্য লইয়াও বড় মুস্কিলে পড়িলেন। তাঁহাদের সংস্কৃত শিক্ষক বড় কঠোর প্রকৃতির ছিলেন। তিনি ছাত্রদের বেশী পড়াইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া-লাগিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত পড়ার চাপে সংস্কৃত তাঁহার কাছে সুখপাঠ্য না হইযা কষ্টের বিষয় হইয়া উঠিল, কিছুতেই তিনি উহা আয়ত্ত করিতে পারিলেন না। এই সময়ে অন্যান্য ছাত্রগণ 'ফারসী' শিক্ষার গুণগান করিতে লাগিল। অগত্যা তিনি সংস্কৃতে হতাশ হইযা ফারসী পড়িবেন, সঙ্কল্প করিলেন। সংস্কৃতের শিক্ষক ইহা শুনিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন। মোহনদাসকে হতাশ হইতে নিষেধ করিয়া তাঁহার জটিল বিষয়গুলি তাঁহাকে যত্নের সহিত বুঝাইয়া দিবেন বলিলেন। সদাশয় গুরুর সাহায্য পাইযা তিনি ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত বুঝিতে ও শিখিতে লাগিলেন।

সেদিন সংস্কৃতকে অবহেলা না করিযা, একাগ্রতা ও ধৈর্য্যের সহিত উহা শিক্ষা করিযা যে সুফল তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে লাভ করিযাছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের বর্ণনা হইতেই বিশেষভাবে জানিতে পারা যায়।···"তখন যতটুকু সংস্কৃত শিখিয়াছিলাম তাহাও যদি না শিখিতাম, তাহা হইলে আজ সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে যে রস লইতে পারিতেছি, তাহা পারিতাম না। আমার এই অনুতাপ রহিয়া গিয়াছে যে, ভাল সংস্কৃত শিখিতে পারি নাই। কেন না পরে আমি বুঝিয়াছিলাম যে কোন হিন্দু বালকেরই সংস্কৃত বেশ ভাল করিয়া না জানিলে চলে না।

হিন্দুর পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষা করা যে একান্ত প্রয়োজন ইহা তিনি অল্প কথায় বুঝাইয়া গিযাছেন।

কিন্তু তাঁহার অভিজ্ঞতা আর একটি অমূল্য বিষয় আমাদের শিখাইয়া দিতেছে, সেটি হইতেছে মাতৃভাষায় জ্ঞান লাভ করা। পাঠ্য বিষয়গুলি,— জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি যদি নিজের ভাষায় পড়া যায়, তাহা হইলে ঐগুলি যত সহজে ও অল্প সময়ে আযত্ত করা যায়, বিদেশী ভাষায় তাহা কিছুতেই করা যায় না। তাঁহার জ্যামিতি পড়ার ঘটনা হইতে এই বিষয়ে একটি স্পষ্ট উদাহরণ তিনি দিয়াছেন। তবে মাতৃভাষা ছাড়াও অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে হিন্দী, সংস্কৃত, উর্দ্দু ও ইংরাজি বিষয়গুলি কিছু কিছু শেখা কর্ত্তব্য, ইহাও তিনি জানাইয়া দিয়াছেন।

চার

বিবাহ

গান্ধীজীর বাল্য বিবাহের কথা বর্ণনা করিতে গিয়া প্রথমেই বিস্মিত হইয়া ভাবিতে হয়, যিনি চিরদিন বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন, যিনি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ভারতের সকলকে কত উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, বাল্যবিবাহের কুফল বিশেষভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তিনি কেন মাত্র তের বৎসর বয়সের সময় বিবাহের বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছিলেন ?

গান্ধীজীর বিবাহের ঘটনাই আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে।

বাল্যবিবাহ তখন ভারতের হিন্দু-সমাজে পূরাদস্তুর ভাবে প্রচলিত ছিল। দক্ষিণভারতে এই প্রথা আরও কঠোর ভাবে পালিত হইত। গান্ধী-পরিবার বংশানুক্রমিক রীতিতে সন্তান-সন্ততিদের বাল্যবিবাহ দিতেন, এমন কি বিবাহ দিবার পূর্ব্বেও সেই দেশীয় প্রথা অনুসারে পুত্রকন্যাগণের 'সগাই' করিতেন। কনে বা বর নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহের জন্য বাক্‌দান করাকে 'সগাই' বলিত। মোহনদাসের বিবাহের পূর্ব্বে দুইটি কনের সঙ্গে তাঁহার 'সগাই'* হইয়াছিল। তবে 'সগাই' ভাঙ্গিযা দেওয়া চলিত, গান্ধীজীরও এই দুইটি 'সগাই' বাতিল করিয়া নূতন পাত্রীর সহিত বিবাহ হইযাছিল।

মোহনদাসের সহিত তাঁহার মেজ ভাই এবং আর একটি খুড়তুত ভাইযেরও বিবাহের বন্দোবস্ত হইল।

ইহার কারণ ছিল। কাবা গান্ধী ও তাঁহার ছোট ভাই বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, এই বিবাহ অনুষ্ঠানগুলি ছিল তাঁহাদের পক্ষে জীবনের শেষ কাজ। তাই তাঁহারা বিশেষ জাঁকজমকের সহিত বিবাহ উৎসব পালন করিতে চাহিলেন। বুঝিলেন যে তিন পুত্রের বিবাহ একসঙ্গে হইলে বার বার বিবাহের হাঙ্গামা একেবারে সারা হইবে এবং তিনবার আলাদা আলাদা খরচ না করিয়া একেবারে

খরচ করিলে বিশেষ আড়ম্বর হইবে। তাই মোহনদাস ও তাঁহার ভাইয়েরা বিবাহ জিনিসটি কি বুঝিবার আগেই তাঁহাদের বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

বিবাহে দাম্পত্য জীবন ও ভোগের কথা তাঁহারা বুঝিলেন না। তাঁহারা ভাল ভাল পোষাক পরিলেন, ভাল ভাল খাদ্য খাইলেন, তাঁহাদের প্রতি আত্মীয়-স্বজনের হঠাৎ আদর যত্নে বিস্মিত ও পরিতৃপ্ত হইলেন। বিবাহের দিন নিকটে আসিল।

পোরবন্দরে তাঁহাদের পুরাতন বাড়ীতে বিবাহের ব্যবস্থা হইয়াছিল। গান্ধীজীর খুল্লতাত তখন পোরবন্দরের দেওয়ান, কিন্তু পিতা কাবা গান্ধী রাজকোটে ঠাকুর সাহেবের দরবারে কাজ করিতেন। তিনি ঠাকুর সাহেবের খুব প্রিয় কর্ম্মচারী ছিলেন। ঠাকুর সাহেব কাবা গান্ধীকে বেশীদিন আগে ছুটি দিতে চাহিলেন না, বিবাহের মাত্র দিন কযেক পূর্ব্বে ছুটি মঞ্জুর করিলেন। তবে গান্ধী পরিবারকে দ্রুত পোরবন্দরে পৌঁছিবার জন্য বিশেষ গাড়ীর বন্দোবস্ত করিযা দিলেন। রাজকোট হইতে পোরবন্দর আসিতে তখন পাঁচদিন সময লাগিত। বিশেষ ব্যবস্থার জন্য গান্ধী পরিবার তিনদিনে পোরবন্দরে আসিলেন। কিন্তু পথে একটি দুর্ঘটনা ঘটিল, হঠাৎ কাবা গান্ধীর টাঙ্গা উল্টাইয়া যাওযায তিনি বিশেস আহত হইলেন।

পিতা অসুস্থ হওয়ার জন্য বিবাহের আনন্দ কমিযা গেল, কিন্তু বিবাহ বন্ধ হইল না। কোনপ্রকার অনুষ্ঠান বা জাঁকজমকও বন্ধ হইল না। আহতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া কাবা গান্ধী বিবাহ উৎসবের দেখাশোনা করিতে লাগিলেন। এই বিবাহ সম্বন্ধে গান্ধীজী নিজেই বলিতেছেন—"বিবাহ-মঞ্চে বসিলাম, সপ্তপদী হইল, মিষ্টান্নের অংশ স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে গ্রহণ করিলাম, তারপর বরবধূ একসঙ্গেই থাকিতে লাগিলাম। সেই প্রথম রাত্রি। দুই নির্দ্দোষ বালক-বালিকা না জানিয়া সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপাইযা পড়িল। বড় ভ্রাতৃবধূ শিখাইয়া দিয়াছিলেন যে, প্রথম রাত্রে কেমন আচরণ করিতে হইবে। ধর্ম্মপত্নীকে—কস্তুরী-বাঈকে কে শিখাইয়া দিয়াছিল, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে স্মরণ

ছিল না। জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা বা জ্ঞানও ছিল না। পাঠকগণকে কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে আমরা উভয়েই একে অপরকে ভয় করিতেছি— এই ধরণের একটা ভাবই তখন আমাদের মনের ভিতর ছিল। একে অন্যকে লজ্জা করিতাম ত' বটেই।"

কথা কয়টির দ্বারা গান্ধীজী বুঝাইয়া দিলেন বাল্যবিবাহে সহজাত জ্ঞানের অভাবে নর ও নারী বিবাহের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে না, প্রেমের ও প্রয়োজন-বোধের অভাবে বিবাহের আনন্দ ও মাধুর্য্য উপভোগ করিতে পারে না। শুধু অজ্ঞান ও সাজান পুতুলের মত অনুষ্ঠান ও নিয়মগুলি একের পর একটি পালন করিয়া যায় মাত্র।...জীবনের সামর্থ্য ও শক্তি বুঝিবার আগেই এক বিরাট দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে তুলিয়া লয়। ইহা ছাড়া বাল্যবিবাহ ছাত্রজীবনে যে বালকের পক্ষে কত ক্ষতিকারক, তাহা গান্ধীজী নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা আমাদের সরলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। বিবাহের পর প্রেম কাহাকে বলে তাহা না জানিলেও, বধূ কস্তুরবাঈয়ের প্রতি একটা আকর্ষণ জাগিয়াছিল। নির্জ্জন ঘরে বসিয়া 'দুইজনে অর্থহীন আবোল-তাবোল বকিবার একটা মোহ জাগিয়াছিল,...তাই দিনের বেলা স্কুলে পড়িবার সময় ঐ আকর্ষণ ও মোহ তাঁহাকে ব্যাকুল করিত, তিনি পড়াশুনার দিকে মন না দিয়া বধূর স্মৃতিতেই বিহ্বল থাকিতেন...বাড়ী ফিরিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেন,...স্কুলের ছুটির জন্য অস্থির হইতেন।

নিজের অবস্থা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি ছাত্র-জীবনে বিবাহের কুফল বুঝিয়াছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ হইলে অধ্যয়ন ও জ্ঞান অর্জ্জনে যে সমূহ ক্ষতি হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। বাল্য বিবাহের জন্য কত ছাত্রই অল্পবয়সে বিদ্যাচর্চ্চা ছাড়িয়া নিজের ভবিষ্যৎ ও জীবন নষ্ট করে।

বাল্যবিবাহ জাতির জীবনে একটা কুটিল ব্যাধি, ...সত্যদ্রষ্টা মোহনদাস নিজের বিবাহের ঘটনা দ্বারা এই ব্যাধির বীভৎস চিত্র প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

পাঁচ

কিশোর মোহনদাস ও কিশোরী কস্তুরবাঈ

মহানদীর স্রোতধারা দেখিতে হইলে তাহার পথের বাধা বিপত্তিগুলিও দেখিতে হয়। তাহার চঞ্চল জলস্রোত কোন পাহাড়ে বাধা পাইয়াছিল, কোন খাদে আবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে সমস্ত বাধা ও আবর্ত্তন অতিক্রম করিয়া কিরূপে সমতল ভূমিতে তাহার ক্রমবর্দ্ধমান দেহ বিরাট ও বিশাল ভাবে ছড়াইয়া দিযাছিল এবং দুর্বার গতিবেগে সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া চলিযাছিল, তাহাও লক্ষ্য করা বিশেষ প্রযোজন!

গান্ধীজীর জীবন···মহানদীর স্রোতধারা। এই ধারা লক্ষ্য করিলে ইহার বাধা বিপত্তিগুলিও দেখা যায,···কিন্তু আবার সমস্ত মিথ্যা ও ভ্রান্তির বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিযা এই জীবনধারা কেমন ভাবে বিরাট ও বিশাল আকারে সত্য ও জ্ঞানের ভূমিতে ছড়াইযা পড়িযাছিল,···শেষ পর্য্যন্ত কোন্ গতিতে সাফল্যের শান্তিময় সমুদ্রে ছুটিযা চলিযাছিল, তাহাও পরিষ্কার ভাবে দেখা যায।

তাঁহার ছাত্র জীবনের ছোট ছোট ঘটনাগুলি, তাহার জীবনের দাম্পত্য-কলহগুলি এবং প্রথম যৌবনের কপট বন্ধুর সংসর্গগুলি, তাঁহার বাধাবিপত্তি জযের উজ্জ্বল দিকটি ফুটাইযা তোলে। গান্ধীজীর কৈশোরের দাম্পত্য জীবন তাঁহার যেন পরীক্ষা-ক্ষেত্র হইল। স্বাভাবিক জ্ঞান জন্মিবার প্রথম মোহে পড়াশুনার কি ক্ষতি হইযাছিল, তাহা আমরা জানিযাছি। মোহ জয করিযা কেমন ভাবে তিনি বিদ্যালাভে পুনরায় উদ্যমী হইযাছিলেন তাহাও জানিয়াছি। কিন্তু স্ফুটনোন্মুখ দাম্পত্য-জীবন কিরূপে তাঁহাকে মাৎসর্য্য, দম্ভ ও পতনের মধ্যে টানিয়া আনিতেছিল, এবং কি শক্তিতে ঐ পতনের বেগ রোধ করিয়া তিনি আবার সহজ গতির মধ্যে পা বাড়াইয়াছিলেন তাহা আমরা একবার জানিতে চেষ্টা করিব। তিনি বাল্যকালের অপূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা বহুবার সহধর্ম্মিণী

কস্তুরবাঈকে জ্বালাতন ও পীড়ন করিয়াছিলেন। একদিন একটি উপদেশ-মূলক পুস্তকে দাম্পত্য জীবন বিষয়ে কতকগুলি উপদেশের কথা পড়িলেন। উহাতে দম্পতি প্রেম, মিতব্যয়িতা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ছিল। ঐ পুস্তকে নিষ্ঠার সহিত 'একপত্নীব্রত' পালন করিবার জন্য যুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। ঐ যুক্তি তাঁহার মনে প্রভাব বিস্তার করিল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, তিনি পূর্ব্বপুরুষগণের মত বহু বিবাহ করিবেন না, কস্তুরবাঈকে মনোকষ্ট দিয়া দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিবেন না।

কিন্তু তাঁহার এই সঙ্কল্প আর একদিক দিয়া আবার এমন ভুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল, যে তাহার ফলে তিনি এবং কস্তুরবা' জীবনে অনেক ছোটখাট কষ্ট ও মনোবেদনা ভোগ করিয়াছিলেন।

তিনি ভাবিলেন, তিনি যখন একপত্নীব্রত পালন করিবেন, তখন কস্তুরবাঈকেও অবশ্য একপতিব্রত পালন করাইবেন। তখনকার সমাজে পতিত্যাগ ও পুনর্বিবাহ নারীদের পক্ষে কল্পনাতীত হইলেও তিনি কস্তুরবাঈকে এই বিষয়ে শিক্ষা ও উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং ইহা পালন করিবার জন্য সরলা বালিকাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তিনি স্ত্রীকে তাঁহার বিনা অনুমতিতে বাড়ীর বাঁহির হইতে বা অন্য পুরুষের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু সরলা বালিকা তাহা শুনিবে কেন। ইহাতে তাঁহার নিষ্পাপ অন্তঃকরণে জেদ আরও বাড়িয়া গেল, কস্তুরবাঈ স্বামীর আদেশ অগ্রাহ্য করিবার জন্যই আত্মীয়গণের সহিত বাহিরে যাইতে লাগিলেন। শাশুড়ীদের সহিত হাবেলীতে ঠাকুর দর্শন করিতে যাইতে লাগিলেন। ফলে একটি ভুল মনোমালিন্য ও মান-অভিমানের সৃষ্টি হইল।

কিন্তু জেদ ও মিথ্যা-যুক্তির মোহ সময়মত কমিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে মোহনদাসও নিজের চেষ্টায় ভুল ধরিতে পারিলেন, আর তখন স্ত্রীর প্রতি পীড়নের মনোভাব পরিত্যাগ করিলেন। অবশ্য এই ভুল সংশোধনের মূলে উভয়ের ক্রমবর্দ্ধমান প্রেমই প্রধান কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

বয়সের পরিণতির সহিত ভালবাসাও যত গভীর হইতে লাগিল, পরস্পরের ভুল ও জেদগুলিও ততই মরীচিকার মত কোন শূন্যে মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

একবার তাঁহার ইচ্ছা হইল, কস্তুরবাঈকে লেখাপড়া শিখাইবেন। তখনকার দিনের প্রায় সমস্ত মেয়েদের মত কস্তুরবাঈ মূর্খ ও নিরক্ষর ছিলেন। আর শিশুকালে জ্ঞানের কুঁড়িটি ফুটিবার আগেই যাঁহাকে বধূ সাজিয়া স্বামীর ঘরে আসিতে হইয়াছিল, তিনি লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ বা অবসরই বা পাইবেন কেমন করিয়া! কিন্তু কস্তুরবাঈ স্বামীর চেষ্টা সত্ত্বেও লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ দিলেন না আবার দ্বন্দ্ব ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল। পরে অবশ্য কস্তুরবাঈ কাজ চালানর মত কিছু কিছু লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীর তখনকার জেদে তিনিও জেদ করিয়া লেখাপড়ার প্রতি বাঁকিয়া বসিলেন। যাহা হৌক এই মিথ্যা মনোমালিন্য হইতেও তাঁহারা ক্রমে ক্রমে মুক্তি পাইলেন, আবার তাঁহাদের স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু কিশোর মোহনদাস তখন পর্য্যন্ত নিষ্কলুষ প্রেমের মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন নাই, আর ঐ বয়সে উহা বোঝা তাঁহার পক্ষে বিশেষ সম্ভবও ছিল না। তাই প্রেমের বদলে কাম তাঁহার কামনাকে পাইয়া বসিল। বিদ্যালযে গিয়া তিনি কস্তুরবাঈয়ের কথা ভাবিতেন। তাঁহার মন ভুল পথ ধরিল, স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

কিন্তু প্রকৃত মানুষ যে, সে ভুলও যেমন করে, আবার ভুলকে সংশোধনও তেমনি করে। এই সব শত ভুল-ভ্রান্তির মধ্যেও মোহনদাসের কর্ত্তব্যপরায়ণতা সমানভাবে জাগিয়া ছিল। তাঁহাকে সকালে নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে, বিদ্যালয়ে যাইতে হইবে, রুগ্ন পিতার সেবা ও শুশ্রূষা করিতে হইবে, এই সকল কর্ত্তব্য ও ধারণা তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে কামের গোলক ধাঁধা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিল, আবার সত্য ও বিশুদ্ধ পথের সন্ধান দেখাইয়া দিল।

মোহ ও মিথ্যার কুহকজাল ভেদ করিয়া সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতি দর্শন··· ইহাই ছিল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জীবনে এক অপূর্ব্ব সমস্যার সমাধান!

ছয়

ভুলের দুঃখ

লাজুক মোহনদাসের বন্ধু বিশেষ ছিল না বলা যায়। কিন্তু বালক একেবারে সঙ্গী বর্জ্জন করিয়া থাকিতে পারে না। মোহনদাসেরও দুই একজন বন্ধু জুটিল। পরিণত বয়স্কদের ধূমপান করা দেখিয়া একদিন তাঁহাদেরও মনে বিড়ি খাইবার কৌতূহল জাগিল। কিন্তু বিড়ি খাওয়ায় কিছু লাভ আছে অথবা বিড়ির গন্ধ ভাল লাগে, এরকম ধারণা কাহারও মনে তখন জাগে নাই। শুধু কৌতূহলের বশে, একটা মজা ও নূতনত্ব উপভোগ করিবার প্রেরণায় তাঁহারা বিড়ি খাইতে ইচ্ছা করিলেন। ভাবিলেন, বড়রা কেমন করিয়া বিড়ি খাইয়া ধোঁয়া ছাড়ে, আমরাও দেখিব।

তাঁহারা বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য প্রথম প্রথম বড়দের ফেলিয়া দেওয়া বিড়ি বা সিগারেটের টুকরাগুলি খাইতে লাগিলেন। কিন্তু পোড়া বিড়িতে বেশী ধোঁয়া বাহির হয় না দেখিয়া হতাশ হইলেন। অগত্যা সাধ পূর্ণ করিবার জন্য বাড়ীর চাকর-বাকরদের পকেট হইতে দু'টি একটি পয়সা চুরি করিয়া গোপনে ধূমপানের আনন্দ উপভোগ করিতে চেষ্টা করিলেন। ইতিমধ্যে শুনিলেন, একরকম গাছের পাতা বিড়ির মত পাকাইয়া টানিলে উহা হইতে প্রচুর ধোঁয়া বাহির হয়। তাঁহারা উহা যোগাড় করিয়াও ধূম-পান করিলেন। কিন্তু গোপনে বা চোরের মত লুকাইয়া সন্তর্পণে আর ভয়ে ভয়ে এই ধূমপানের মধ্যে কোন আনন্দই তাঁহারা পাইলেন না। বড়দের কাছে এই পরাধীন অবস্থার জন্য মোহনদাস ও তাঁহার সঙ্গীর মনে বড়ই কষ্ট হইল। তাঁহারা শেষে এই অসহ্য পরাধীনতা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। আত্মহত্যা করিবার জন্য ধুতুরার বীজ যোগাড় করিলেন এবং স্থানীয় কেদারজীর মন্দিরে যাইয়া দেবতার সামনে কষ্টকর পরাধীন জীবন বিসর্জ্জন দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মন্দিরে যাইবার পর

কিন্তু মোহনদাসের মন অন্য যুক্তিতে বাঁকিয়া বসিল,—"মরিয়া লাভ কি? এত সামান্য কারণে আত্মহত্যা করিব?—এর চেয়ে না হয় পরাধীনই থাকিব।"

মোহনদাসের যুক্তি তাঁহার সঙ্গীও গ্রহণ করিল। আত্মহত্যার বাসনা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা আবার বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

মিথ্যা ব্যাভিচারকে স্বাধীনতার নাম দিয়া যে ভুল তিনি মনে মনে পোষণ করিয়াছিলেন, সেই ভুলকে সেদিন দেবমন্দিরের দেবতার সামনে পরিহার করিয়া কল্পিত দুঃখ হইতে উদ্ধার পাইলেন।

বালক মোহনদাসের আত্মশুদ্ধির এই গল্প পড়িয়া আমাদের মনে জাগে মহাত্মা মোহনদাসের বার বার প্রায়োপবেশনের কথা। বালসুলভ অবস্থার মধ্যেও একদিন যিনি স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে সত্য দর্শন করিয়াছিলেন, পরিণত বয়সে সেই পবিত্র ও মহান আত্মাই সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কতবার হাসিমুখে প্রশান্ত মনে জীবন বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

আর একবার কোন কারণে তিনি আর একটি অন্যায় করেন, কিন্তু তিনি নিজের অন্যায় বুঝিতে পারেন এবং এক অভিনব উপায়ে শীঘ্রই অন্যায়ের বোঝা হইতে মুক্তি লাভ করেন।

তাঁহার মেজ ভাই কোন কারণে টাকা পঁচিশ 'ধার করেন। কিন্তু কিছুতেই এই ধার শোধ করিতে পারেন না। তখন মোহনদাসের পরামর্শ অনুসারে তাঁহার হাতের সোনার তাগা হইতে এক তোলা সোনা কাটিয়া লইয়া উহা গোপনে বিক্রয় করিয়া ধার শোধ করিলেন।

কিন্তু এই কাজ মোহনদাসের মনে বড়ই কষ্ট দিতে লাগিল,—কেহ না জানিলেও ইহাও তো এক রকম চুরি, অতএব ইহা অন্যায় ও পাপ।

বালক প্রতিজ্ঞা করিল আর কখনো সে এমন কাজ গোপনে করিবে না। শুধু প্রতিজ্ঞা নহে, নিজের অপরাধ পিতার নিকটে অকপটে স্বীকার করিয়া অপরাধ হইতে মুক্ত হইবার বাসনা তাঁহার হইল। কিন্তু পিতাকে সামনা-সামনি এই কথা বলা বড়ই কঠিন ও লজ্জার বিষয়। তাই তিনি একটি চিঠিতে

নিজের সমস্ত দোষ খুলিয়া লিখিলেন এবং শেষে পিতার নিকটে অনুতাপের সহিত ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। ইহার পর চিঠিটি পিতার হাতে দিলেন।

এই সময়ে তাঁহার পিতার অসুখ বিশেষ ভাবে বাড়িয়াছিল। তিনি শুইয়া ছিলেন। বিস্মিতভাবে তিনি পুত্রের হাত হইতে চিঠিখানি লইয়া পড়িলেন। পড়িতে পড়িতে রোগকাতর পিতার চোখ দিয়া অঝোর ধারায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িল!

পুত্রের এই মহান সাহস ও আত্মস্বীকার দেখিয়া স্নেহপ্রবণ রুগ্ন পিতা কাঁদিতে লাগিলেন, আর পিতৃভক্ত পুত্রও আত্মানুশোচনায় ও পিতৃস্নেহে বিগলিত হইয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন।

গুণগ্রাহী পিতা ও ধার্ম্মিক পুত্রের এ এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় দৃশ্য!

পিতার শাস্তির বদলে স্নেহের অশ্রুধারায় অনুশোচনাকারী সন্তানের সমস্ত পাপ ও অনুতাপ ধুইয়া গেল,······মোহনদাস অসত্যকে জয় করিয়া সত্যকে গ্রহণ করিবার শক্তি ফিরিয়া পাইলেন।

কিন্তু ভ্রান্তি ও মিথ্যাকে জয় করিয়া সত্যের অভ্রভেদী শুভ্র চূড়ায় আরোহণ করাই যাঁহার জীবনের ব্রত হইয়াছিল, সংসারের ভ্রান্তি ও মিথ্যায় পিশাচ ও কুহকিনীর দল অত সহজে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিল না।

তাই তাহারা তাঁহার মহান্ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বার বার তাঁহাকে নানাভাবে নানাবেশে আক্রমণ করিয়াছিল,······কিন্তু প্রতিবারই তাঁহার সত্য ও ন্যায়ের অস্ত্রে আহত ও জর্জ্জরিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

বাল্যকালে ভুল ও অসত্যকে জয় করিবার আর একটি ঘটনা আমরা এখানে আলোচনা করিব।

হাইস্কুলে পড়িবার সময়ে তাঁহার কয়েকটি সঙ্গী জোটে। সেই সময়ে রাজকোটে সংস্কারের বান ডাকিয়াছিল, নব ভাব ও নূতন চিন্তায় দেশের যুবকদের মন উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। ইংরাজ শাসকগণের শক্তি ও

বীরত্ব যুবকদের মধ্যে তখন নূতন প্রেরণা ও উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছে এবং ঐ প্রেরণার ফলে অনেকে স্বদেশের মুক্তি ও প্রতিষ্ঠার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। মোহনদাসের একজন সঙ্গী তাঁহাকে দিনের পর দিন নানাভাবে বুঝাইতে লাগিল—দেখ, আমরা মাংস খাই না বলিযাই দুর্ব্বল হইয়া আছি। ইংরাজেরা মাংস খায় বলিয়াই আমাদের উপর প্রভুত্ব ও রাজত্ব করিতে পারে। তাহার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ। আমার শরীর কত শক্ত, আমি কত দৌড়াইতে পারি। তাহাতো তুমি জান। কিন্তু আমি মাংসাহার করি বলিযাই এমন হইযাছি। তা'ছাড়া, মাংসাহারীদের ফোড়া পাঁচড়া ইত্যাদি হয না, যদি হয় তবে শীঘ্রই সারিয়া যায়। দেখনা, আমাদের অনেক শিক্ষক পর্য্যন্ত আজকাল মাংস খান। এত নামজাদা লোক মাংস খান, তাঁহারা কি না বুঝিযাই খান ? অতএব মোহনদাস, তোমারও মাংস খাওযা উচিত। খাইয়া দেখ, দেখিবে তোমারও আমার মত গাযে জোর হইয়াছে।

সে শুধু মুখে বুঝাইত না। তাহার নিজের সবল দেহ বাঁকাইয়া শক্তিও দেখাইত। সে মোহনদাসেব মেজ ভাইকেও তাহাব দলে টানিয়াছিল, তাঁহার মেজ ভাইও, ক্ষীণকায মোহনদাস অপেক্ষা সবল ও সাহসী ছিল। সঙ্গীটি ও তাঁহার মেজভাই ইচ্ছামত দৌড়াদৌড়ি করিত, লাফালাফি করিত, নানাপ্রকার কসরৎ করিত।

মোহনদাস নিজে দুর্ব্বল ও ভীরু ছিলেন। তিনি সঙ্গীদের প্ররোচনা শুনিতে শুনিতে ও তাঁহার দৈহিক শক্তির অল্পতা দেখিতে দেখিতে রুচির জন্য না হইলেও আদর্শের জন্যও শেষ পর্য্যন্ত মাংস খাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

মোহনদাসের আদর্শেরও একটি অর্থ ছিল। তখনকার নব ভাব ও নূতন চিন্তার ঢেউ তাঁহার কল্পনাপ্রবণ মনকেও দোলা দিয়া গিয়াছিল। তাই নূতন ভাবে বিভোর হইয়া শেষ পর্য্যন্ত তিনিও ভাবিতে লাগিলেন—"মাংসাহার করা ভাল, তাহাতে আমি বলবান ও সাহসী হইব। আর

সমস্ত দেশের লোক যদি মাংসাহার করে তবেই ইংরাজদের হারাইতে পারে।'

তাঁহার মনের মধ্যে ঐ সঙ্গে বিদ্যালযের ছেলেদের গীত নূতন একটি গানের টুক্‌রা ভাসিতে লাগিল—

ইংরাজ রাজত্ব করে
দেশীকে রাখে দাবিযা,
লম্বায সে পাঁচ-হাত পূরা
মাংসাহারী বলিযা।

ইংরাজ বিতাড়নের এই অস্পষ্ট আদর্শকে সার্থক করিবার জন্য কিশোর মোহনদাস সঙ্গীর কুহকজালে বাঁধা পড়িলেন,……অবশেষে মাংস আহার করিতে সম্মত হইলেন।

কিন্তু সম্মত হইলে কি হইবে।

আহার করা অত সহজ ছিল না।

তাঁহারা ছিলেন বৈষ্ণব। গুজরাটের বৈষ্ণবগণেব পক্ষে মাংসাহার করা অতিশয নিন্দনীয কাজ। তাহা ছাড়া তাঁহার ধর্ম্মপরাযণা মাতা ও ধার্ম্মিক পিতা গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন, বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান তাঁহারা নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। তাই মোহনদাস সঙ্গীর সহিত পরামর্শ করিযা স্থিব করিলেন, পিতামাতা ও আত্মীয-স্বজনেব অগোচরে গোপনে মাংস ভক্ষণ করিবেন।

প্রথম মাংস ভোজনের স্থান নির্ব্বাচিত হইল এক নির্জ্জন নদীর তীর। অন্যান্য সঙ্গীরা মহানন্দে মাংস ভক্ষণ করিলেন। মোহনদাস কিন্তু দুই এক টুকরা চিবাইলেন মাত্র, একটুও গলাধঃকরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার ধর্ম্মের সংস্কার আসিয়া যেন তাঁহার বাসনাকে বিস্বাদ করিয়া দিল।

সেইদিন রাত্রে মোহনদাস ঘুমাইতে পারিল না, বার বার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল।—এই মাংস, এই তাহার স্বাদ!—এরই জন্য কেন মাংস

খাইলাম ?—কিন্তু পরে আবার অবসাদগ্রস্থ মনকে বুঝাইলেন, না না, মাংস খাইতেই হইবে, নহিলে দেশ স্বাধীন করিতে পারিব না।

অরুচি সত্ত্বেও আবার স্থান ও কাল নির্দ্ধারিত করিয়া মাংস ভোজন চলিতে লাগিল। যেদিন মাংস ভোজন করিতেন, সেইদিন বাড়ী আসিয়া মাকে মিথ্যা কথা বলিতেন,—'আজ ক্ষুধা নাই,—আজ হজম হয় নাই।'

একদফা সংস্কারের বিরুদ্ধে মাংস ভোজন, আর একদফা মার কাছে মিথ্যাভাষণ! মোহনদাসের অন্তর অবরুদ্ধ বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। 'তিনি মিথ্যাবাদী······তিনি প্রতারক!' হৃদয় যন্ত্রণার অনুতাপে জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। 'অবশেষে স্থির করিলেন, 'ভারতকে স্বাধীন করিবার জন্ম মাংস খাওয়ার আবশ্যক থাকিলেও মাতাপিতার কাছে মিথ্যা কথা বলা বড় পাপ। অতএব আর মিথ্যা বলিব না, পিতামাতা জীবিত থাকিতে আর মাংস খাইব না। তাঁহাদের মৃত্যুর পর নিজেও খাইব এবং ভারতেও মাংসাহারের উপকারিতা প্রচার করিব।'

কথাটা সঙ্গীদের বুঝাইয়া মোহনদাস মাংস ভক্ষণ ত্যাগ করিলেন।······কিন্তু সেই ত্যাগ চিরকালের জন্ম। বড় হইয়া ভবিষ্যৎ জীবনে গান্ধীজীকে আর কোনদিন মাংসাহারের উপকারিতা প্রচার করিতে হয় নাই। তখন মাংস আহারের বদলে যে মন্ত্রবলে সমগ্র ভারতবাসীকে সবল করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা অভিনব ও অতুলনীয়।

মাংসহারী এই সঙ্গীটির কুপরামর্শে পড়িয়া একবার মোহনদাস এক জঘন্য ব্যাভিচার করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেবার তাঁহার লাজুক স্বভাব তাঁহাকে ঐ বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

সঙ্গীটি একবার গণিকালয়ের কল্পিত মনোরম চিত্র বর্ণনা করিয়া মোহনদাসের অন্তরকে ভ্রান্ত ও মোহিত করিয়া তুলিল। একদিন দুইজনেই গণিকালয়ে গেলেন। সঙ্গীটি পূর্ব্ব হইতে সমস্ত বন্দোবস্তই করিয়া রাখিয়াছিল। সে মোহনদাসকে জনৈকা গণিকার বিছানায় বসাইয়া দিল।

ছোট একটি ফুলের কুঁড়ি···নিষ্পাপ······নিষ্কলুষ······

কুঁড়িটি ফুটিতে চায়······তাহার দল মেলিয়া······শুভ্র······অমলিন দল।

পাশ হইতে এক দুষ্ট বাতাস ছুটিয়া আসিল······তাঁহার সুগন্ধ হরণ করিতে চাহিল······

কিন্তু ফুলের কুঁড়িকে ঈশ্বর····· মঙ্গলময় ঈশ্বর রক্ষা করিলেন······

বাতাসকে দেখিয়া কুঁড়িটি আকস্মিক লজ্জায় গাছের পাতার ঝোপে পলাইল—অকস্মাৎ সঙ্কুচিত হইল।

কুঁড়ির সেই মুহূর্ত্তের লজ্জা তাহাকে রক্ষা করিল।

কুঁড়িটি আবার তাহার দল মেলিয়া বিকশিত হইবার সুযোগ পাইল!

কিশোর মোহনদাস,···নিষ্পাপ···নিষ্কলুষ···

জীবনের উদ্যানে ফুটিতে চান,···দল মেলিয়া,···সত্য সরলতা ও ন্যায়ের শুভ্র দল······

তাঁহার পাশে······শয্যার উপর আসিয়া বসিল কামান্ধ বারবনিতা······

তাঁহার সত্য সারল্য ও ন্যায়ের শুভ্রতা হরণ করিতে চাহিল,······ তাঁহাকে মনুষ্যত্বের উচ্চতা হইতে নরকের গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে চাহিল, ······পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত করিতে চাহিল······

কিন্তু সরল কিশোরকে রক্ষা করিলেন ঈশ্বর ·····মঙ্গলময় ঈশ্বর!

বারবনিতাকে দেখিয়া অকস্মাৎ মোহনদাসের অন্তরে কী এক তীব্র লজ্জার বেগ জাগিয়া উঠিল,······

সে বেগ···সে উচ্ছ্বাস মোহনদাস সহ্য করিতে পারিলেন না,···একটিও কথা বলিতে পারিলেন না,······

শুধু আরক্ত মুখে······আরক্ত চোখে ·····কম্পিত দেহে সেই শয্যা হইতে নামিয়া পড়িলেন······দ্রুতপদে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সেদিনের মুহূর্ত্তের লজ্জা কিশোর মোহনদাসকে বিরাট পতন হইতে রক্ষা করিল।

সেদিনের পাপ রোধ করিতে তিনি লজ্জার আশ্রয় লইযাছিলেন, কিন্তু উত্তরকালেঁ লইয়াছিলেন সংযম, সাহস ও অহিংসার আশ্রয়। তাঁহার সাহস ও অসত্য দমনের জন্ত সংগ্রাম পৃথিবীর ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকিবে।

সঙ্গীরূপী এই কুগ্রহটি নানা ভাবে ব্যর্থ হইয়াও মোহনদাসের সঙ্গ ছাড়িল না, তাঁহাকে নূতন কুমন্ত্রণা দিতে ছাড়িল না।

সে জানিত কিশোর মোহনদাস বিবাহিত। সে সময বুঝিয়া মোহনদাসকে আবার কুপরামর্শ দিতে লাগিল,—স্বামীত্বের অধিকার অনধিকারের যুক্তি দিয়া কিশোরের সরল মনকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল, সন্দিগ্ধ ও সংকীর্ণ করিয়া তুলিল! পরিণামে মোহনদাসের দাম্পত্য জীবন অসুখকর ও অশান্তিপূর্ণ হইল! মোহনদাস সঙ্গীর পরামর্শমত কস্তুরবাঈয়ের উপর প্রভুত্ব ফলাইতে গেলেন, অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সেই ভ্রান্তি ভাঙ্গিয়া গেল,······মোহনদাস ঈশ্বরের কৃপায় ক্রমে ক্রমে সঙ্গীটির অসৎ পরামর্শ ও নিজের একগুঁয়েমী বুঝিতে পারিলেন, ভুল কামনা ও কল্পনা পরিত্যাগ করিলেন,······বন্ধুরূপী ঐ কপট সঙ্গীটিকেও পরিত্যাগ করিলেন,···আবার ভুলের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সত্য ও আলোকের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন!

সাত

ধর্ম্মের আলো ও কিশোর মোহনদাস

আমরা দেখিযাছি, ভ্রান্তি ও পাপের অন্ধকার আলোকদীপ্ত জীবনকে ঢাকিতে চাহিযাছিল, কিন্তু আলোকের ক্রমবর্দ্ধমান শিখার তেজে পরাজিত হইয়া শেষে পাপ, অসত্য, ভ্রান্তি, প্রভৃতি নিজেরাই কোন অজ্ঞাত অন্ধকারে পলায়ন করিল।

এইবার মোহনদাস করমচাঁদের প্রথম জীবনের ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মলাভ সম্বন্ধে কিছু জানিতে চেষ্টা করিব।

বিদ্যালয়ে মোহনদাস ধর্ম্ম বিষয়ক কোন শিক্ষা পান নাই। কেবলমাত্র চারিদিকের আবেষ্টন হইতে ও স্বাভাবিক সংস্কারবশে নানাপ্রকার ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু না কিছু শিক্ষা ও ধারণা লাভ করিয়াছিলেন।

লৌকিক হিন্দুধর্ম্মের মূল উৎসস্থান দেবমন্দিরগুলি হইতে মোহনদাস কোন ধর্ম্মভাব বা ভক্তি লাভ করেন নাই। কারণ বাল্যকালেই মন্দিরের অধিকারী ও পূজারীগণের দুর্নীতি ও স্বার্থপরতার গল্প শুনিতে শুনিতে মন্দিরের দেবদেবী ও ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে তাঁহার মনে একটা অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়াছিল।

কিন্তু যে রত্ন তিনি বিদ্যালযে অথবা দেবমন্দিরে ও হাবেলীতে পান নাই, তাহা তাঁহার অশিক্ষিত ধাত্রীমাতা রম্ভাবাঈয়ের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে লাভ করিয়াছিলেন। ধাত্রী রম্ভাবাঈ মোহনদাসকে নিজের সন্তানের মত ভালবাসিতেন। বাল্যকালে মোহনদাস ভূতপ্রেতকে ভয় করিতেন, দৈত্য দানবের গল্প শুনিয়া কাঁপিতে থাকিতেন, রাক্ষসখোক্কসের কাহিনী শুনিয়া 'দাইমার' কোলে মুখ লুকাইতেন। দাইমা হাসিতেন, কিন্তু তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিতেন, 'ভয় কি মোহনদাস, ভূতপ্রেতই বল আর রাক্ষসখোক্কসই বল, রামজীর নাম শুনলে তারা সবাই ভয়ে—পালিয়ে যাবে। রামজী খুব শক্তিশালী ঠাকুর। তোমার যখন ভয় করবে তখনই তুমি রামজীর নাম স্মরণ

করবে।' ভীরু বালক দাইমার উপদেশে রামজীকে স্মরণ করিতেন, আগ্রহভরে ...ভক্তিভরে স্মরণ করিতে করিতে মনে একটা ভরসা আসিত, একটা বিশ্বাস আসিত। মোহনদাস এইভাবে ভয়কে জয় করিতেন।

এই রামজীই মহাত্মার মহান জীবনে পরে এক অপূর্ব্ব সত্য ও ধর্ম্মের আলো প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন। বাল্যকালের ত্রাণকর্ত্তা রামজী ভবিষ্যতে সর্ব্বধর্ম্মের সারবস্তু-স্বরূপ স্বয়ং ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন ও জীবনের বহু সন্দেহ সংশয় ও অন্যায়ের মধ্যে একমাত্র আরাধ্য ও পথপ্রদর্শকরূপে পূজিত হইয়াছিলেন।......এই রাম ও রামনাম গানের মধ্য দিয়াই মহাত্মা গান্ধী 'খোদা হরি ও গডে'র সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন, আবার জীবনের শেষমুহূর্ত্তে প্রথম জীবনের ঐ সান্ত্বনাদায়ী নাম, 'হা রাম—হা রাম' বলিতে বলিতে চিরদিনের জন্য এই পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছিলেন।

মোহনদাস তাঁহার ধর্ম্মজীবনে বীজমন্ত্র পাইয়াছিলেন রামনামের মধ্যে, আর ঐ মন্ত্র তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন তাঁহার স্নেহশীলা অশিক্ষিতা ধাত্রীমাতা।

অশিক্ষিতা হইলেও দাইমা রম্ভাবাঈ হইয়াছিলেন তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম ও প্রকৃত গুরু। তিনি যেমন রম্ভাবাঈযের নিকট হইতে রাম নাম পাইয়াছিলেন, তেমনি পোরবন্দরের বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের মোহান্ত লাধ মহারাজের নিকট হইতে রামের লীলা এবং মাহাত্ম্যও শুনিয়াছিলেন। মোহনদাস একবার তাঁহার পিতার অসুখের সময় রাজকোট হইতে পোরবন্দরে যাইয়া সেখানে কিছুদিন বাস করেন। এই সময়ে তিনি ঐ সহরের প্রসিদ্ধ বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গিয়া মন্দিরের পণ্ডিত মোহান্ত ও পূজারী লাধা মহারাজের নিকট রামায়ণ গান শুনিতেন।

লাধা মহারাজ পণ্ডিত...সুগায়ক...সুবক্তা। রামায়ণের করুণ ও ভক্তিরসাত্মক কাহিনী তিনি মধুর কণ্ঠে গাহিতেন,......সুন্দর ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেন।

গাহিতে গাহিতে ভক্ত মহারাজ ভাবে তন্ময় হইয়া যাইতেন। মোহনদাসের কচি মনে সেই মধুর কণ্ঠ, সেই সুললিত ব্যাখ্যা, সেই স্বর্গীয় ভাব একটা অদম্য প্রভাব বিস্তার করিত। তিনি গান শুনিতে শুনিতে আনন্দে বিভোর হইয়া যাইতেন।

লাধা মহারাজের রামায়ণ-পাঠ মোহনদাসের মনে চিরদিনের জন্য অটুট রামায়ণ-প্রীতি জাগাইয়া তুলিল,—রামের পিতৃভক্তি……রামের সত্যরক্ষা… … রামের প্রজাবাৎসল্য ও মহান ত্যাগ বালকের মনে একটা অপূর্ব্ব ভক্তি ও আদর্শের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিল।

কিন্তু তাঁহার এই রামভক্তি বাল্যকালেই কেমন করিয়া সর্ব্বধর্ম্মের প্রতি ভক্তির মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিল তাহাও এখানে বলা প্রয়োজন।

তাঁহার পিতা প্রায়ই জৈন সাধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে ধর্ম্মবিষয়ক অনেক আলোচনা শুনিতেন। আবার মধ্যে মধ্যে তাঁহার পিতার অনেক মুসলমান ও পারসীক বন্ধুবান্ধব তাঁহাদের বাড়ীতে আসিতেন এবং নিজ নিজ ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করিতেন। বালক মোহনদাস পিতাকে শুশ্রূষা করিতে করিতে ঐ সকল আলোচনা একাগ্রমনে শুনিতেন। ফলে বাল্যকাল হইতেই বিভিন্ন ধর্ম্মকে জানিবার ও ঐ সব ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিবার একটা দৃঢ় মনোবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে জাগিতে লাগিল।

যে মোহনদাস একদিন দেশপূজ্য হইয়া 'সকল ধর্ম্মই এক ও সত্য' এই বাণী প্রচার করিয়াছিলেন,……তিনি বোধহয় পিতার ঐ সব অতিথি ও বন্ধুগণের নিকট হইতেই তাঁহার অন্তরের উদারতা লাভ করিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে খৃষ্টের বাণী ও শিক্ষা তাঁহার অন্তরকে মুগ্ধ করিলেও, বালক জীবনের আবহাওয়ায় উহা তাঁহার মনে কোন আকর্ষণ জাগাইতে পারে নাই, ……বরং বলিতে হয় আকর্ষণের বদলে কিছু ঘৃণাই জাগাইয়াছিল।

ইহার কারণ তিনি নিজেই বেশ সরলভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—

ধর্ম্মের আলো ও কিশোর মোহনদাস

"বাল্যকালে খৃষ্টানধর্ম্মের প্রতি আমার একটা অভক্তি জন্মিল। সেই সময়ে হাইস্কুলের এককোণে দাঁড়াইয়া পাদরীরা কখনও কখনও খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। এই বক্তৃতায় হিন্দু-দেবতা ও হিন্দুধর্ম্মালম্বীগণকে গালি দেওয়া হইত। ইহা আমার নিকট অসহ্য লাগিত। মাত্র একদিন আমি বক্তৃতা শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলাম। সেই একদিনই যথেষ্ট। তারপর আর দাঁড়াইবার প্রয়োজন হয় নাই।"

খৃষ্টান ধর্ম্মের মধ্যে সত্য থাকা সত্ত্বেও মিশনারীগণ পরচর্চ্চা ও পরনিন্দার জন্য বালক মোহনদাসের মনে একটা বিরাগ ও বিতৃষ্ণা জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন।

দুধ ও জলে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে……কিন্তু চতুর হাঁস…

সে জলের অসার অংশটুকু বাদ দিয়া শুধু সুপেয় দুধটুকু চুমুক দিয়া পান করিল!

বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে সত্য ও অসত্য মিশিয়া গিয়াছে·· ··

বুদ্ধিমান মোহনদাস……

তিনি তরুণ বয়সেই সকল ধর্ম্মের কুসংস্কার অসত্যকে বাদ দিয়া সারটুকু গ্রহণ করিতে শিখিলেন।

বাল্যকালের এই বিভিন্ন ধর্ম্মজ্ঞান তরুণ বয়সে তাঁহাকে প্রত্যেকটি ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে প্রেরণা যোগাইয়াছিল, এবং উহাই অবশেষে বিভিন্ন ধর্ম্মের সমন্বয়ে এক সুসংস্কৃত ও সুমহান বৈপ্লবিক হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচারে সাহায্য করিয়াছিল। এই সময়ে বিশেষ ধর্ম্মের শিক্ষা ও প্রভাব ছাড়াও দেশের প্রচলিত তখনকার অনেকগুলি সুনীতি এবং উপদেশও তাঁহার মনে অনেক সৎ ভাব ও সৎ শিক্ষা প্রদান করিয়াছিল। গুজরাটী সাধুব্যক্তিগণ ও পণ্ডিতগণ দেশী ছড়া ও কবিতার ভিতর দিয়া দেশবাসীর মধ্যে নীতি ও আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ সকল নীতিমালার কয়েকটি চরণ গান্ধীজী নিজেই আমাদের শুনাইয়া গিয়াছেন।

"পান করিবার জল যদি পাও অন্ন করিও দান,
মিষ্টি ফলটি ভাগ্যে জুটিলে মাটিতে নোয়াও শির।
কড়ির বদলে দান করে যেও তুমিও মোহরের থাণ,
পরাণ বাঁচালে, জীবন দিয়া দুঃখে বরিও বীর।
জ্ঞানী যারা করে কথা ও কাজের এমনি করেই মিল—
যে কোন ক্ষুদ্র সেবায় তাহারা দশগুণ দেয় ফিরে
সকল মানুষে এক বলে জানে মহৎ জনের দিল।
অপকার যারা করে তাদেরও উপকারে রাখে ঘিরে"। *

কিন্তু এই ধর্ম্মশিক্ষার সময়ে হিন্দুধর্ম্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ভাগবৎ তাঁহার মনে কোন ভক্তি বা প্রভাব জাগাইতে পারে নাই। তবে ভাগবতের ভিতরের শিক্ষার অভাবের জন্যই ঐ অভক্তি জাগে নাই,······বরং ঐ বয়সে ভাগবৎ বুঝিবার বুদ্ধি ও সাহায্যের অভাবের জন্যই উহা জাগিয়াছিল। পরে বড় হইয়া অবশ্য ভাগবতের সত্য ও সার বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সত্যপিপাসু অন্তর আনন্দে ও উদ্দীপনায় মাতিয়া উঠিয়াছিল।

প্রথম জীবনে মনুসংহিতার দেশীয় অনুবাদ পড়িয়াও তিনি বিশেষ প্রীতি লাভ করেন নাই, বরং মনুপ্রণীত স্মৃতি গ্রন্থ পড়িয়া অহিংসা সম্বন্ধে কিছু প্রাথমিক ধারণা মনের মধ্যে গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ইহাই গান্ধীজীর বাল্যের ধর্ম্মজীবন।

যে জীবন······যে জীবনের ধর্ম্ম ও বাণী একদিন হিংসা-জর্জ্জরিত ভ্রান্ত ভারতবাসীকে···জগদ্বাসীকে নূতন পথ ও আলোর সন্ধান দিয়া গিয়াছে, সেই উজ্জ্বল জীবনের প্রভাত বেলার ধর্ম্মজ্ঞানের তরুণ ছটার কথা আমরা এখানে দুই চারিটি ঘটনার দ্বারা আলোচনা করিলাম।

* আত্মজীবনীর অনুবাদ হইতে—সতীশ দাসগুপ্ত।

আট

পিতৃহারা

মোহনদাসের বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাদের ছাড়িয়া পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

পিতার মৃত্যু মোহনদাস নিজে তাঁহার আত্মজীবনীতে বড় করুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

আমরা আগেই জানিয়াছি পিতা কাবা গান্ধী শেষ জীবনে রোগে বড়ই কষ্ট পাইতেছিলেন। ইহাও জানিয়াছি, পুত্র মোহনদাস রুগ্ন পিতাকে সেবা ও যত্ন করিতে কত ভালবাসিতেন। শুশ্রূষা করিবার জন্য স্কুলে ব্যায়াম না করিয়া সকাল সকাল বাড়ী চলিয়া আসিতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন, তাঁহার ক্ষত ধুইয়া দিতেন, ক্ষত স্থানে মলম লাগাইতেন।

কিন্তু ভক্ত পুত্রের আপ্রাণ সেবা সত্ত্বেও পিতার রোগ কমিল না,…… বরং চিকিৎসার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া কাবা গান্ধীর জীবনদীপ ধীরে ধীরে নিভিয়া আসিতে লাগিল।

একদিন পিতার ব্যাধি বড় বাড়িল। সেদিন আবার কাকা তুলসীদাস পোরবন্দর হইতে দাদার অসুখ বেশী শুনিয়া দাদাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি সন্ধ্যার পর দাদার শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিলেন, মোহনদাসকে শুইতে যাইবার জন্য বলিলেন। সেদিন যেন মোহনদাসের হঠাৎ শুইবার জন্য কেমন একটা ইচ্ছা জাগিল। তিনি দেখিলেন, পিতা একটু শান্তির সহিত নিদ্রা যাইতেছেন। মোহনদাস আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

হঠাৎ অর্দ্ধেক রাত্রে বাড়ীর একজন ভৃত্য তাঁহার দরজায় সজোরে ধাক্কা দিতে লাগিল। মোহনদাস শয্যা ত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিলেন। ভৃত্য জানাইল, 'শীঘ্র চলুন, সবাই আসিয়াছেন, বাবু কি রকম করিতেছেন।'

মোহনদাস পাগলের মত পিতার শয্যাপার্শ্বে ছুটিয়া গেলেন। কিন্তু তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। দেহের যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইয়া পিতা অনন্ত শান্তির সাগরে চলিয়া গিয়াছেন। মোহনদাস মৃত পিতার বুকে লুটাইয়া পড়িলেন। নিজের আরাম লাভের জন্য শেষ সময়ে পিতার কাছে থাকিতে পারিলেন না মনে করিয়া ছোট্ট শিশুর মত ডুকরাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এ দৃশ্য বড়ই করুণ...... কিন্তু বড় মধুর!

পিতৃভক্ত রামচন্দ্র,......

পিতৃসত্য পালন করিয়া পিতার মনে শান্তি দিবার জন্য বনে চলিয়াছেন। অকস্মাৎ চিত্রকূটের নিকট ভরতের মুখ হইতে পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিলেন!

রামচন্দ্র কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। অন্তিম সময়ে পিতাকে দেখিতে পাইলেন না মনে করিয়া শিশুর মত বিলাপ করিতে করিতে পাহাড়ের কঠিন মৃত্তিকায় লুটাইয়া পড়িলেন।

পিতৃভক্ত মোহনদাসের অনুতাপের ক্রন্দনও আমাদের পিতৃভক্ত রামচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

মোহনদাসের জীবন-নাট্যের একটি অঙ্কের যবনিকা পড়িল।

নয়

বিলাত যাত্রার ভূমিকা

সতর বৎসর বয়সে মোহনদাস প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। উচ্চতর শিক্ষালাভ করিবার জন্য কলেজে ভর্ত্তি হইলেন।

পিতার মৃত্যুর পর তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা বিশেষ সচ্ছল ছিল না। বোম্বাই ও ভাওনগরে তখন কলেজ ছিল। রাজকোট হইতে ভাওনগর নিকটে ছিল এবং ভাওনগরের কলেজে পড়ার খরচ কম ছিল। এই জন্য মোহনদাস ভাওনগরের কলেজে পড়িতে লাগিলেন।

কলেজের পড়া কিন্তু মোহনদাসের মনকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না। কলেজে যাইয়া তিনি অধ্যাপকদের ইংরাজী ভাষার জটিল বক্তৃতার তোড়ের ভিতর দিয়া পাঠ্যের বিষয় কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। ফলে কলেজের পড়া তাঁহার কাছে দুর্ব্বোধ্য ও কষ্টকর হইয়া উঠিল। মাতৃভাষার আশ্রয় না লইয়া বিদেশী ভাষার সাহায্যে জ্ঞানলাভ করা যে কত দুঃসাধ্য নবীন যুবক মোহনদাস তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইলে ডিগ্রী লাভ করিতে হইবেই, এইজন্য মোহনদাস কয়েক মাস আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া অধ্যাপকগণের বক্তৃতা বুঝিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কঠোর পরিশ্রমেও পড়াশুনায় বিশেষ সুবিধা করিতে পারিলেন না, অগত্যা কলেজের পড়া ছাড়িয়া দিলেন এবং বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু একটা কিছু করা প্রয়োজন, কারণ বড় ভাই রাজকোটের দরবারে চাকরী করিলেও সাংসারিক অসচ্ছলতা বিশেষ দূর হইল না। গান্ধীজী সম্বন্ধে সবাই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটিল, তাহা এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঘটনাটি সাধারণ, কিন্তু ঐ সাধারণ ঘটনাই বর্ত্তমান জগতের অসাধারণ ও অদ্বিতীয় মহাপুরুষটির জীবন গঠনের হেতু হইয়াছিল।

এই সময়ে মাভোজি নামক কাবা গান্ধীর একজন বন্ধু ও গান্ধী পরিবারের হিতাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসা যাওয়া করিতেন। মোহনদাসের লেখাপড়ার সমস্যার বিষয় শুনিয়া তিনি একদিন বলিলেন, দেখ, তোমাদের আর্থিক সচ্ছলতা আবার ফিরাইয়া আনিতে হইলে কাহারও পোরবন্দরের দেওয়ানের পদ গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আর এই পদ গ্রহণে তোমাদের একটি বংশগত দাবীও আছে। তবে এখন আর সেদিন নাই, এখন শুধু গুণের বিচার হয় না, পাশ করা বিদ্যাও চাই। তোমাদের মধ্যে এখন এক মোহনদাসই এ কাজের যোগ্য। তবে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে তাহার এখনও অনেক সময় লাগিবে। বি, এ, পাশ করিতে চারি বৎসর, কিংবা আইন পাশ করিতেও ঐ রকম সময় লাগিবে। কিন্তু এত দেরী করিলে ইহার মধ্যে অন্য লোকে ঐ পদ দখল করিয়া বসিবে। যাহা হৌক, এ বিষয়ে একটা সহজ উপায় এখনো আছে।

মোহনদাসের বড় দাদা ও মাতা উপায়টি কি জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

মাভোজি জানাইলেন—উহাকে ব্যারিষ্টারি পড়িবার জন্য বিলাত পাঠাও। ব্যারিষ্টারি পাশ করিতে মাত্র তিন বৎসর সময় লাগে, অথচ উহা এদেশে আজকাল সম্মানজনক পেশা। মোহনদাস ব্যারিষ্টার হইয়া আসিলে অনায়াসে দেওয়ানের পদ লাভ করিবে।

তিনি গান্ধী পরিবারকে অভয় দিয়া বলিলেন, ভয় নাই, ওখানে তিন বৎসর থাকিতে ও পড়িতে পাঁচ হাজারের বেশী টাকা লাগিবে না। বিলাতে আমার ছেলের অনেক ভারতীয় ও ইংরাজ বন্ধু আছে। মোহনদাসকে সকল বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য সে তাহাদের লিখিয়া দিবে।

এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব শুনিয়া যুবক মোহনদাসের মন কৌতূহলে ও আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখনকার দিনে বিলাত যাওয়া এবং বিলাতে অধ্যয়ন করা ভারতবাসীর মধ্যে এক গৌরবের ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল।

বিলাতের জীবন, সমাজ ও শিক্ষার বিষয় শিক্ষিত ভারতীয়গণের আলোচনার জিনিস ছিল। মোহনদাস স্থির করিলেন, তিনি বিলাত যাইবেন, যেমন করিয়া হোক বিলাতে ব্যারিষ্টারি পড়িবেন।

কিন্তু এই সঙ্কল্প সাধনে প্রথমেই বড় ভাই ও মাতা আপত্তি করিলেন। বড় ভাইয়ের আপত্তি কিন্তু শুধু টাকার জন্য, সংসারের এই অবস্থায় পাঁচ হাজার টাকা কেমন করিয়া সংগৃহীত হইবে?

মাতার আপত্তির কারণ কিন্তু আরও গুরুতর।

ছেলে বিলাতে যাইলে ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। বিলাতে মাংস মদ খাইতেই হইবে। ইহা ছাড়া আবার বিলাত স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ, ছেলের স্বভাব চরিত্র বিষয়েও বিশেষ ভাবনার কারণ হইবে।

বড় ভাইয়ের আপত্তি উৎসাহী মোহনদাস খণ্ডন করিলেন। জানাইলেন, কস্তুরবাঈয়ের গহনা বিক্রয় করিয়া টাকার যোগাড় করিবেন।

ভাইয়ের উৎসাহ দেখিয়া দাদা প্রীত হইলেন। বলিলেন আচ্ছা, গহনা বেচিতে হইবে না, টাকা আমি ধার করিয়া যোগাড় করিয়া দিব।

মাতাকে কিন্তু অত সহজে টলান গেল না। তখনকার হিন্দু সমাজের, বিশেষতঃ বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের বৈষ্ণব ও জৈন সমাজে বিলাত সম্বন্ধে এরূপ বিজাতীয় ধারণা বদ্ধমূল হইযাছিল যে কেহ বিলাত গেলে লোকে তাহাকে ধর্ম্মত্যাগী মনে করিত, তাহাকে জাতিচ্যুত করিত। তাই দাদা ও মোহনদাস মাতাকে অনেক করিয়া বুঝান সত্ত্বেও মাতা পুতলীবাঈ কিছুতেই সম্মতি দিতে স্বীকৃতা হইলেন না। অগত্যা মোহনদাস জানাইলেন, বিলাতে গিয়া জাতি যায় বা ধর্ম্ম নষ্ট হয় এমন কোন কাজ বা আচরণ তিনি করিবেন না, তিনি সেখানে মদ বা মাংস কোনদিন খাইবেন না।

তথাপি মাতা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, তোমাদের কাকা সম্মত হইলে আমার বিশেষ আপত্তি হইবে না।

মোহনদাস পোরবন্দরে কাকার কাছে গেলেন। কাকাও ধর্ম্মভীরু ছিলেন।

কিন্তু মোহনদাসের উৎসাহ আর আগ্রহ দেখিয়া তিনি সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন।

কাকার সহিত পরামর্শ করিয়া পোরবন্দরের তদানীন্তন ইংরাজ এ্যাডমিনি-ষ্ট্রেটার লেলী সাহেবের কাছে কিছু অর্থ সাহায্য চাহিলেন, কারণ পুরুষানু-ক্রমে পোরবন্দরের রাজসরকারে কাজ করিয়া পোরবন্দরের নিকট তাঁহাদের একটি দাবী ছিল। কিন্তু লেলী সাহেব তাঁহার প্রার্থনা নামঞ্জুর করিলেন। মোহনদাস রাজকোটে ফিরিয়া আসিলেন। দাদা টাকার যোগাড় করিলেন। এইবার মা জানাইলেন, 'তোমার উপর আমার বিশ্বাস আছে। তবু তোমার কথা চিন্তা করিয়া আমার কষ্ট হইতেছে। বেশ, তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর যে তুমি বিলাতে গিয়া কোনদিন মদ বা মাংস খাইবে না, কিংবা পরনারী সংসর্গ করিবে না।'

মোহনদাস প্রতিজ্ঞা করিলেন—বলিলেন, 'দিব্য লইয়া বলিতেছি ঐ তিন বিষয় হইতে আত্মরক্ষা করিব। তুমি তোমার পুত্রকে বিশ্বাস কর মা।' পুতলীবাঈ তাঁহার পুত্রকে বিশ্বাস করিতেন, মোহনদাসকে চিনিতেন।

তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে, তবে এ প্রতিজ্ঞা তিনি মোহনদাসকে করাইলেন কেন?—মোহনদাসের মুখের আশ্বাসবাণীকেই তাঁহারা আগে বিশ্বাস করিলেন না কেন?

উত্তর স্বরূপ বলা যায়, এ প্রতিজ্ঞা একটা লৌকিক সংস্কারের প্রকাশ মাত্র। নহিলে বুদ্ধিমতী পুতলীবাঈও জানিতেন, ইহার কোন আবশ্যকতা ছিল না। মোহনদাসের চরিত্রে দৃঢ়তা আছে, মোহনদাসের কর্তব্যবুদ্ধি ও সংযম তাঁহার বিশেষ গুণ, মোহনদাসের অন্তর সরল ও অকপট। সত্যসন্ধ মোহনদাস মাতার ইচ্ছাকে কখনও অসত্যে পরিণত করিবেন না। মোহনদাসের মনে যদি বাসনাই থাকে, তবে তিনটি কেন, সহস্র প্রতিজ্ঞাতেও বাসনার সেই উদ্দাম স্রোত রুদ্ধ হইবে না, সত্যকে উপরে প্রচার করিয়া দূরদেশে গোপনে অনায়াসে নিজের বিপরীত ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন।

বাসনা ছিল কি ছিল না তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে সত্যাশ্রয়ী মোহনদাস মাতার ইচ্ছাকে পূর্ণ করিবার জন্য সেই বাসনার অঙ্কুরকে মন হইতে সমূলে উচ্ছেদ করিয়াছিলেন।

অপূর্ব্ব পবিত্রতা মণ্ডিত যুবকের এই চরিত্র……ইতিহাসের বা গল্পের পাতায় এ চরিত্রের কি তুলনা নাই!

পিতৃভক্ত দেবব্রত……

দেবব্রত শুনিলেন………পিতার বাসনা……বিবাহের ইচ্ছা……

বুঝিলেন,……বাধার কথা……তাঁহার নিজের বাসনা,……নব-যুবকের নবীন হৃদয়ের তরুণ বাসনা।

বুঝিলেন,……হৃদয়ের তরুণ বাসনাকে, কামনাকে বিনাশ করিতে চাহিলেন,……

সমূলে……চিরদিনের জন্য!

প্রতিজ্ঞা করিলেন,……ভীষণ প্রতিজ্ঞা…বিবাহ করিলেন না,……ভোগ করিবেন না……প্রতিজ্ঞা করিলেন,……সিংহাসন গ্রহণ করিবেন না!

নিজের বাসনা দমনে…নিজের ভীষণ প্রতিজ্ঞায় দেবব্রত হইলেন মহান, ……হইলেন শ্রেষ্ঠ……হইলেন ভীষ্ম!

মাতৃভক্ত মোহনদাস,……যুবক মোহনদাস,……

হৃদয়ে বাসনা,……রঙীন……তরুণ……নূতন……মোহনদাস শুনিলেন মাতার বাসনা……

মাতৃভক্ত পুত্র নিজের বাসনাকে দমন করিলেন……রুদ্ধ করিলেন……

অন্তরে প্রতিজ্ঞা করিলেন,…শুধু বিদেশে নহে……

এ জীবনে আর গ্রহণ করিবেন না,……

মদ্য……মাংস……পরনারী…

মোহনদাস পবিত্র হইলেন,……মহান্ হইলেন……দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া সত্যের পথে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন।

মোহনদাস মাতা, ভ্রাতা ও সহধর্ম্মিণীর নিকট বিদায় লইলেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও ছাত্রবৃন্দ মোহনদাসকে বিদায় অভিনন্দন দিলেন।

সকলের শুভেচ্ছা লইয়া বিলাত-যাত্রার জন্য বোম্বাই নগরীতে আসিলেন।

ভাল কাজের বিঘ্ন অনেক। নূতন বিঘ্ন আসিয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষী মোহনদাসের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথ রোধ করিতে চাহিল। মোহনদাসের বিলাত যাত্রার সংবাদ বোম্বাইয়ের স্বজাতীয় বেনিয়া সমাজের কর্ণগোচর হইল। তাঁহারা চমকিয়া উঠিলেন—এঁ্যা, কালাপানি পার হইবে। ম্লেচ্ছ দেশে বাস করিবে,...সর্ব্বনাশ।

গোঁড়া বণিক সমাজে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। তাঁহারা পঞ্চায়েৎ বসাইলেন,—পঞ্চায়েতের নিকট কৈফিয়ৎ দিবার জন্য মোহনদাসকে আদেশ জানাইলেন। ক্ষণকালের জন্য লাজুক মোহনদাসের হৃদয়ে শক্তি ও সাহস ফিরিয়া আসিল। তিনি নির্ভীকভাবে পঞ্চায়েতের সামনে উপস্থিত হইলেন, জানাইলেন,—'শাস্ত্রে বা ধর্ম্মে সমুদ্রযাত্রায় বা বিদেশে বাস করায় নিষেধ নাই।

কিন্তু সমাজপতিগণ তো প্রকৃত শাস্ত্র বা ধর্ম্ম মানিতেন না, তাঁহারা মানিতেন কুসংস্কার। তাই তাঁহারা বলিলেন—কিন্তু আমরা তোমাকে জানাইতেছি, সেখানে গেলে ধর্ম্ম থাকে না। আমাদের কথা শোনা তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক।

মোহনদাস অটুট সঙ্কল্প লইয়া জানাইলেন, 'আমি এ বিষয়ে আমার গুরুজনদের ও মাতার অনুমতি পাইয়াছি। বিলাতযাত্রা আমি স্থগিত রাখিতে পারিব না।'

পঞ্চায়েৎ রুষ্ট হইলেন, প্রচার করিলেন—মোহনদাসকে সমাজচ্যুত করা হইল। মোহনদাসকে বিলাত যাত্রায় যাহারা সাহায্য করিবে, তাহারাও সমাজচ্যুত হইবে।

ইহা শুনিয়া বোম্বাইবাসী মোহনদাসের অনেক আত্মীয় তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। কিন্তু মোহনদাসের উৎসাহী অগ্রজ দমিলেন না, মোহনদাসও দমিলেন না। বিলাত যাত্রার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও পোষাক সংগ্রহ চলিতে

লাগিল। স্থির হইল, বর্ষাশেষে শরতের প্রথমে সমুদ্র স্থির থাকে, ঐ সময়ে মোহনদাস বিলাত যাত্রা করিবেন।

এই সময়ে জানা গেল, জুনাগড়ের ত্র্যম্বকরায় মজুমদার নামে এক উকিলও ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাইতেছেন। মোহনদাসের অগ্রজ ত্র্যম্বকরায়ের সহিত ভাইকে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। ত্র্যম্বকরায় ও মোহনদাস জাহাজের একই কেবিনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৮৮৮ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর জাহাজ বোম্বাই বন্দর ত্যাগ করিল।

মঙ্গলময় ঈশ্বর উপর হইতে হাসিলেন। মানবের পুত্র নূতন পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া মহামানব হইতে যাইতেছেন—যাঁহার শিক্ষা ও আদর্শ লাভ করিবার জন্য একদিন বিলাতের কর্ণধারগণ পর্য্যন্ত ভারতের মাটিকে তীর্থস্থান করিয়াছিলেন, অহিংসা প্রেম ও শান্তির অগ্রদূত সেই মহাত্মা গান্ধী আজ শিক্ষার্থী মোহনদাসরূপে কৌতূহল লইয়া, ভীরুতা ও লজ্জা লইয়া, মাতার আদেশ ও আশীর্ব্বাদ লইয়া বিলাতের পথে যাত্রা করিলেন!

দশ

জাহাজে

জাহাজের ঘটনা সম্বন্ধে আমরা বেশী কিছু বলিব না। অল্পকথায় শেষ করিব।

লাজুকস্বভাবের জন্য মোহনদাস কেবিন হইতে বড় একটা বাহির হইতেন না। ত্র্যম্বকরায় তাঁহাকে বুঝাইতেন, জাহাজের ইংরাজ ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা না বলিলে মোহনদাস ভাল ইংরাজী শিখিতে পারিবেন না, মেলামেশা না করিলে ইংরাজ সমাজের চালচলন জানিতে পারিবেন না, বিলাতে যাইয়া বিশেষ মুস্‌কিলে পড়িবেন।

মোহনদাসের কথা বলিতে বা মেলামেশা করিতে ইচ্ছা করিত, কিন্তু লজ্জা ও সঙ্কোচের ফলে পরিয়া উঠিতেন না। ডেকে সকালে বিকালে ইংরাজ আরোহীগণ বিচরণ করিতেন। ত্র্যম্বকরায় তাঁহাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেন, মোহনদাসকেও ডেকে যাইতে বলিতেন। কিন্তু ডেকে বেশী লোক থাকিলে মোহনদাস সেখানে যাইতেন না; ডেক যখন প্রায় জনশূন্য হইয়া যাইত তখন একবার-আধবার যাইতেন।

আসিবার সময় বাড়ী হইতে আনা যে সব মিঠাই ও ফলমূল সঙ্গে ছিল, সেই সব কেবিনের ভিতর বসিয়া খাইতেন। খানা খাইবার জন্য জাহাজের খানার টেবিলে যাইতেন না। ত্র্যম্বকরায় ভয় দেখাইতেন, মুখ না খুলিলে ব্যারিষ্টারি করিতে পারিবে না, ব্যারিষ্টারের মুখ দিয়া 'কথার খৈ ফোটা' দরকার। তোমার ভীরুতাই তোমার পক্ষে ক্ষতিকর।

মোহনদাস নিজের ত্রুটি বুঝিতেন, কিন্তু শোধরাইতে পারিতেন না। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর একজন ইংরাজ ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইল। একদিন তিনি মোহনদাসের মুখে শুনিলেন, তিনি মদ্য বা মাংস খান না। ভদ্রলোক শুনিয়া প্রথমটা বিস্মিত হইলেন, পরে ব্যঙ্গের সহিত বলিলেন, খাস

বিলাত তো দূরের কথা, দেখিব বিস্কে উপসাগর পর্য্যন্ত তোমার প্রতিজ্ঞা বজায় থাকে কি না! সেখানে শীতে শরীর এমন মুষড়াইয়া পড়িবে যে মাংসাহার না করিয়া থাকিতে পারিবে না।

শুনিয়া মোহনদাস একটু চিন্তিত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই মার মুখখানি স্মরণ করিয়া শক্ত হইলেন। শেষে বিস্কে উপসাগরে জাহাজ আসিল। শীত তীব্র বটে, কিন্তু মোহনদাস মাংস না খাইয়া বেশ কাটাইয়া দিলেন।

অবশেষে তাঁহাদের জাহাজ সাউদাম্পটনে আসিল। তাহার এক বন্ধু তাঁহাকে এক প্রস্থ সাদা স্যুট করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ঠিক করিয়াছিলেন বিলাতে অবতরণ করিবার সময়ে তিনি ঐ সাদা স্যুট পরিবেন। কিন্তু ঐ পোষাক পরিয়া বন্দরে নামিবার সময় দেখিলেন, তিনিই কেবল সাদা পোষাক পরিধান করিয়াছেন, অন্যান্য সমস্ত আরোহী কালো স্যুটে সজ্জিত হইয়াছেন। তিনি রীতিবিরুদ্ধ কাজ করিয়াছেন মনে করিয়া লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গেলেন।

এগার

বিলাতে—অসুবিধার পাহাড়

সাউদাম্পটনে নামিয়া সেখান হইতে ভিক্টোরিয়া হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ভিক্টোরিয়া হোটেলের খরচ খুব বেশী ছিল, মোহনদাসের একদিনেই প্রায় তিন পাউণ্ড খরচ হইয়া গেল। বিলাতে মোহনদাসের থাকিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য মোহনদাসের বড় ভাই চারিজন বিশিষ্ট ভারতবাসীকে অনুরোধ করিয়া পত্র দিযাছিলেন। মোহনদাস প্রথমেই তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার প্রাণজীবন মেহেতাকে তাঁহার হোটেলে আসিবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন। ডাক্তার মেহেতা ভিক্টোরিয়া হোটেলে আসিলেন। মোহনদাসের সহিত খুব পরিচিত ব্যক্তির মত নানা হাস্যকৌতুক করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মোহনদাস কৌতূহলবশে ডাক্তারের রেশমের টুপীর রেশমগুলি উল্টা ভাবে নাড়িতে লাগিলেন, ইহা দেখিযা ডাক্তার তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন, জানাইলেন, ইহাতে টুপীটি নষ্ট হইযা যাইবে।

মোহনদাস বড় লজ্জিত হইলেন। বিলাতের আদবকায়দা সম্বন্ধে ডাক্তার তাঁহাকে কতকগুলি উপদেশ দিলেন,—কাহারও জিনিস ছুঁইওনা, পরিচয় না থাকিলে কাহাকেও ভারতবর্ষের মত কোন প্রশ্ন করিবে না, জোরে কথা বলিবে না। এখানকার সাহেবদের ভারতবর্ষের মত 'স্যর' বলিবে না, কারণ শুধু ভৃত্যরা এখানে প্রভুকে স্যর বলিয়া থাকে ইত্যাদি।'

মোহনদাস মন দিয়া শুনিলেন, ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইয়া চলিবেন, স্থির করিলেন। ডাক্তার মেহেতা হোটেলের অত্যধিক খরচের কথা বিবেচনা করিয়া মোহনদাসকে কোনও পরিবারে থাকিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। জানাইলেন, 'সেখানে খরচও কম পড়িবে, আবার বিলাতের সমাজের আদব-কায়দাও শিখিতে পারিবে। কারণ বিলাতে যখন আসিয়াছ, তখন পাশ করিবার আগে এখানকার চালচলন শেখা বিশেষ দরকার।'

আরো জানাইলেন, যেখানে মোহনদাসের বাসা তিনি ঠিক করিয়া দিতেছেন, তাহার কাছেই তাঁহার এক ইংরাজ বন্ধু বাস করেন। তিনি তাঁহাকে বলিয়া দিবেন, যাহাতে ভদ্রলোক মোহনদাসকে একটু দেখাশোনা করেন।

হোটেল হইতে মোহনদাস ইংরাজ পরিবারে বাস করিতে গেলেন। ডাক্তারের ইংরাজ বন্ধুটি নিয়মিতভাবে মোহনদাসের কাছে আসিতে লাগিলেন, তাঁহাকে নিজের ভাইয়ের মত দেখিতে লাগিলেন, ইংরাজি ভাষা ও ইংরাজি আদবকায়দা শিখাইতে লাগিলেন। সব বিষয়েই সুবিধা হইল, কিন্তু মোহনদাসের খাওয়া লইয়া ক্রমশঃ অসুবিধা বাড়িতে লাগিল।

মাংস ইংরাজ পরিবারের নিত্যকারের খাদ্য। মাংস ভিন্ন তাঁহারা খাইতেই পারেন না, কিন্তু মোহনদাস মাংস খাইতেন না। এই পরিবারটির গৃহস্বামিনী মোহনদাসের জন্য ওট-মিলের জাউ (porridge) রাঁধিয়া দিতেন। মোহনদাস ক্ষুধায় জ্বালায় তাহাই খাইতেন। দুপুরে দুই এক টুকরা রুটির সহিত পালং শাক ভাজা ও একটু মোরব্বা খাইতেন। রাত্রেও মোরব্বার সহিত দুই এক টুকরা রুটি খাইতেন। এত অল্প খাবারে তাঁহার ক্ষুধা মিটিত না, কিন্তু লজ্জার জন্য বেশী রুটি চাহিতেও পারিতেন না।

বন্ধুটি মোহনদাসের খাওয়ার কথা শুনিলেন। তিনি তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া মাংস খাইবার জন্য তাঁহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন, 'মাংস না খাইয়া এখানে বাস করা বড়ই কষ্টকর হইবে। এখানকার অবস্থা ও চালচলন না জানিয়া মাতার কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, কিন্তু এখানে ঐ প্রতিজ্ঞার মূল্য কি? এখন ঐ প্রতিজ্ঞা আঁকড়াইয়া থাকা মূর্খতা। আর এখানে শরীর-রক্ষার জন্য মাংস খাইলে কেই বা উহা জানিতে পারিবে? দেশে ফিরিয়া বলিলেই হইবে মাংস খাও নাই।'

প্রতিজ্ঞাভঙ্গ···আবার মিথ্যাকথা!

মোহনদাসের মনে পড়িল, দুশ্চিন্তাকাতরা স্নেহময়ী মায়ের মুখখানি,······ মনে পড়িল শপথ বাক্য!

মোহনদাস শিহরিয়া উঠিলেন। নিজের অন্তরের দিকে চাহিয়া শক্ত হইলেন। মাতা সন্তানকে যে অনন্ত বিশ্বাসের দুর্গে আশ্রয় দিয়াছিলেন, সন্তান সেই সরল বিশ্বাসকে আঁকড়াইয়া ধরিলেন। বন্ধুকে জানাইলেন, কষ্ট হইলেও তিনি মাতার নিকট প্রদত্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিবেন না,—মাতার অগোচরে বিপরীত আচরণ করিয়া মিথ্যাবাদী হইতে পারিবেন না।

ফুলের একটি পাপড়ি কলুষিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল······সত্যের উজ্জ্বল আলোকে কলুষমুক্ত হইয়া আবার সে তাহার শুভ্র দল মেলিয়া ধরিল।

নিজের প্রতিজ্ঞায়—নিজের সঙ্কল্পে মোহনদাস আবার অটল হইলেন—ছায়ামুক্ত হইলেন।

বন্ধুটি সেদিন চলিয়া গেলেন। আবার একদিন আসিলেন, কথাপ্রসঙ্গে আবার মোহনদাসকে মাংস খাইবার জন্য বুঝাইলেন, 'তুমিইতো বলিয়াছ, তুমি এক সময়ে মাংস খাইয়াছিলে, তোমার মাংস খাইতে ভাল লাগিয়াছিল। যেখানে খাওয়ার আবশ্যক ছিল না, সেখানে খাইযাছ ; আর এখানে, এই শীতের দেশে আবশ্যক হইলেও তাহা খাইবে না কেন ?' মোহনদাস কোন যুক্তি শুনিলেন না, বিরুদ্ধ যুক্তিতর্কের মধ্যেও সত্যপালন ও দৃঢ়তার অটুট ধর্ম্মে আত্মরক্ষা করিয়া নিরামিষাহারী হইয়া রহিলেন।

ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট হইত,······বন্ধু আত্মপীড়নের জন্য কটুকথা শুনাইতেন, ······মাংস খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন,—

মোহনদাস মানসিক শক্তিলাভের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন, মনে নূতন বল পাইতেন, নিরামিষ আহারে কষ্ট হইলেও আনন্দ পাইতেন।

ইহাতেও বন্ধু হাল ছাড়িলেন না।

মাংসাহার সমর্থন করিবার জন্য বেন্থামের গ্রন্থ হইতে মাংসাহারের উপকারিতা সম্বন্ধে নানা যুক্তি পড়িয়া তিনি শোনাইতে লাগিলেন।

একদিন থিয়েটার দেখাইবার ওজুহাত করিয়া 'হবর্ণ' নামক এক হোটেলে লইয়া গেলেন, সেখানে মাংসের খাদ্য ছাড়া কোন নিরামিষ খাদ্য ছিল না।

খাইতে বসিয়া মোহনদাস মাংস দেখিয়া টেবিল ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

বন্ধুটি এবারে হতাশ হইলেন……

তিনি নিশ্চিত হইলেন—মোহনদাস মাংস খাইবেন না।

মোহনদাসের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন আর বিরক্ত হইলেন।

মোহনদাস তাঁহার দুঃখ ও বিরক্তি বুঝিযা বলিলেন, 'আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। আপনার ভালবাসা আমি বুঝিতে পারি। আপনাকে আমি আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বলিযা মনে কবি। কিন্তু আমি নিরুপায়, প্রতিজ্ঞা আমি ভাঙ্গিতে পারিব না।'

ইহার পর বন্ধু আব তাঁহাকে মাংস খাইবাব জন্য কোনদিন অনুরোধ করেন নাই।

মাংস ত্যাগ করিলেও বিলাতের অন্যান্য রীতি ও আদব-কাযদা শিক্ষা করা মোহনদাস ত্যাগ করিলেন না। পাশ করার আগে সভ্য হওয়া দরকার, ইহা ডাক্তার মেহতার কাছে শুনিযাছিলেন। ডাক্তার মেহেতার উপদেশ পালন কবিবার জন্য এবং সেই সঙ্গে তাঁহাব ইংরাজ বন্ধুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অন্যান্য বিষয়ে পূরাপূরি সভ্য ও সাহেব বনিতে চেষ্টা করিলেন।

প্রথমে পোষাকের দিকে মন দিলেন। দশ পাউণ্ড মূল্য দিয়া সৌখীন সমাজের বিখ্যাত দোকান 'আর্মি ও নেভি ষ্টোর' হইতে ভাল সুট কিনিযা আনিলেন। উনিশ শিলিং খবচ করিযা তখনকার দিনের প্রচলিত 'চিমনী টুপী' কিনিলেন। গলার 'টাই' নিজে বাধিতে শিখিতে লাগিলেন। বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইযা টাই বাঁধিতে ও চুল পাট করিয়া সিঁথি কাটিতে অভ্যাস করিতে লাগিলেন। মাথায ব্রুশ দিতে লাগিলেন। সুটের উপযোগী দামী টুপী পরিতে আরম্ভ করিলেন।

পোষাক পরিলেই সাহেব হয না, সাহেব হইবার আরো উপকরণ

প্রয়োজন। বিলাতের সভ্য সাহেবেরা নাচিতে জানেন, বক্তৃতা করিতে পারেন, প্রায় সকলেই ফরাসী ভাষায় কথা বলিতে পারেন। মোট কথা, নাচ, বক্তৃতা ও ইউরোপের আন্তর্জাতিক ভাষা ফরাসী না জানিলে তখনকার দিনে ইংরাজ সমাজে মেলামেশা বিশেষ কষ্টকর হইত।

মোহনদাসও নাচ, বক্তৃতা ও ফরাসী ভাষা শিখিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তিন পাউণ্ড 'ফি' জমা দিয়া এক নাচের ক্লাশে যোগ দিলেন, সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে নাচের পাঁচ-ছয়টি পাঠ শেষ করিলেন। কিন্তু নাচিবার সময় নাচের তাল লইয়া অসুবিধায় পড়িলেন, পিয়ানোর সুরের তালে তালে ঠিকমত পা ফেলিতে পারিলেন না। কেহ কেহ বুঝাইলেন, সুর-জ্ঞান ও ধ্বনি-জ্ঞান নাই বলিয়া পিয়ানোর তাল তিনি বুঝিতে পরিতেছেন না। আবার সুর শিখিবার জন্য তিন পাউণ্ড দিয়া একটি বেহালা কিনিলেন এবং শিক্ষকের নিকট হইতে বেহালা বাজান শিখিতে লাগিলেন। সময় করিয়া বক্তৃতা শিখিবার শিক্ষকের কাছে যাইতে লাগিলেন। পূরা একটি গিনি দক্ষিণা দিয়া বক্তৃতার নিয়ম-কানুন আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। ক্লাশে ভর্ত্তি হইয়া 'ফ্রেঞ্চ' শিক্ষায় মন দিলেন।

কিন্তু ভাগ্যদেবতা উপর হইতে হাসিলেন।

মোহনদাস কি 'সাহেব' হইবার জন্য বিলাতে আসিয়াছেন,...বিলাতি 'এটিকেট' শিখিয়া ভারতে ফিরিয়া টেবিলে খাইতে, নাচিতে, পার্টিতে যোগদান করিতে, বিলাত-ফেরত বলিয়া ভারতীয় সমাজে বাহাদুরী লইতে কি গুজরাটের এই যুবকের বিলাতে আগমন ?......

ভাগ্যদেবতার বিধান দুর্জ্ঞেয় !

বিলাতের শিক্ষা লাভ করিয়া বিলাতকেই যিনি একদিন অভিনব শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত করিবেন, ভোগের ও বিলাসের সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া যিনি একদিন সত্য, শান্তির ও ত্যাগের তীরে আশ্রয় লইবেন, ভ্রান্তির

গোলক ধাঁধাঁ হইতে মুক্ত হইয়া যিনি একদিন সত্যের দর্শন লাভ করিয়া সত্যের জ্যোতিতে সমগ্র বিশ্বকে অন্ধকার-মুক্ত করিবেন,······তাঁহার কি নাচ, বক্তৃতা করা আর সুর সাধা সাজে!······

ভাগ্যদেবতা তাই সেদিনের ঘুমন্ত মোহনদাসকে বিবেকের ধাক্কা দিয়া জাগাইয়া দিলেন। অকস্মাৎ এক সময় মোহনদাসের মন সাহেবীয়ানার উপর বীতরাগী হইল,—আমাকে কি ইংলণ্ডে জন্ম কাটাইতে হইবে? আমি ভাল বক্তৃতা শিখিয়া কি করিব? শুধু নাচিলে আমি কেমন করিয়া সভ্য হইব? বেহালা ত দেশেই শেখা যায়।

জিজ্ঞাসু অন্তরকে বিবেক সত্যপথ দেখাইল—'আমি বিদ্যার্থী। আমি এখানে বিদ্যার্জ্জন করিতে আসিয়াছি। আমার বিলাতের সভ্যতার প্রয়োজন নাই। আমার নিজের আচারের শুদ্ধতাই আমাকে রক্ষা করিতে পারে, সভ্য করিতে পারে। নিজ ব্যবহারে যদি সভ্য না হই, তাহা হইলে বিলাতের সহস্র আদব-কায়দাও আমাকে সভ্য করিতে পারিবে না।

মোহনদাস শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্যের দর্শন পাইলেন। মিথ্যাকে পরিত্যাগ করিয়া সত্যগ্রহণ করিলেন। সাহেব হইবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন। বক্তৃতার শিক্ষকের নিকট হইতে বিদায় লইলেন, নাচের শিক্ষককেও মনের ইচ্ছা জানাইয়া দিলেন। বেহালাটি বিক্রয় করিয়া দিয়া ঐ অর্থে নিজ হাতে রন্ধন করিবার জন্য একটি ষ্টোভ কিনিলেন। পূরাপূরি সংযমী ছাত্র হইলেন।

বারো

পাহাড় লঙ্ঘন করিলেন

মোহনদাস গান্ধীর মাংসাহারবর্জন লইয়া যখন আলোচনা করিয়াছি, তখন তিনি মাংসত্যাগ করিয়া কি খাইয়া তিন বৎসর বিলাতে কাটাইলেন, তাহাও একটু আলোচনা করিব।

আমরা জানিযাছি, ইংরাজ পরিবারটিতে থাকিবার সময তাঁহার খাইতে বড়ই অসুবিধা হইত। এইজন্য ডাক্তার মেহেতার সহিত দেখা করিযা অন্য কোথাও থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পরিবারে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিযা দিলেন। পরিবারের গৃহিণী ও তাঁহার দুই কন্যা তাঁহাকে খুব যত্ন করিতেন, কিন্তু তাহারাও মাংস ব্যতীত নিরামিষ খাদ্য অল্প খাইতেন। এইজন্য সেখানেও মোহনদাসের খুব কষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহারা মোহনদাসকে ভোজনের সমযে এক টুকরা কি দুই টুকরা রুটি দিতেন। মোহনদাসের ক্ষুধা-বৃত্তি উহাতে নিবৃত্ত হইত না। লাজুক মোহনদাস বলিতেও পারিতেন না, আমাকে আর এক টুকরা রুটি দিন।

কিন্তু ক্ষুধা-নিবৃত্তিব প্রযোজন, নহিলে পড়াশুনা করিবেন কেমন করিযা?

মোহনদাস ইতিমধ্যে শুনিয়াছিলেন বিলাতে নিরামিষ খাদ্যের জন্য আলাদা হোটেল আছে, তবে উহা খুব কম। তিনি অন্তরে আশা লইয়া রোজ এধার-ওধার ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নিরামিষ আহার সম্বন্ধে মনকে উৎসাহ দিবার জন্য নিরামিষ আহারের প্রয়োজনীয়তা ও উপকার বিধায়ক নানা লেখকের লেখা পুস্তকগুলি আগ্রহের সহিত পড়িতে লাগিলেন। হাউয়ার্ড উইলিয়মস্-এর লেখা 'আহার নীতি' (The Ethics of Diet) নামক পুস্তক পড়িযা জগতের সাধু মহাত্মা ও অবতারগণ কিরূপ সাত্ত্বিক আহার করিতেন, তাহা পড়িলেন। মিসেস্ আনা কিংস্‌ফোর্ড প্রণীত

'উত্তম আহারের নীতি' পুস্তকখানি তৃপ্তির সহিত পড়িলেন। ডাক্তার এলিনসনের লেখা নিরামিষ আহারের উপকারিতা বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ পড়িলেন।

একদিন দশ বার মাইল হাঁটিয়া ফেরিংডন্ ষ্ট্রীটের মোড়ে একটি হোটেলে অকস্মাৎ একটি সাইনবোর্ড দেখিলেন। উহাতে লেখা রহিয়াছে—'নিরামিষ আহারের রেস্তোরাঁ (Vegitarian Restaurant)। ছোট্ট শিশু তাহার মনের মত জিনিস পাইলে যেমন আনন্দিত হয়, ক্ষুধার্ত্ত মোহনদাসও সেইরকম আনন্দিত হইলেন। তিনি হোটেলে ঢুকিয়া খাবারের জন্য আদেশ দিলেন। মোহনদাস আজ প্রথম পেট ভরিয়া ভোজন করিলেন।

মোহনদাসের উৎসাহ বাড়িয়া গেল, মনে ভরসা জাগিল। প্রায় প্রত্যহ দশমাইল হাঁটিয়া এই হোটেলে আসিয়া তিনি ভোজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল হইতে লাগিল। তিনি মাতার কথা স্মরণ করিলেন। মাতার প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া বড়ই আনন্দ পাইলেন। মনে মনে আলোচনা করিলেন, 'একদিন ভাবিতাম, ভারতবাসীগণ যদি মাংসাহারী হয়, তবে দেশের শক্তি বৃদ্ধি হয়। সঙ্কল্প করিতাম, প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া দেশে ফিরিয়া নিজে আবার মাংস খাইব এবং ভারতের সবাইকে মাংস খাইতে যুক্তি দিব। কিন্তু নিরামিষ ভোজনের এত তৃপ্তি, এত উপকার ইহাতো আগে জানিতাম না।'

একদিন যে মোহনদাস মাতাকে মিথ্যা কথা বলিবার দুঃখে মাংস খাইতে ইচ্ছুক হইয়াও মাংস ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আজ সেই মোহনদাস স্বেচ্ছায় মাংসের লোভ ত্যাগ করিলেন, আজ এক নূতন প্রতিজ্ঞা করিলেন—'দেশে ফিরিয়া নিরামিষ আহারের উপকারিতা দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করিব।

সত্য রক্ষার আনন্দে মোহনদাসের দেহমন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

এইবার তাঁহার নিজের খরচের দিকে তাঁহার লক্ষ্য পড়িল। মোহন-দাসের বিলাতের বিলাসিতার অনুকরণের ভিতরেও একটি স্বভাব চিরদিন বজায় ছিল,—দৈনন্দিন ও মাসিক খরচের হিসাব রাখা। বাহ্যিক আড়ম্বর ত্যাগ করিবার পর, হিসাবের খাতায় খরচের বহর দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, এখানে আমি অযথা এত খরচ করিতেছি, কিন্তু এই খরচ যোগাইতে আমার দাদার কতই না কষ্ট হইতেছে!

তিনি খরচ কমাইতে সঙ্কল্প করিলেন।

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবারে টাকা দিতে হইত, অথচ পেট ভরিত না। তিনি আলাদা ঘর ভাড়া করিয়া সেখানে নিজ হাতে রন্ধন করিয়া খাইবার সিদ্ধান্ত করিলেন এবং একটি ঘর ভাড়া লইয়া সেখানে উঠিয়া গেলেন। শেষ পর্য্যন্ত নিজেই রান্না করিয়া খাইতে লাগিলেন। বাজে খরচ—বিলাসের খরচ, পোষাকের খরচ, পরের সংসারে খাওয়ার খরচ কমিয়া গেল। নিজের অনাড়ম্বর নিরামিষ খাদ্য শান্তির সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে গাড়ীভাড়া খুব বেশী লাগিত, হিসাবের খাতায় উহা লক্ষ্য করিয়া গাড়ী চড়া কমাইয়া দিলেন। বিশেষ প্রয়োজন ও তাড়াতাড়ি না থাকিলে হাঁটিয়াই কাজ সারিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা জানিয়াছি, বাল্যকাল হইতেই তিনি ভ্রমণের দ্বারাই ব্যায়াম করিতেন, এখন এই হাঁটায় তাঁহার কাজ ও ব্যায়াম দুইই হইতে লাগিল। নিয়মিত ভোজনে—নিয়মিত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর সুস্থ হইয়া উঠিল। বিলাতে অমিতব্যয়ের স্বভাব ত্যাগের পর মিতব্যয়িতার যে অভ্যাস তিনি সুরু করিয়াছিলেন, সেই সংযত অভ্যাসটি তাঁহার চিরদিন বজায় ছিল। দেশমান্য হইয়া, দেশের বিখ্যাত নেতা হইয়া খরচের জন্য তাঁহার হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা আসিয়াছে। কিন্তু হিসাব রাখিয়া খরচ করিবার অভ্যাসের জন্য—সংযত মিতব্যয়িতার জন্য তিনি সকল কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। আবার কার্য্যশেষে অতিরিক্ত টাকাও সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষে, শুধু ভারতবর্ষই বা কেন,

সমগ্র জগতে মিতব্যয়িতা ও মিতব্যয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, ছোট কাজ হউক—বড় কাজ হউক, হিসাব করিয়া খরচ করিলে সেই কাজ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবেই।

এইবার মোহনদাসের পড়ার কথায় ফিরিয়া যাইব। তিনি ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু ব্যারিষ্টারির পড়া পড়িযাও তিনি অনেক সময় হাতে পাইলেন। তিনি ভাল ইংরাজি শিখিয়া ঐ সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিলেন। প্রথমে অক্স্‌ফোর্ড বা কেম্ব্রিজে পড়িবার জন্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কয়েকজন ইংরাজ ও ভারতীয় বন্ধু জানাইলেন ঐসব প্রতিষ্ঠানে পড়িতে খরচ ও সময় দুইই খুব বেশী লাগিবে। শেষে একজন বন্ধু বলিলেন, তুমি লণ্ডনের ম্যাট্রিকুলেশন পাশ কর ইংরাজিতে ভাল জ্ঞান হইবে। তাছাড়া অনেক জ্ঞান লাভ করিবে।'

লণ্ডনের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ছয়মাস অন্তর হইয়া থাকে। মোহনদাস ম্যাট্রিক পড়া আরম্ভ করিলেন। পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্য ল্যাটিন পড়িতে লাগিলেন, ফরাসী ভাষা পূর্ব্বে কিছু শিখিযাছিলেন। এখন পরীক্ষার পাঠ্য বলিয়া আবার পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু ল্যাটিন তাঁহার কাছে বড়ই কঠিন মনে হইল, ক্রমে পরীক্ষার সময় আসিল। পরীক্ষা দিলেন, কিন্তু ল্যাটিনে ফেল করিলেন। মোহনদাস নিরুৎসাহ হইলেন না; আবার পরের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এবার যথাসময়ে পরীক্ষা দিয়া পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হইলেন। ল্যাটিন পড়িবার জন্য ইংরাজিতেও অনেকটা জ্ঞান লাভ করিলেন।

এইবার ব্যরিষ্টারি পরীক্ষার জন্য নিযমিত পড়া আরম্ভ করিলেন। ইহার পাঠ্য বিশেষ ছিল না। রোমান ল' ও ইংলণ্ডের আইন এই দুইটি বিষয পড়িতে হইত। উভয পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক ছিল, কিন্তু ছাত্রেরা সাধারণতঃ উহা পড়িত না, 'নোট' পড়িযাই পাশ করিত। কিন্তু মোহনদাস আইনে পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিবার জন্য মূল পাঠ্য দুইটিই পরিশ্রম করিয়া পড়িতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইল, কিন্তু তিনি

ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় ল্যাটিন শিখিয়াছিলেন বলিয়া রোমান ল' ভালভাবে বুঝিতে পারিলেন। তারপর পাঠ্য বিষয়গুলিতে পাশ করিলেন।

ব্যারিষ্টারি পরীক্ষার অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয়ও ছিল। আর ঐগুলিই ছিল পরীক্ষা পাশের প্রধান উপায়। পরীক্ষায় তিন বৎসরের মধ্যে অনেকবার পরীক্ষার্থীদের নিজ খরচে পরীক্ষকদের ও ছাত্রদের খানা খাওয়াইতে হইত। খানায় নানা প্রকার আহার্য্যদ্রব্যের সহিত ভাল মদ পরিবেশন করিতে হইত। এইসব খানা খাওয়ার সময় শিক্ষক ও ছাত্রগণের মধ্যে আইনের নানা প্রকার আলোচনা ও বিতর্ক হইত, ছাত্রেরা আইন বিষযে অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করিত। মোট কথা, এই ভোজের দ্বারাও ছাত্রগণ ব্যবহারিক জ্ঞানের ও মেলামেশার উপকারিতা লাভ করিত। এইসব ভোজের পরীক্ষাতেও মোহনদাস পাশ করিলেন।

মোহনদাস ব্যারিষ্টার হইলেন।

তের

লজ্জা—মোহনদাসের অস্ত্র

মোহনদাসের বিলাতের কাজ শেষ হইল, কিন্তু তাঁহার বিলাতের কথা এখনও শেষ হইল না। তাঁহার লজ্জার কথা আগে বলিয়াছি, কিন্তু এই সম্বন্ধে আরো কিছু বলা বাকী আছে। বাকীটা সংক্ষেপে বলিব।

নিরামিষ আহারী এবং সংযমী হইবার মধ্যেও অসত্য ও পাপ তাঁহাকে কয়েকবার আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক বারই তাঁহার লাজুক প্রকৃতি তাঁহার অস্ত্র স্বরূপ হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। একবার নিরামিষ আহারী একটি পরিবারের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল। ক্রমে পরিবারের মহিলাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইতে লাগিল। ঐ পরিবারের গৃহিণী ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার যুবতী কন্যাদের মোহনদাসের সহিত মিশিতে দিলেন। তাঁহারা মোহনদাসকে অবিবাহিত স্থির করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মোহনদাস ভীত হইলেন, তথাপি লজ্জার আধিক্যে নিজ বিবাহের কথা বলিয়া নবতাঁদের নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। অগত্যা স্থির করিলেন, ইহাদের মোহ তাঁহাকে কাটাইতে হইবে, অসত্য হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। লজ্জার বশে তিনি সামনে বলিতে পারিলেন না, কিন্তু নিজের বাসায় গিয়া চিঠি ঐ লিখিয়া সংসারের গৃহিণীটিকে সমস্ত জানাইলেন। সত্যরক্ষা করিতে পারিয়াছেন মনে করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

লালসা কামনাকে জয় করিয়া মোহনদাস এবার সত্যের বলে বলীয়ান হইতে লাগিলেন। কিন্তু পাপ তাঁহাকে অত সহজে নিষ্কৃতি দিল না। আর একবার সে তাহার বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিল। একবার তিনি কিছুদিনের জন্য পোর্টস্‌মাউতে ছিলেন। সেই সময়ে একটি সঙ্গীর সহিত একটি পরিবারে যাইয়া মহিলাদের সহিত তাস খেলিতে লাগিলেন। ঐ মহিলাগুলি দুষ্ট স্বভাবের ছিল। তাহারা খেলিতে

খেলিতে কুকথা, কুআচার প্রভৃতি নানা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করিয়া মোহনদাস ও তাঁহার সঙ্গীকে পাপের দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গী এসব বিষয়ে বিশেষ পটু ছিলেন, কিন্তু তিনি মোহনদাসের স্বভাব ভালভাবে জানিতেন। তিনি বুঝিলেন, মোহনদাসও আজ যেন ঐ কুহকিনীদের মায়াজালে ধরা দিবার উপক্রম করিয়াছেন। অকস্মাৎ তিনি জ্ঞানহারা মোহনদাসকে তিরস্কারের ভাষায় সচেতন করিয়া বলিলেন—'বাঃ রে ছোকরা, তোমার মধ্যেও সয়তান আছে দেখিতেছি,—কিন্তু এ কাজ তো তোমার নয়! তুমি শীঘ্র পালাও—এখনই পালাও। ক্ষণিক দুর্ব্বলতার মোহে মোহগ্রস্থ মোহনদাসের চৈতন্য ফিরিল। 'তাইত, —তবে কি রামচন্দ্রজী এই সঙ্গীর মুখ দিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন?'

মোহনদাস লজ্জায় মরিয়া গেলেন। সেখান হইতে পলাইয়া বাঁচিলেন।

সত্যই সেদিন রামচন্দ্রজী—মঙ্গলময় জগদীশ্বর যুবক মোহনদাসকে ঐ বিপদ হইতে রক্ষা করিযাছিলেন। যে মোহনদাস একদিন মহাত্মারূপে জগতের অসংযমী ও উচ্ছৃঙ্খল জনসমাজকে সংযম, শৃঙ্খল ও ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা দান করিবেন, তাঁহার পক্ষে কেন এই ক্ষণিকের দুর্ব্বলতা!

তাই মোহনদাসের ভাগ্যবিধাতা তাঁহার সঙ্গীর মধ্যে আবির্ভূত হইলেন মুখে আসিলেন, তাঁহাকে সাবধান করিলেন।

ইহাই কিন্তু যুবক মোহনদাসের জীবনে শেষ পরীক্ষা। এই পরীক্ষায জয়লাভ করিযা যুবক ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইলেন, জীবনকে অধিকতর সংযম ও সত্যের মধ্যে পরিচালিত করিতে শিক্ষা করিলেন, নিজের কর্ম্ম ও আদর্শে ক্রমশঃ পবিত্র হইলেন।

দুর্ব্বলতার কথা শেষ করিযা এইবার তাঁহার বিলাতের সামাজিকতার কথা কিছু বলিব। বিলাতে নিরামিষ আহার করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিরামিষের প্রতি সাধারণের আগ্রহ সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি তাঁহার ইংরাজ বন্ধুদের এবং তখনকার দিনে নিরামিষ আহারের সমর্থক প্রসিদ্ধ লেখকদের লইয়া দুই এক স্থানে দুই একটি সঙ্ঘ বা সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এমন কি তিনি স্বয়ং কোন কোন

সমিতির সম্পাদকও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আহার সম্বন্ধে ভোজের টেবিলে যখন অন্যান্য সদস্যগণ বক্তৃতা দিতেন, তখন তিনি তাঁহার লজ্জার জন্য কিছুই বলিতে পারিতেন না। লজ্জা যেন দুর্ব্বহ পাষাণভার হইয়া তাঁহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিত। তিনি বক্তৃতা লিখিয়া পাঠ করিতে ইচ্ছা করিতেন, অথচ পড়িবার সময় তাঁহার মুখ দিয়া একটিও অক্ষর বাহির না। তিনি লজ্জায় গলদঘর্ম্ম হইয়া বসিয়া পড়িতেন।

এই লজ্জাই তাঁহাকে মূক করিয়াছিল,—আবার এই লজ্জাই অনেক লজ্জাজনক কলঙ্ক ও বিপদের কবল হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। বিলাতের ছাত্রজীবনে লজ্জা তাঁহার অস্ত্ররূপ হইয়াছিল—আত্মরক্ষার বর্ম্ম হইয়া তাঁহাকে পাপের কলুষ হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

এই সময়ে আর একটি লোকের সরল ও অকপট ব্যবহার এবং চালচলন তাঁহাকে বিলাতবাসের শেষের দিকে একটি নূতন শিক্ষা দিল। লোকটি তখনকার পরিচিত ভারতীয় লেখক নারায়ণ হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্র তখন বিলাতে ছিলেন। মোহনদাসের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল এবং এই পরিচয় কতকটা বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের চালচলন সাদাসিধা ছিল, তিনি ইংরাজগণের ব্যঙ্গ অগ্রাহ্য করিয়া মধ্যে মধ্যে সেখানে ভারতীয় পোষাক পরিতেন। বিলাতের কৃত্রিমতা ও কপটভাব মধ্যেও সর্ব্বদা নিজের সরলতা ও অকপটতা বজায় রাখিতেন। দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া জগতের বিভিন্নদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা তাঁহার ছিল। অহঙ্কার বর্জ্জন করিয়া নিজের কাজ তিনি করিয়া যাইতেন।

এইরূপে হেমচন্দ্র মোহনদাসকে এক বিচিত্র চক্ষুদান করিলেন। হেমচন্দ্রের ভিতর দিয়া ভারতের আদর্শ ও কর্ত্তব্যকে তিনি যেন দেখিতে পাইলেন। বিলাতে বাস করিয়াও স্বদেশের ভাবধারা বজায় রাখিবার এক প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিলেন। হেমচন্দ্রই মোহনদাসের অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে সর্ব্বপ্রথম স্বদেশীভাবের বীজ বপন করিলেন।

বীজ উর্ব্বরক্ষেত্রে রোপিত হইল,…উপযুক্ত সময়ে বারিবর্ষণের দ্বারা নবজন্মের পত্রপল্লব বিস্তার করিয়া বিরাট মহীরুহে পরিণত হইবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

চৌদ্দ

স্বদেশের পথে

বাল্যকালে স্বাভাবিক সংস্কারের বশে গান্ধীজীর ধর্ম্মজ্ঞান লাভের বিষয় আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহার বিলাতের ছাত্রজীবনের কথা বলিতে হইলেও তাঁহার ধর্ম্মের কথা বলা অবশ্য প্রয়োজন। বিলাত-প্রবাসী যুবক মোহনদাস নিরামিষ আহারের দিকে ক্রমশঃ ঝুঁকিয়াছেন, ভ্রান্তি ও অসত্যের অন্ধকার হইতে ক্রমশঃ সত্য ও পবিত্রতার আলোকে উপনীত হইয়াছেন, আর ঐ সঙ্গে সঙ্গে বাল্যের ধর্ম্ম-সংস্কারের অস্পষ্ট ধারণাটিকে অনুসন্ধিৎসা ও চর্চ্চার দ্বারা ক্রমশঃ স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

আমরা অল্পকথায় যুবক মোহনদাসের বিলাতের এই ধর্ম্ম জীবন সম্বন্ধে কিছু জানিতে চেষ্টা করি।

বিলাতে যাওয়ার একবৎসর পরে কোন ইংরাজ থিওসফিষ্টের সহিত তাঁহার আলাপ হইল। তিনি তাঁহাকে ভারতবর্ষের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ গীতা পড়িতে অনুরোধ করিলেন। মোহনদাস অনুতাপের সহিত জানাইলেন, গীতা বুঝিবার মত সংস্কৃত জ্ঞান তিনি বাল্যজীবনে লাভ করিতে পারেন নাই।

তখন তিনি গীতার ইংরাজি অনুবাদ তাঁহার সহিত তাঁহাকে পড়িতে বলিলেন। উৎসাহী মোহনদাস ইংবাজি ভাষায় গীতা পড়িয়া শেষ করিলেন।

মোহনদাস নূতন আলোর সন্ধান পাইলেন। বুঝিলেন, ধর্ম্মের ক্ষেত্রে—নীতির ক্ষেত্রে গীতা মানুষের কাছে অমূল্য রত্নতুল্য।

সমুদ্র মন্থন হইল…আচম্বিতে সমুদ্রের ভিতর হইতে অমৃত উঠিল।…

দেবতাগণ অমৃত পান করিলেন…

দেবতাগণ অমর হইয়াছিলেন…

বিলাতের মাটিতে মোহনদাসের হৃদয়-সমুদ্র মথিত হইল…

মন্থনে…কোলাহলের মাঝে…কর্ম্মের মাঝে ধর্ম্মবোধ জাগিল…অমৃত উঠিল…

মোহনদাস উহা আকণ্ঠ পান করিলেন···

তিনি অমরত্বের পথ দেখিতে পাইলেন।

বাস্তবিক গীতা পাঠ মোহনদাসকে যেন অমৃতের ধারণা ও স্বাদ প্রদান করিল। ইংরাজি-গীতা তাঁহার মনে মূল সংস্কৃত গীতা পড়িবার আগ্রহ ও উৎসাহ জাগাইয়া দিল। এই উৎসাহের জন্যই তাহার পরিণত বয়সে আমরা দেখিযাছি—গীতার তিনি নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, গীতার কর্ম্ম ও ভক্তির প্রেরণাকে নিজে উপলব্ধি করিযা বিশ্ববাসীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, গীতার অন্তর্নিহিত সমস্ত মাধুর্য্য বিশ্বের ধর্ম্মপিপাসু ও অহিংসাব্রতীদের কাছে নূতনভাবে পরিবেশন করিয়াছেন। গীতাকে—গীতার বাণীকে জগতে আদর্শ করিয়া তুলিয়াছেন।

গান্ধীজীর ধর্ম্মজীবনের কথা আলোচনা করিতে হইলে গীতার কথা অবশ্য বলিতে হইবে। কিন্তু উহা পরে তাঁহার কর্ম্মের ধারা বিকাশের সহিত আবার আলোচনা করিব। গীতা পড়িবার পর তাঁহার মনে হিন্দু ধর্ম্মের অন্যান্য বইগুলি পড়িবার আকাঙ্ক্ষা জাগিল। কিন্তু বিলাতের মাটিতে বসিয়া ঐগুলি পড়িবার বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা তিনি পাইলেন না।

এই সময়ে অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি স্যার এডুইন আরণল্ডের অনূদিত বৌদ্ধগ্রন্থ 'লাইট অফ্ এশিযার' একখণ্ড হাতে পাইলেন। তিনি আগ্রহের সহিত উহা পড়িলেন। এইবার তিনি যেন গীতার ধর্ম্মের সহিত একটি আদর্শ চরিত্রের মিল দেখিলেন, কর্ম্মের সহিত ত্যাগের সন্ধান পাইলেন। এডুইনকৃত Light of Asia মোহনদাসের মনে নূতন আলোকপাত করিল।

এই সময়ে একজন ইংরাজ পাদরী তাঁহাকে বাইবেল পড়িতে বলিলেন। বাল্যকালে দেশের ইংরাজ মিশনারীগণের ব্যবহারে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার মনে একটা বিজাতীয় ধারণা এবং ঘৃণার ভাব জাগিয়াছিল। কিন্তু এইবার তাঁহারও ভিতরে বাইবেল পড়িবার জন্য একটা কৌতূহল জাগিল। কৌতূহল-বশে তিনি বাইবেল শেষ করিলেন। 'ওল্ড টেষ্টামেণ্ট' তাঁহার ভাল লাগিল

না, কিন্তু 'নিউ টেষ্টামেণ্ট' তাঁহার মনকে মোহিত করিল। যিশুর বাণী ও উপদেশ তাঁহাকে অপূর্ব্ব আলোকের সন্ধান দিল—তাঁহার নিকট নূতন সত্যের দ্বার খুলিয়া দিল।

ঐ বাণী ও উপদেশগুলিকে তিনি অন্তরের অন্তঃস্থলে ধরিয়া রাখিলেন। যুবক মোহনদাস মহাত্মারূপে নিজেকে গড়িয়া তুলিবার উপযোগী সত্য, অহিংসা ও আদর্শ বিকাশের পাথেয় সংগ্রহ করিলেন।

ইহা ছাড়া কার্য্যের অবকাশে ও পড়াশুনার অবসরে বিভিন্ন ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিদের সহিত তিনি মিলামিশা করিতে লাগিলেন, নানা আলাপ আলোচনা, তর্ক ও যুক্তির ভিতর দিয়া অসত্য ও সন্দেহের কুজ্ঝটিকা অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ ধর্ম্মের মূল সত্য ও সার বস্তুর সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও সান্নিধ্য বুঝিতে পারিলেন। ভবিষ্যতের যুগান্তকারী সংগ্রামের জন্য নিজের অজ্ঞাতসারেই অটুট বর্ম্মে সজ্জিত হইতে লাগিলেন।

যিশু অহিংসার বাণী প্রচার করিযাছিলেন ·

বুদ্ধ ধর্ম্মের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন···

শ্রীচৈতন্য প্রেমের বাণী প্রচার করিযাছিলেন···

যিশুর অহিংসা, বুদ্ধের কর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমের আদর্শে এক তরুণ যুবক বিলাতের মাটিতে বিকশিত হইতেছিলেন। হিংসা ও অসত্যের হলাহলে জর্জরিত জগৎ কি তাহা তখন জানিতে পারিয়াছিল!

*　　*　　*　　*

মোহনদাসের বিলাতের পড়া শেষ হইল। কর্ম্মজীবনের জন্য তাঁহার প্রস্তুতি শেষ হইল······অন্তর জ্ঞানের আলোকে, সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে তিনি একবার একটি বিরাট প্রদর্শনী দেখিবার জন্য ১৮৯০ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে গিয়াছিলেন। প্রদর্শনীর দ্রব্যাদি দেখিয়া বস্তুতান্ত্রিক ইউরোপ সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের জগৎপ্রসিদ্ধ নোতর-দামের গীর্জ্জা প্রভৃতি বহু প্রাসাদও তিনি দেখিলেন।

বিলাসী ফরাসী জাতির বিলাসিতার যথেষ্ট পরিচয় ফ্রান্সের পথেঘাটে ও আচার-ব্যবহারে দেখিতে পাইলেন। ফ্রান্স সম্বন্ধে একটা ধারণা লইয়া আবার বিলাতে আসিলেন। তারপর যথাসময়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কৃষ্ণ জন্মিযাছিলেন কংসের কারাগারে······কংসের আশ্রয়ে ছিলেন······ কংসের নিষ্ঠুরতা আর শক্তি জানিতে পারিয়াছিলেন······কংসের স্বরূপ জানিয়া মথুরায় চলিয়া গিযাছিলেন······ভবিষ্যতে কংসবধে প্রস্তুত হইযাছিলেন······

মোহনদাসের নব জন্ম হইল বিলাতের মাটিতে···ইংরাজের দেশে ইংরাজের শিক্ষা গ্রহণ করিলেন,······ইংরাজের বিদ্যা জানিলেন······বুদ্ধি জানিলেন······ শক্তি জানিলেন······

ইংরাজের স্বরূপ—পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ জানিযা ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেদিনের যুবক মোহনদাস·ইংরাজকে চিনিয়াছিলেন· ···পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ উপলব্ধি করিযাছিলেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করিযা গান্ধীজী দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার নিকট পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাণহীন বলিযা মনে হইয়াছিল। উহার মধ্যে শুধুমাত্র ভোগের আকাঙ্ক্ষা, ঐশ্বর্য্যপ্রিযতার আভাস তাঁহার অন্তরের গহন কোণে একটা সুগভীর বিরাগ জাগাইয়া দিযাছিল।

পনের
জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন

জুন-জুলাই মাসের সংক্ষুব্ধ সমুদ্র পাড়ি দিয়া গান্ধীজী দেশে ফিরিলেন। দেশের তটভূমি এবং রৌদ্রদীপ্ত নীলাকাশ তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল। প্রবাস-জীবনের শেষে মায়ের চরণে আসিয়া প্রণাম করিবেন······জননী তাঁহার স্নেহসজল দুই চক্ষুর আনন্দাশ্রুধারায় পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া বুকে টানিয়া লইবেন······এমনি কত রঙীন কল্পনা করিয়া তিনি বিদেশে জাহাজে চড়িয়াছিলেন। কিন্তু বোম্বাই বন্দরে পৌছিয়া তাঁহার সুখকল্পনার বাষ্পটুকু যেন খর রৌদ্রের তাপে শুকাইয়া গেল। তিনি শুনিলেন যে তাঁহার মাতা পুতলীবাঈ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন তাঁহার বিলাতপ্রবাসকালেই।

বড় ভাই সংবাদটা গোপন রাখিয়াছিলেন। দূর বিদেশে এই সংবাদ পাইয়া পাছে তাঁহার পড়াশুনার বিঘ্ন ঘটে এই কথা ভাবিয়া তিনি এই দুঃসংবাদটি জানান নাই।······মাতার মৃত্যুসংবাদ পাইযা গান্ধীজী অত্যন্ত কাতর হইলেন। পিতার মৃত্যু অপেক্ষাও এ দুঃখ তাঁহার নিকট অধিকতর মর্ম্মান্তিক হইয়াছিল'। তাঁহার জীবন-গঠনে মায়ের প্রভাব অনেকখানি ছিল বলিযাই মাতৃবিয়োগের সংবাদে তিনি মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইলেন।

মায়ের অহিংসা-ধর্ম্ম, দেবদ্বিজে ভক্তি, বারব্রত, উপবাস, রামায়ণ-ভাগবত পাঠ······এ সকলই বালক মোহনের মনে গভীর ছায়াপাত করিয়াছিল। যে আদর্শ এবং আলোক তাঁহার জীবনে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহার জীবনকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা অপসারিত হইয়া যাওয়ায় গান্ধীজীর অন্তরে শোকাগ্নি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি নিজেকে সংযত করিলেন আজীবন যিনি সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন তিনি জীবনের এই মুহূর্ত্তেও শোক সংবরণ করিলেন······অন্তরের শোককে অন্তরেই প্রচ্ছন্ন রাখিলেন—তাহাকে বাহিরে প্রকাশ হইতে দিলেন না।

জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন

দেশমাতৃকার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই গান্ধীজী মাতৃশোক পাইয়াছিলেন সত্য। কিন্তু এক ধর্ম্মজ্ঞ সাধুব্যক্তির সান্নিধ্যলাভ করায় তাঁহার সেই শোক তিনি অনেক পরিমাণে লঘু করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। এই সাধুপ্রকৃতি ব্যক্তিটির নাম—রাজচন্দ্।

একই সময়ে একশত বিষযে মনোনিবেশ করিতে পারিতেন বলিয়া এই সাধু ব্যক্তিটির নামকরণ হইয়াছিল শতাবধানী। রাজচন্দ্ হাজার হাজার টাকার ব্যবসা পরিদর্শন করিতেন, হীরা-মোতি পরখ করিতেন, ব্যবসায়ের শত সহস্র জটিল বিষয়ের সমাধান করিতেন। কিন্তু বৈষয়িকতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মধ্যে ছিল অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগ। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ছিল বহুবিস্তৃত, চরিত্র ছিল শুদ্ধ, আত্মদর্শন ছিল অপরূপ। ব্যবসার কথা শেষ হইবামাত্র ইনি ধর্ম্মপুস্তক লইয়া পাঠ করিতে বসিতেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে এক অপার শান্তি বিরাজ করিতে দেখা যাইত।

ইঁহার সংস্পর্শে আসিযা গান্ধীজীর কৌতূহল হইল যে এই লোকটির শক্তির অসাধারণতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। গান্ধীজী যতগুলি বিদেশী ভাষা শিখিয়াছিলেন সেইসব ভাষা হইতে নির্ব্বিচারে তিনি নানা শব্দ বলিয়া গেলেন—রাজচন্দ্ যথাক্রমে সমস্ত শব্দই পুনরাবৃত্তি করিলেন। তাঁহার এই ক্ষমতায় গান্ধীজী বিস্মিত হইলেন। ঈর্ষাও হইল তাঁহার। কিন্তু ঈর্ষা এক জিনিস, আর শ্রদ্ধা আর এক জিনিস। রাজচন্দের এই স্মৃতিশক্তি দেখিয়া গান্ধীজী প্রথমে ঈর্ষান্বিত হইলেও শ্রদ্ধান্বিত তিনি হন নাই। কিন্তু অনতিকালমধ্যেই ইঁহার অন্তরের পরিচয় পাইয়া গান্ধীজীর হৃদয় শ্রদ্ধায় ভরিয়া গিয়াছিল। তিনি ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মতত্ত্ব অনেক শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজচন্দ-ভাইয়ের প্রাণময় সংসর্গ গান্ধীজীর কল্পনাকে উদ্দীপিত করিল, তাঁহার আধ্যাত্মিকতাকে উদ্বুদ্ধ করিল। রাজচন্দ ভাইয়ের ধর্ম্মকথায় তিনি আনন্দ পাইতে লাগিলেন।

ছোট্ট একটি পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী। উপলখণ্ডের মধ্যে পথ খুঁজিয়া না পাইয়া যেমন আকুলি-বিকুলি করিতে থাকে, প্রাণহীন—অন্তরাত্মাবিহীন পাশ্চাত্য

শিক্ষা-দীক্ষাপ্রাপ্ত গান্ধীজীর অন্তরও তেমনি এতদিন আকুলি-বিকুলি করিতেছিল। কিন্তু রাজচন্দ্-ভাইযের সংস্রবে আসিয়া যেন তাঁহার দৃষ্টি খুলিয়া গেল— সত্যসন্ধানী মনীষী সত্যের আলোক-বর্ত্তিকা রাজচন্দ-ভাইয়ের নিকট হইতে পাইলেন, ...শান্তিতে তাঁহার হৃদয় আপ্লুত হইয়া গেল। গান্ধীজীর জীবন যে কয়জন মনীষীর প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল রাজচন্দ-ভাই তাঁহাদের অন্যতম।

অতঃপর সংসারে প্রবেশ করিবার পালা আসিল। গান্ধীজীর বড় ভাইযেব আশা ছিল অফুরন্ত। ভাই ব্যারিষ্টার হইযা দেশে ফিরিযাই যে প্রচুর উপার্জ্জন করিতে সুরু করিবেন, এ আশা তিনি করিযাছিলেন। কিন্তু জগতের বিধি বিধান মানুষের কল্পনার মত পাখায় ভর করিয়া উড়ে না। মানুষ ভাবে এক, হয আর। গান্ধীজীর জীবনেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন তাঁহাকে হইতে হইল। গান্ধীজীর জীবন বিচিত্র আবর্ত্তের মধ্যে পড়িল।

প্রথমতঃ জাতির কলহ গান্ধীজীর জীবনে এক আবর্ত্তের সৃষ্টি করিল। গান্ধীজী বিলাত যাওয়ায় একদল ধর্ম্মরক্ষী তাঁহাকে জাতিভ্রষ্ট বলিয়াই ধরিযা রাখিয়াছিল। তিনি দেশে ফিরিলে ধর্ম্মরক্ষীগণ সচেতন হইলেন। তবে এইবার তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত হইলেন। একদল গান্ধীজীকে জাতিতে টানিয়া লইলেন, কিন্তু অন্য দল অনমনীয় মনোভাব ধারণ করিয়া কোন মতেই তাঁহাকে জাতিতে তুলিতে চাহিলেন না। গান্ধীজী অবশ্য ইহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই। কেন তাঁহাকে জাতিতে তোলা হইল না এ প্রশ্ন উত্থাপন করিযা তিনি ধর্ম্মরক্ষীদিগকে কোনরূপ জেরা করিলেন না। জাতীয় হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে তিনি কোন আপীল করিলেন না। এই নিষ্ক্রিয়তায় ভাল ফলই ফলিয়াছিল। তাঁহার নীরবতার ফলে ধর্ম্মরক্ষীদের আস্ফালন ও গর্জ্জন আপনা-আপনিই কিছুদিনের মধ্যে স্তিমিত হইয়া গেল। গান্ধীজী সংসারী হইলেন।

প্রথমেই বাড়ীর ছেলেদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন। নিজের যে শিশুপুত্রটিকে রাখিয়া তিনি বিলাত গিয়াছিলেন তখন তাহার বযস মাত্র চার বৎসর। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারও একটি ছেলে ছিল। ইহাদের দুইজনকে লইয়া

গান্ধীজী রীতিমত একটা স্কুল খুলিয়া বসিলেন। শিক্ষার মধ্যে ব্যায়াম চর্চ্চা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিল। আহার্য্য সংস্কারও সুরু হইল। প্রাত্যহিক আহার্য্যের সহিত ওটমিলের পরিজ আর কোকো সংযুক্ত হইল। দেশীয় বাসনপত্রের জায়গায় গৃহে চীনামাটির কাপ ডিস ব্যবহৃত হইতে লাগিল। গৃহের সকলকে কোট-পাণ্টালুন পরাইয়া যথাসম্ভব বিলাতী কাযদায তিনি দুরস্ত করিতে লাগিলেন।

গান্ধীজীর এই সংস্কারে নূতনত্ব কিছু প্রবর্ত্তিত হইল বটে, কিন্তু খরচ বাড়িয়া গেল।

দেশে ফিরিয়া গান্ধীজী রাজকোটে প্রথমে ব্যারিষ্টারি করিতে সুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু পসার জমাইতে তিনি পারিতেছিলেন না। যৌবনে তিনি অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। সেইজন্য আইন ব্যবসাযে তেমন পসার জমাইতে পারিলেন না। অথচ গৃহে বিলাতি আদবকাযদা প্রবর্ত্তন করাতে খরচ বাড়িয়া গিযাছিল। কাজেই বন্ধুবর্গের পরামর্শে তিনি বোম্বাইয়ে ব্যারিষ্টারি করিবার জন্য আসিলেন। দু-একটা মামলা তাঁহার হাতে আসিতেও লাগিল। কিন্তু আদালতের অসাধুতায তাঁহার অন্তর সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতে লাগিল। মামলা সংগ্রহের জন্য দালালদিগকে তিনি দালালী দিলেন না······অন্যায়, অসাধুতার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—টাকা রোজগার না হয না হইবে—তথাপি অন্যায এবং অসাধু পথে কখনও যাইব না। সত্যাগ্রহীর সত্যের প্রতি, ন্যাযের প্রতি নিষ্ঠা জাগিযা উঠিল।

আইনজীবী হিসাবে উপার্জ্জনের অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া তিনি জীবিকা অর্জ্জনের অন্য পথের সন্ধানে রত হইলেন। শিক্ষকতার প্রতি তাঁহার আগ্রহ চিরদিনই ছিল। এই সমযে একটা সুযোগও মিলিযা গেল। কোন উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার জন্য তিনি আবেদন করিলেন। কিন্তু গ্রাজুযেট্ নহেন বলিয়া তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইল না।

এইবার নৈরাশ্যের অন্ধকার তাঁহার সম্মুখে জমাট বাধিযা বসিল। কিন্তু গান্ধীজী নিরুদ্যম হইলেন না।

ষোল

আলোকের সন্ধান

সংসার-জীবনে সংগ্রাম সুরু করিয়া গান্ধীজী যে নৈরাশ্যের তমসায় আচ্ছন্ন হইতেছিলেন, অকস্মাৎ তাহার মধ্যে আলোকের উন্মেষ দেখা দিল। তাঁহার জীবনে এক অভাবনীয় সুযোগ মিলিয়া গেল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় দাদা আবদুল্লা শেঠ নামে এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার বিরাট কারবার ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। ইঁহারই এক মামলার ভার লইয়া আফ্রিকা যাইবার এক সুযোগ গান্ধীজীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। গান্ধীজী এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া নাতাল পৌঁছিলেন। সেখানে পৌঁছাইয়াই তিনি বুঝিলেন যে সে দেশে ভারতীয়দের সম্মান নাই। অমনি রবীন্দ্রনাথের মত তাঁহার অন্তরের মধ্যে যেন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল—

> অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
> তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে!

এতদিন লক্ষ্মীলাভের জন্য তিনি সংগ্রাম করিয়া আসিতেছিলেন। এইবার অন্যায়ের সহিত সংগ্রামের জন্য তিনি নিজেকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

আফ্রিকায় পৌঁছিয়া গান্ধীজী আইন আদালতের মধ্যেও নচিকেতার মত সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত হইলেন। আইন ব্যবসায় তাঁহার জীবনে গৌণ হইয়াই ছিল। আফ্রিকাতেও তাহা গৌণ হইয়াই রহিল। যে মহাব্রত সাধনের জন্য বিধাতা-পুরুষ তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহারই সাধনায় তিনি আত্মোৎসর্গ করিলেন। তিনি বাইবেল, কোরান, গীতা, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ নবদীক্ষিত সাধকের নিষ্ঠার সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বেও তিনি ঐসকল ধর্ম্মগ্রন্থের সহিত পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু উহাদের মধ্য হইতে সত্যের আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া তাঁহার অন্তর্জগৎকে উদ্ভাসিত করিতে সমর্থ হয় নাই।

এবার এই আফ্রিকা প্রবাসকালে ঐসকল শাস্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহার সত্যদর্শন জন্মিল। তখন সন্ধানী গান্ধীর চোখে ঘুম নাই; নিশীথ দীপালোকে তিনি শাস্ত্ররাশি মন্থন করিতেছেন। টলষ্টয়, রাস্কিন, ম্যাক্সমূলার, বিবেকানন্দের বাণী পাঠ করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সাধনা সফল হইতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন কায়িক শ্রমের মর্য্যাদা, হিংসা দ্বেষের ভয়াবহতা, প্রেমের অজেয় শক্তি। গান্ধীজীর অন্তরে অহিংস নীতির উন্মেষ ঘটিল।

আফ্রিকায় গান্ধীজীর মধ্যে যেমন অহিংস নীতির বিকাশ ঘটিয়াছিল, অন্যায়ের সঙ্গে, অবিচারের সঙ্গে সংগ্রামের সূচনাও এই আফ্রিকায়।

সতের

সংগ্রামের সূচনা

নাতালে পৌঁছিয়াই গান্ধীজী ভারতীয়দিগের অপমানজনক অবস্থাটা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মামলা পরিচালনা করিবার নিমিত্ত আদালতে উপস্থিত হইয়াও তিনি ইহা উপলব্ধি করিলেন।

আবদুল্লা শেঠ আদালতে তাঁহার উকিলের পার্শ্বে গান্ধীজীর একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিযাছিলেন। গান্ধীজী সেই আসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার পরণে ছিল সাহেবী পোযাক। কিন্তু মাথায ছিল ভারতীয পাগড়ি। ঐ পোষাকে আদালতে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিতেই বিচারপতির দৃষ্টি পড়িল তাঁহার উপর। তিনি গান্ধীজীকে তাঁহার পাগড়ি খুলিয়া ফেলিবার হুকুম দিলেন।

আদালতে প্রবেশ করিতে হইলেই সেদেশে ভারতবাসীদিগকে মাথার পাগড়ি খুলিতে হইত। মুসলমানী পোশাক পরা থাকিলে পাগড়ি পরিযাই ভারতীযগণ আদালতে প্রবেশ করিতে পারিত। কিন্তু অন্য পোষাকে পাগড়ি পরিত্যাগ করিয়া তবে আদালতে প্রবেশ করিতে হইত। গান্ধীজীর পরণে মুসলমানী পোষাক ছিল না বলিয়াই বিচারপতি গান্ধীজীকে তাঁহার পাগড়ি খুলিয়া ফেলিতে বলিলেন।

পাগড়ি খুলিয়া আদালতে প্রবেশ করা অপমানকর মনে করিযা গান্ধীজী স্থির করিয়াছিলেন যে তিনি সাহেবী টুপিই ব্যবহার করিবেন। কিন্তু আবদুল্লা শেঠের পরামর্শে তিনি তাঁহার সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। আবদুল্লা শেঠ বলিলেন,—এমনভাবে নীরবে একটা অর্থহীন অপমান সহ্য করা অনাচারকে প্রশ্রয় দেওয়ারই নামান্তর। কথাটা গান্ধীজীর মনে লাগিল। তিনি আবদুল্লা শেঠের দেশপ্রেমে মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার নিজের অন্তরেও একটা মর্য্যাদাবোধ জাগিয়া উঠিল। ভারতীয়গণের মর্য্যাদা সম্বন্ধে তিনি সচেতন হইলেন এবং

আদালতের এই অন্যায় নির্দ্দেশের সংবাদটি সংবাদপত্রে পাঠাইয়া দিলেন। সংবাদটির সঙ্গে সঙ্গে এই মন্তব্যটুকু করিতে বিস্মৃত হইলেন না যে, পাগড়ি পরিয়া আদালতের মধ্যে প্রবেশ করার মধ্যে কিছুমাত্র অন্যায় নাই।

ইহাতে চারিদিকে বেশ একটা সোরগোল পড়িয়া গেল।

ভারতীয়গণ আফ্রিকায় কুলি বলিয়া অভিহিত হইত। গান্ধীজী ভারতীয় পাগড়ি পরিতেন বলিয়া তিনি কুলি ব্যারিষ্টার বলিয়া খ্যাত হইলেন। সংবাদপত্রে আদালতের বিধানের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদকীয় স্তম্ভে তিনি 'অবাঞ্ছিত আগন্তুক' বলিয়া অভিহিত হইলেন।

আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। তাহাদের অবস্থা ক্রীতদাসেরও অধম ছিল। তাহারা ফুটপাথের উপর দিয়া চলিতে পারিত না। উচিত মূল্য দিলেও ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর কামরায় আরোহণ করা তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। আদালতে ভারতীয়গণ সুবিচার পাইত না। দুর্ব্বহ করভার, পুলিশের অসম্মানজনক আইনকানুন, প্রকাশ্যে দলে দলে উৎপীড়ন, লিন্চিং— এমনি নানারকমের অত্যাচার-উৎপীড়ন ভারতীয়দিগের উপর চলিত। আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দিগের দুঃখদুর্দ্দশায় তিনি নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন। এমন সময় প্রিটোরিয়ায় তাঁহার ডাক পড়িল।

আঠার

ক্রমবর্দ্ধমান লাঞ্ছনা

আবদুল্লা শেঠের নিকট হইতে মকদ্দমার বিবরণ বুঝিয়া লইয়া অল্পকালের মধ্যেই গান্ধীজীকে নাতাল হইতে প্রিটোরিয়ায় যাত্রা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার জন্য প্রথম শ্রেণীর টিকিট কাটা হইল।

যথাসময়ে ট্রেণ ছাড়িল। গান্ধীজী প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। রাত্রি নয়টার কাছাকাছি গাড়ী নাতালের রাজধানী মরিজবুর্গে পৌছিল। এমনি সময়ে একদল শ্বেতকায় ব্যক্তি গাড়ীতে উঠিয়া বারকয়েক গান্ধীজীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে নামিযা গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সে একজন রেল-কর্ম্মচারীকে সঙ্গে করিয়া ঐ প্রথন শ্রেণীর কামরায় উপস্থিত হইল এবং গান্ধীজীকে বলিল,—নামিযা আইস! তোমায় তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় যাইতে হইবে।

গান্ধীজী বলিলেন—আমার নিকট প্রথম শ্রেণীর টিকিট আছে।

কিন্তু এ উত্তরে শ্বেতাঙ্গ রেলকর্ম্মচারী সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি গান্ধীজীকে ভালয় ভালয় নামিয়া যাইতে বলিলেন। নামিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে না গেলে সিপাহী ডাকিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে নামাইয়া দেওয়া হইবে এ ভয়ও তিনি তাঁহাকে দেখাইলেন।

গান্ধীজী ভয়ে দমিবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন যে স্বেচ্ছায় তিনি অন্যায় সহিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া যাইবেন না। সিপাহী আসিয়া তাঁহাকে নামাইয়া দিতে পারে।

আফ্রিকাবাসী শ্বেতাঙ্গগণ এরূপ উত্তর ভারতীয়দিগের মুখ হইতে কখনও শুনে নাই। ভারতীয়গণ অন্যায় এবং অবিচার নীরবে সহ্য করিয়াছে এবং শ্বেতাঙ্গদিগের আদেশ মান্য করিয়াছে,—ইহাই তাহারা চিরকাল দেখিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সেদিন গান্ধীজীর মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া শ্বেতাঙ্গটির আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। ক্রোধে অন্ধ হইয়া তিনি সত্যসত্যই সিপাহি

ডাকিলেন। সিপাহি আসিয়া গান্ধীজীকে বলপূর্ব্বক ষ্টেশনে নামাইয়া দিল, তাঁহার মালপত্রও টান মারিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে ফেলিয়া দিল।

অপমানে গান্ধীজীর দেহমন জর্জ্জরিত হইয়া গেল।

তখন শীতকাল। প্রচণ্ড শীতে তিনি ষ্টেশনের বিশ্রামকক্ষে যাইয়া বসিলেন। রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, শীত ততই প্রচণ্ড হইতে লাগিল। সেই প্রচণ্ড শীতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জমিয়া আসিতেছিল।

বিশ্রামকক্ষে বসিয়া গান্ধীজী একবার ভাবিলেন দেশে ফিরিয়া যাই। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন—না তাহা হইতে পারে না। এই অপমানের বোঝা মাথায় লইয়া দেশে ফিরিলে যে মিথ্যা অনাচার এবং অত্যাচার আফ্রিকার সর্ব্বত্র পরগাছার মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহার ত কোন প্রতিকার হইবে না। অন্যায়ের, অবিচারের ও অপমানের প্রতিকার তাঁহাকে করিতে হইবে।

মনে মনে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—যদি সাধ্য হয় তবে বর্ণ-বিদ্বেষের এই দুর্নীতিকে সমূলে উচ্ছেদ করিবেন। সংগ্রামের জন্য গান্ধীজী তাঁহার অন্তরকে দৃঢ়তর করিলেন।

গান্ধীজী এখনও প্রিটোরিয়ার পথে⋯এবং অপমান লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতনের এই সুরু।

ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে বসিয়া বসিয়াই তিনি রাত কাটাইয়া দিলেন। ভোর হইতেই আবদুল্লা শেঠের নিকট সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়া গান্ধীজী তার পাঠাইলেন। আবদুল্লা শেঠের মধ্যস্থতায় গান্ধীজীর নিরাপদ ভ্রমণের আশ্বাস মিলিল।

সকাল হইতেই মরিজবুর্গের ভারতীয় অধিবাসীগণ গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বেই আবদুল্লা শেঠের নিকট হইতে গান্ধীজীর আগমনবার্ত্তা জানিয়াছিলেন। গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহারা তাঁহার লাঞ্ছনার ইতিহাস শুনিয়া বলিলেন,—এমনিতর শত শত লাঞ্ছনা-অপমানের করুণ কাহিনী আমাদের জীবনের পাতায় পাতায় অঙ্কিত আছে রেলগাড়ীতে আমাদের জন্য তৃতীয় শ্রেণীই নির্দ্দিষ্ট।

কথাটা গান্ধীজীর তেমন ভাল লাগিল না। কি করিয়া বৎসরের পর বৎসর ভারতীয়েরা এইরূপ একটা অন্যায় ব্যবস্থা নির্ব্বিচারে মানিয়া আসিয়াছে তাহা চিন্তা করিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। পরাধীনতার গ্লানি তাঁহাকে ব্যথিত করিল।

রাত্রে প্রিটোরিয়ার ট্রেণ ছিল। সারাদিন মরিজবুর্গে কাটাইয়া রাত্রে গান্ধীজী সেই গাড়ীতে চড়িলেন। এবার পূর্ব্ব হইতেই গাড়ীতে তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি নিরাপদে পরদিবস চার্লস টাউনে পৌছিলেন।

চার্লস টাউন হইতে গান্ধীজীকে যাইতে হইবে জোহানসবার্গে। এই পথটুকুর মধ্যে রেলপথ ছিল না। এই পথটুকুর প্রচলিত বাহন ছিল ঘোড়ার 'সিগরাম'। সিগরামে যাত্রীরা দুইটি সারিতে বসিত। উপরে বসিত চালক ও কণ্ডাক্টার। গান্ধীজী ভারতীয—সুতরাং গাড়ীর ভিতর তাঁহার জায়গা জুটিল না। তিনি ড্রাইভারের পাশে কণ্ডাক্টারের জায়গায় বসিলেন। কণ্ডাক্টার বসিল গাড়ীর ভিতরে।

কিন্তু ইহাতেও অপমানের শেষ হইল না। গাড়ী কিছুক্ষণ চলিবার পর সিগরাম-চালকের কাছ হইতে একখণ্ড চট চাহিয়া লইয়া কণ্ডাক্টার উহা পাদানির উপর বিছাইয়া দিল এবং গান্ধীজীকে উহার উপর বসিয়া যাইতে বলিল। তাহার ধূমপানের সখ হইয়াছে, সে চালকের পাশে বসিবে বলিয়া গান্ধীজীর জন্য এইরূপ অপমানজনক ব্যবস্থা।

গান্ধীজী ইহার প্রতিবাদ করিলেন। এ অন্যায় আদেশ তিনি নীরবে মানিয়া লইতে পারিলেন না। ইহাতে কণ্ডাক্টার তাঁহাকে নানারূপ গালি দিল এবং নির্ম্মমভাবে প্রহার করিল।

গালি শুনিয়া, প্রহার সহ্য করিয়া গান্ধীজী ষ্টণ্ডারটনে পৌছিলেন। এইস্থানে সিগরাম বদল করিতে হয়। এখান হইতে গান্ধীজী জোহানসবার্গে পৌছিলেন।

অপরিচিত এই শহরে পৌছিয়া গান্ধীজী কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং একাকীই হোটেলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ভারতীয় 'কুলি' বলিয়া সেখানে তাঁহার আশ্রয় মিলিল না।

ক্রমবর্দ্ধমান লাঞ্ছনা

মহম্মদ কাসেম আলি নামে জনৈক ভারতীযের ঠিকানা গান্ধীজীর কাছে ছিল। তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আতিথ্য প্রার্থনা করিলেন। এখানে তাঁহার অভ্যর্থনার অভাব হইল না।

এখান হইতে প্রিটোরিয়া যাইতে হইবে। জোহান্‌সবার্গ হইতে প্রিটোরিয়া সাঁইত্রিশ মাইল। এই পথ ট্রেণে অতিক্রম করিতে হইবে। গান্ধীজী এখানে কথায় কথায় জানিতে পারিলেন যে এই জাযগায় ভারতীয়দিগকে প্রথম শ্রেণীর টিকিট বিক্রয়ই করা হয় না। যাহা হউক, তিনি ষ্টেশন-মাষ্টারের নিকট প্রথম শ্রেণীর টিকিটের জন্য আবেদন করিলেন এবং ষ্টেশনে পৌঁছিয়া শুনিলেন যে তিনি প্রথম শ্রেণীর টিকিট পাইতে পারেন, কিন্তু পথে গার্ড আসিযা যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁহাকে নামাইযা তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠাইযা দিতে পারে।

তথাপি গান্ধীজী প্রথম শ্রেণীর টিকিট লইযা প্রথম শ্রেণীতেই যাত্রা করিলেন। পথে গার্ড তাঁহার টিকিট দেখিতে চাহিল। তিনি টিকিট দেখাইলেন, গার্ড বলিল প্রথম শ্রেণীর টিকিট বটে। কিন্তু কালা-আদমীর প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করার অধিকার নাই। তাঁহাকে তৃতীয শ্রেণীতে যাইতে হইবে।

ট্রেণের কামরায গান্ধীজীর একজন সহযাত্রী ছিলেন। তিনি ইংরেজ। তিনিই ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন। গার্ডকে তিনি ধমক দিয়া বলিলেন—এ তোমার অন্যায। লোকটির প্রথম শ্রেণীর টিকিট রহিয়াছে। সে তৃতীয় শ্রেণীতে যাইবে কেন ?

ইঁহার কথা শুনিযা মুখ কালো করিয়া গার্ড বলিল—বেশ, আপনি যদি কুলির সহিত ভ্রমণ করিতে চাহেন ত করুন। আমাদের তাহাতে আপত্তি করিবার কারণ কি আছে ?

এইরূপ অপমান ও লাঞ্ছনা সহিযা গান্ধীজী নাতাল হইতে প্রিটোরিয়ায় পৌছান। কিন্তু যতই তিনি লাঞ্ছনা ও অপমান সহিতেছিলেন, ঐ অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতিকারের জন্য তাঁহার অন্তর ততই দৃঢ় হইতেছিল।

উনিশ

স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম তূর্য্য

লাঞ্ছনা-অপমানের বোঝা বহিয়া গান্ধীজী প্রিটোরিয়ায় পৌঁছিলেন। এই প্রিটোরিয়াতেই গান্ধীজীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম তূর্য্য বাজিয়া উঠে। প্রিটোরিয়া ট্রানসভাল রাজ্যের অন্তর্গত। এখানে ভারতীয়দিগের প্রতি অপমানকর ব্যবহার গান্ধীজীকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল—ভারতীয়দিগের নীরবতা তাঁহাকে পীড়িত করিল। আফ্রিকার মূঢ়, মূক, ম্লান ভারতীয়দিগের মুখে ভাষা দিবার জন্য তিনি উদ্যমী হইলেন। তাহাদের অন্তরে আশার সঞ্চার করিবার আকাঙ্ক্ষা গান্ধীজীর মনে জাগিল।

ট্রানসভালে যে-সব ভারতীয় মজুর বা ব্যবসায়ী ছিল তাহাদের অধিকাংশই ছিল নিরক্ষর। সরকারের হাতে তাহাদের লাঞ্ছনার সীমা-পরিসীমা ছিলনা। ফুটপাথের উপর উঠিলে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কৈফিয়ৎ দিতে হইত। তাহারা ফুটপাথের উপর দিয়া চলিতে পারিত না। ফুটপাথের নীচ দিয়া তাহাদিগকে হাঁটিতে হইত।

ভারতীয়দের অপমানের শেষ এখানেই হয় নাই। রাত্রি নয়টার পর কোন ভারতীয় প্রিটোরিয়ার পথে বাহির হইতে পারিত না। একটি নির্দ্দিষ্ট এলাকায় ভারতীয়দিগকে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকিতে হইত। সেই এলাকার বাহিরে যাহারা ঘর বাঁধিতে যাইত তাহাদের লাঞ্ছনার আর অবধি থাকিত না।

গান্ধীজী দেখিলেন যে এত দুঃখ, এত অপমান ভারতীয়গণ সহ্য করিতেছেন, অথচ তাঁহারা একতাবদ্ধ নহেন। অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য তাঁহারা নিশ্চেষ্ট। অত্যাচার, অপমান ও নিপীড়ন সহ্য করাটা ভারতীয়দিগের কেমন যেন গা-সহা হইয়া গিয়াছিল। একের অপমানে অন্যে লজ্জা পাইতেন না। একের আহ্বানে অন্যে সাড়া দিতেন না।

গান্ধীজী বুঝিলেন সর্ব্বাগ্রে এই বিচ্ছিন্ন শক্তিকে সংহত করিতে হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় জনগণকে সম্মিলিত করিয়া তাহাদের শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে।

আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের মধ্যে শেঠ তৈয়ব হাজি মহম্মদের বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। গান্ধীজী তাঁহার অন্তরের কথাটা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলেন। স্থির হইল যে একটি সভায় গান্ধীজী তাঁহার বক্তব্য—ভারতীয়গণের অপমান-লাঞ্ছনার গুরুত্বটুকু তাঁহার দেশবাসীকে বুঝাইয়া দিবেন।

মহম্মদ হাজি যুসবের বাড়ীতে সভা বসিল। গান্ধীজী ধীরে ধীরে শ্রোতাদিগের নিকট ভারতীয়দিগের অপমানের করুণ চিত্রটি সহজ সরল ভাষায় স্পষ্ট করিয়া তুলিলেন।

গান্ধীজী বলিয়াছেন, "ইহাই আমার জীবনের প্রথম বক্তৃতা বলা যায়।" কিন্তু এই প্রথম বক্তৃতায় যে বহ্নি তিনি ভারতীয়দিগের অন্তরে জ্বালিয়াছিলেন, তাহা অনির্ব্বাণ দীপশিখার মত দীপ্যমান থাকিয়া ভারতীয়দিগকে নিজেদের মর্য্যাদা রক্ষায় সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল। বক্তৃতায় তিনি ভারতীয়দের যে সকল গ্লানি লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন এবং বলিলেন যে, ভারতীয়দিগের অপমানের প্রতিকার করিতে হইলে একটি সমিতি গঠন করিতে হইবে। অপমানের প্রতিকারের জন্য একতার প্রয়োজনীয়তা তিনি বুঝাইলেন। হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান অথবা গুজরাটি, মারাঠী, সিন্ধী, সুরাটী প্রভৃতি ভেদনীতি বর্জ্জন করিতে বলিলেন। সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে অত্যাচারী ও উৎপীড়কগণের বিরুদ্ধে মাথা তোলা সম্ভব নহে, একথাটা ভাল করিয়াই সেদিন তিনি তাঁহার দেশবাসীকে বুঝাইয়াছিলেন। আজীবন তিনি এই নীতিই প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। আফ্রিকায় গান্ধীজী ভারতীয়দিগকে মিলনের যে মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই মহামন্ত্রেই দীক্ষিত করিয়া এই ভারতভূমিকে তিনি এক ঐক্যবদ্ধ 'মহা-ভারতে' পরিণত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

সেদিন অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ আফ্রিকায গান্ধীজী যে আলোকবর্ত্তিক জ্বালিলেন তাহাতে তথাকার ভারতীয়দিগের অন্তর্লোক আলোকিত হইযা উঠিল। তাহাদের আত্মসম্মান ও মর্য্যাদাবোধ জন্মিল। বক্তৃতায সুফল ফলিল। তাঁহার আবেদন নিষ্ফল হইল না।

রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে পাষাণী অহল্যা প্রাণময়ী হইয়াছিল। গান্ধীজীর বাণীতে সেদিনকার জড়বৎ ভারতীয়দিগের সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। তাহাদের মোহ টুটিল, অপমানকে অপমান বলিযা তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখিল। সকলে সমবেতভাবে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অপমান-লাঞ্ছনার প্রতিকারের জন্য সক্রিয হইলেন। বহু বৎসরের নিষ্ক্রিয়তার জড়তার অবসান ঘটিল। অন্যায়ের সহিত, অবিচারের সহিত; অত্যাচার-উৎপীড়নের সহিত সংগ্রামের তূর্য্য ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

গান্ধীজী রেল-কর্ত্তৃপক্ষের সহিত চিঠিপত্র লেখালেখি করিতে লাগিলেন। ভারতীয ট্রেণ-যাত্রীদিগকে যে অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয় তাহার প্রতি রেল-কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সেই অন্যাযের প্রতিবিধানের জন্য তাঁহাদিগকে সচেষ্ট হইবার অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে শাসনের রাস একটু ঢিলা হইল। রেল-কর্ত্তৃপক্ষ জানাইলেন যে ভাল কাপড়-জামা পরা থাকিলে ভারতবাসীরাও প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে পারিবে।

কিন্তু ইহাতেও একটা অসুবিধা রহিযা গেল। কারণ, ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ কি, তাহা স্থির করিবেন ষ্টেশনমাষ্টার। ব্যক্তিগত মরজিতে যাঁহার পরিচ্ছদ তাঁহার বিবেচনায় মন্দ বিবেচিত হইবে, তাঁহাকে তিনি প্রথম অথবা দ্বিতীয শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে দিবেন না।

যাহা হউক, গান্ধীজীর এই প্রচেষ্টায তিনি প্রিটোরিযার তথা আফ্রিকার ভারতীয়দিগের নিকট পরিচিত হইলেন। তিনি তথাকার ভারতীয়দিগের অবস্থা জানিলেন এবং তথাকার ভারতীয়গণ তাঁহাকে জানিলেন। এই সময়েই প্রিটোরিয়াস্থ ব্রিটিশ এজেণ্টের সহিত তাঁহার পরিচয হইল।

ভারতীয়দিগের প্রতি যাঁহার সহানুভূতি ছিল—গান্ধীজী তাহা বুঝিলেন। এই এজেন্টের নিকট হইতে তিনি জানিলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেটের ভারতীয়দের তথা হইতে নির্ম্মমভাবে সরাইয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে। একটি আইন করিয়া সেখানকার সমস্ত ভারতীয়দিগকে বিতাড়নের প্রস্তাব হইয়াছে। কেবলমাত্র হোটেলের ভারতীয় ওয়েটার এবং কুলি মজুরগণ এই আইন হইতে বাদ পড়িয়াছিলেন। কারণ তাহাদের সহায়তা ব্যতিরেকে শ্বেতাঙ্গদিগের যে চলে না। বহুবৎসর ধরিয়া যে সকল ভারতীয় ব্যবসায়ী তাহাদের বুকের রক্ত দিয়া সাধের ব্যবসা গড়িয়া তুলিয়াছিল, নামমাত্র খেসারৎ দিয়া তাহাদিগকে বিদায় দেওয়া হইতেছিল। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা আবেদন-নিবেদন করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের ক্ষীণ স্বর গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর উৎপীড়কদের কর্ণে পৌঁছায় নাই।

১৮৮৫-৮৬ সাল। সেই সময়ে আফ্রিকাস্থ ট্রানসভাল রাজ্যে এমন একটা আইন পাশ হইল যাহার ফলে ভারতীয়দিগের অপমান কায়েমী করিবার প্রচেষ্টা দেখা দিল। এই আইনে স্থির হয় যে, ভারতবাসীমাত্রকেই ট্রানসভাল রাজ্যে প্রবেশ-ফি হিসাবে তিন পাউণ্ড কর দিতে হইবে। আরও স্থির হয় যে, কেবল নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে তাহারা ঘর বাঁধিয়া বসবাস করিতে পারিবে। ফুটপাথের উপর দিয়া চলা তাহাদের পক্ষে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। রাত্রি নয়টার পর বিনা লাইসেন্সে পথে বাহির হইলে তাহাদিগকে হাজতে যাইতে হইবে। যাহারা এই বন্দীদশা সহ্য করিতে প্রস্তুত কেবলমাত্র তাহারাই সেখানে থাকিতে পারিবে। অন্যেরা ঐ রাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে।

ফুটপাথে চলার ব্যাপার লইয়া গান্ধীজীকে এই সময়ে বড় তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইয়াছিল। তিনি রোজই প্রেসিডেণ্ট ষ্ট্রীটের এক খোলা ময়দানে বেড়াইতে যাইতেন। এই মহল্লায়ই প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের বাড়ী ছিল। বাড়ীর সামনে সিপাহী ঘুরাফিরা করিত। সিপাহীর গা

ঘেঁষিয়া গান্ধীজী প্রায় প্রতিদিনই ফুটপাথ দিয়া যাতায়াত করিতেন। সিপাহীরা তাঁহাকে কিছু বলিত না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সিপাহী বদলায়। একদিন এক সিপাহী অকস্মাৎ আগাইয়া আসিয়া গান্ধীজীকে ধাক্কা মারিল ও লাথি মারিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিল।

মিঃ কোটস তখন ঐ পথ দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন। তিনি ঘটনাটি দেখিয়া গান্ধীজীকে সিপাহীর বিরুদ্ধে নালিশ করিতে বলিলেন—নালিশ করিলে গান্ধীজীর অনুকূল সাক্ষী দিবেন এ প্রতিশ্রুতি তিনি দান করিলেন। কিন্তু গান্ধীজী নালিশ করিতে চাহিলেন না। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত মিঃ কোটসের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটার একটা মীমাংসা হইল। সিপাহী গান্ধীজীর নিকট মাফ চাহিল।

এই ঘটনার পর ভারতীয়দের জন্য গান্ধীজীর অনুভূতি আরও তীব্র হইয়া উঠিল। ভারতীয়গণ আফ্রিকায় যে অপমান-লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করে, এতদিন তিনি তাহার বিবরণই শুনিয়াছিলেন। সেদিন এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া অপমান-লাঞ্ছনার প্রতিকারের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন।

ইতিমধ্যে দাদা আবদুল্লার মামলা লইয়া তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। পরিশ্রমের ফল ফলিল। মোকদ্দমাটি আপোষে নিষ্পত্তি হইল।

কুড়ি

নাতাল ইণ্ডিয়ান্ কংগ্রেস স্থাপন

গান্ধীজীর আফ্রিকাবাস একবৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। যে উদ্দেশ্যে তিনি সেদেশে গিয়াছিলেন, তাহাও সিদ্ধ হইল। তিনি প্রিটোরিয়া হইতে ডারবানে ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে পৌছিয়া ভারতে ফিরিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু এমনি সময়ে একটি সংবাদপত্রে 'ভারতীয়দের ভোটের অধিকার' শীর্ষক এক বিজ্ঞপ্তি তিনি পাঠ করিলেন। পাঠ করিয়া জানিলেন যে, নাতালের ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয়দের যে ভোটের অধিকার ছিল তাহা রদ হইয়া যাইবে। দক্ষিণ অফ্রিকায় ভারতীয়দের কিছু ক্ষমতা তখনও অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু এই আইনটি পাশ হইলে তাহার শেষ চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত হইবে। ইহারই প্রতিবাদ-কল্পে গান্ধীজীকে তাঁহার ভারত প্রত্যাবর্ত্তনের প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতে হইল। আফ্রিকার ভারতীয়গণ তাঁহাকে ফিরিতে দিলেন না। গান্ধীজী আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দিগকে লইয়া একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিলেন। অবিচারের বিরুদ্ধে এই সমিতি ভারতীয়দিগের কর্ম্মপদ্ধতি স্থির করিবে ঠিক হইল।

ইতিমধ্যে 'ভারতীয়দের ভোটের অধিকার' শীর্ষক কালা-আইনের দ্বিতীয় দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। সভায় এমন আলোচনাও হইয়াছিল বলিয়া শুনা গেল যে, তখনও ভারতবাসীদিগের নিকট হইতে ঐ আইনের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি যখন জানান হয় নাই তখন ভারতীয়গণ যথার্থই ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার যোগ্য। কিন্তু বিলের কথাটা ভারতীয়-দিগের কর্ণে এ পর্য্যন্ত পৌছায়ই নাই। সুতরাং প্রতিবাদ হইবে কোথা হইতে? গান্ধীজী কথাটা সকলকে বুঝাইয়া দিয়া প্রতিবাদ ও সংগ্রামের জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন।

নাতালের ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিকে তার করা হইল—বিলের

আলোচনা যেন কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়। উত্তর আসিল তুইদিনের জন্য প্রস্তাব মুলতুবি থাকিবে। বিলের বিরোধিতা করিয়া একটি আবেদন-পত্র রচিত হইল। তাহাতে ভারতীয়দিগের স্বাক্ষর লইয়া আইনসভায় পাঠান হইল। উহার সংবাদ এবং আবেদনপত্রের নকল সংবাদপত্রে ছাপিতে পাঠান হইল।

কিন্তু বিল আইনে পরিণত হইয়া গেল। তুর্ব্বলের ক্ষীণ স্বর নাতালের আইনসভাকে কোনরূপ প্রভাবান্বিত করিতে পারিল না।

তথাপি ভারতীযদের মধ্যে একটা যেন নূতন জীবন, নবীন উদ্দীপনা সঞ্চারিত হইল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে সেদিন সকল ভারতবাসী উপলব্ধি করিলেন যে ভারতীয় সম্প্রদায় এক এবং অবিভক্ত। একতার মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠায়, একতার উদ্দীপনা গান্ধীজী আজীবন ভারতবাসীদিগের মধ্যে সঞ্চারিত করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। আফ্রিকায এই একতার, সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির উল্লাস তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সূত্রপাত ঘটাইযাছিলেন। আফ্রিকায় গান্ধীজীর জীবনবীণা যে সুরে বাঁধা হইল, সেই চড়া সুরেই তাহা আজীবন বাজিয়াছিল।

সেই প্রথম ভারতীয়গণ বুঝিয়াছিলেন যে বাণিজ্যিক অধিকারের জন্য আফ্রিকায তাঁহাদিগকে যেমন সংগ্রাম করিতে হইবে, তেমনি রাজনৈতিক অধিকারের জন্যও তাঁহাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইবে।

তখন আফ্রিকার ঔপনিবেশিক মন্ত্রী ছিলেন লর্ড রীপন। তাঁহার কাছে প্রতিবাদের আবেদন, ভারতীয়দিগের রাজনৈতিক অধিকারের দাবী জানান সাব্যস্থ হইল। গান্ধীজী অসীম পরিশ্রম করিয়া আবেদনের খসড়া প্রস্তুত করিলেন। স্বাক্ষর লইবার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদিগের মধ্যে উৎসাহের সীমা রহিল না। অবশেষে একমাস পরে দশ হাজার স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনটি লর্ড রীপনের নিকট পাঠান হইল।

আপাততঃ গান্ধীজীর কর্ত্তব্য শেষ হইল। তিনি ভারতীয়দিগের মধ্যে

তাহাদের রাজনৈতিক অধিকারবোধ জাগাইয়া যে তরঙ্গ তুলিয়াছিলেন তাহা উচ্ছ্বসিত আবেগে সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি ভাসাইয়া লইয়া যাইবার শক্তি অর্জ্জন করিতেছে ইহা বুঝিয়া তিনি ভারতে ফিরিতে চাহিলেন। কিন্তু বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে ছাড়িলেন না। বিলের প্রতিবাদে ভারতীয়দিগের মধ্যে যে উত্তেজনার স্রোত বহিয়াছিল, তাহাকে অশ্রান্ত রাখিবার জন্য গান্ধীজীকে আফ্রিকায় থাকিবার জন্য সেদেশের ভারতীযগণ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

গান্ধীজী আবার স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। সমিতি স্থির করিলেন যে গান্ধীজী যতদিন আফ্রিকায় থাকিবেন ততদিন ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে বৎসরে তিনশত পাউণ্ড্ করিয়া সাহায্য করা হইবে। কিন্তু গান্ধীজী এই সাহায্য গ্রহণ করিলেন না। তিনি নাতালে আইনব্যবসায় সুরু করিলেন।

কিন্তু আইনব্যবসায চিরকালকার মতই গান্ধীজীর নিকট গৌণ হইয়াই রহিল। গঠনমূলক কার্য্যেই তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের মধ্যে স্বাধীনতার যে হোমানল জ্বলিযা উঠিয়াছিল, তাহাতে আহুতি দিয়া তিনি উহাকে অম্লান রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আফ্রিকাবাসী ভারতীযদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া একটি চিরন্তন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার প্রয়োজনীযতা উপলব্ধি করিয়া ১৮৯৪ সালের ২২শে মে তারিখে 'নাতাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস' স্থাপিত হইল।

এই কংগ্রেসের অন্যতম কার্য্য হইল আফ্রিকায যে সকল ভারতীয়ের জন্ম, তাহাদের সেবা। কংগ্রেসে সাময়িক সমস্যা লইয়া বক্তৃতা হইত। ইহার আর একটি কার্য্য ছিল প্রচার। ইংলণ্ডে এবং ভারতবর্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের দুঃখকষ্টের প্রকৃত কাহিনী জানাইবার জন্য প্রচার-কার্য্য আরম্ভ হয়। গান্ধীজী ভারতীয়দের দুর্দ্দশা বর্ণনা করিয়া দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমটির নাম—'দক্ষিণ আফ্রিকার প্রত্যেক ইংরাজের

প্রতি নিবেদন' এবং 'ভারতীয়দের ভোটের অধিকার সম্পর্কে নিবেদন।' বই দুইখানির বহুল প্রচার হইয়াছিল। ফলও ভাল ফলিয়াছিল। নাতালের ভারতীয়দিগের অবস্থার বৃত্তান্ত সকলে জানিলেন। ভারতীয়দিগের ভোটের অধিকারও প্রমাণাদিসহ প্রচারিত হইল। গান্ধীজী তাঁহার কার্য্যের একটা সুনির্দ্দিষ্ট পথ এই কংগ্রেস স্থাপনের পর দেখিতে পাইলেন। সুনিয়ন্ত্রিত একটা পরিকল্পনা লইয়া গান্ধীজী এখন হইতে ভারতীয়দিগের জন্য সংগ্রাম সুরু করিলেন।

একুশ

দরিদ্রনারায়ণের সেবা

দরিদ্রের সেবা করার আকাঙ্ক্ষা গান্ধীজীর যৌবনেই জাগিয়াছিল এবং দরিদ্রের সেবা করার সুযোগও তিনি পাইয়াছিলেন।

উপনিবেশ-জাত ভারতীয়েরা এবং কেরাণীরা নবগঠিত 'নাতাল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের' সভ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তথাকার ভারতীয় মজুর ও গিরমিটিয়াগণ (চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিক) তখনও ঐ সভার সভ্য হয নাই। এমনি সময়ে একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটিল যাহাতে দরিদ্র দিন-মজুরদিগকে কংগ্রেসের সভ্য করিয়া লওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল—তাহাদের সেবা ও সহায়তার জন্য কংগ্রেসকে প্রস্তুত হইতে হইল।

ঘটনাটি এই। একদিন একটি মাদ্রাজী মজুর আসিয়া গান্ধীজীর সম্মুখে পাগড়ি খুলিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্ন, দারিদ্র্যজীর্ণ, তাহার দেহ কম্পমান্, মুখ দিয়া অবিরলধারায রক্ত পড়িতেছে, সামনের দাঁত দুটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

লোকটি গিরমিটিয়া। মাথার পাগড়ি খুলিয়া উহা হাতে করিয়া সে গান্ধীজীর সম্মুখে দাঁড়াইল।

পাগড়ি খুলিয়া তাহা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া গান্ধীজী তাহাকে পাগড়ি পরিতে বলিলেন। কিন্তু লোকটি তবুও পাগড়ি পরিতে ভরসা পাইল না। গান্ধীজী পুনরায় তাহাকে অভয় দিলেন। সে দ্বিধার সহিত পাগড়ি পরিল। গান্ধীজী দেখিলেন যে মাথায় পাগড়ি পরিতে পাইয়া আনন্দে তাহার মুখচোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। গান্ধীজী বুঝিলেন এ আনন্দ কিসের? সেই সামান্য গিরমিটিয়ারও যে একটা মর্য্যাদা আছে এবং সে মর্য্যাদাও অন্যে স্বীকার করে……তাহাকেও অন্যে সম্মান করে, একথা ইতিপূর্ব্বে সে কল্পনা করিতেও পারে নাই। আফ্রিকায় বাস করিয়া সে এইটাই

দেখিয়া আসিয়াছে যে সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইলে মাথার পাগড়ি খুলিয়া দাঁড়াইতে হয়। গান্ধীজী সাহেব নন তাহা সে জানিত। কিন্তু সম্মানের পাত্র বলিয়াই সে অনাবৃত মস্তকেই তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু গান্ধীজী তাহার সে সঙ্কোচ ভাঙ্গিয়া দিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশে লোকটি পাগড়ি পরিয়া নিজের লাঞ্ছনার কাহিনী বিবৃত করিল।

জানা গেল যে লোকটির নাম বালাসুন্দরম্। সে এক গোরার অধীনে কাজ করিত। কোন কারণে তাহার মনিব তাহার উপর চটিয়া গিয়া তাহাকে উন্মত্তের মত প্রহার করিয়া এমনিতর জর্জ্জরিত করিয়াছে।

সমবেদনায় গান্ধীজীর মন ভরিয়া গেল। তিনি প্রথমে ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইলেন এবং তাহা লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট গোরা মালিকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার নামে শমন জারি করার হুকুম দিলেন।

গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ছিল বালাসুন্দরম্‌কে তিনি উহার অত্যাচারী গোরা মনিবের নিকট হইতে মুক্ত করিবেন। তাহাকে শমন দিবার উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল না। কিন্তু আইন আলোচনা করিয়া তিনি দেখিলেন যে, গিরমিটিয়াগণের মুক্তি সম্ভব নহে। সাধারণ মজুরে ও গিরমিটিয়াতে প্রভেদ বিস্তর। গিরমিটিয়াদের কেহ যদি চাকুরি ছাড়িয়া দেয়, তবে তাহার ফৌজদারী অপরাধ হয়, সেজন্য তাহাদিগের জেল পর্য্যন্ত হইতে পারে। ইহা দাসত্বেরই নামান্তর।

যাহা হউক, গান্ধীজী বালাসুন্দরম্‌কে মুক্ত করিবার চেষ্টাই করিলেন। উহার মনিবকে শাস্তি দিবার পথে তিনি গেলেন না। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল···বালা-সুন্দরম্ মুক্ত হইয়া অন্য মনিবের নিকট কাজ সুরু করিল গান্ধীজীরই সহায়তায়।

অতঃপর গিরমিটিয়ারা চারিদিক হইতে গান্ধীজীকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাঁহাকে তাহারা তাহাদের পরম বন্ধু বলিয়া ধরিয়া লইল।

এই ঘটনার পরে গান্ধীজীর প্রতিষ্ঠা শতগুণে বাড়িয়া গেল। দরিদ্র অসহায় গিরমিটিয়াগণ জানিল যে তাহাদের মত অবহেলিত উৎপীড়িত জাতিটার জন্যও সংগ্রাম করিবার মত অন্ততঃ একজন লোক আছেন।

বাইশ

ঘনায়মান বিরোধ

১৮৬০ সাল। নাতালে তখন আখের চাষ খুব ভাল চলিতেছিল। কিন্তু লাভের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য শ্বেতাঙ্গগণ মজুরের দরকার বোধ করিলেন। কাজেই দারিদ্র্যপীড়িত ভারতবর্ষ ও ভারতীয় মজুরদের কথা তাঁহারা স্মরণ করিলেন। নাতালবাসী শ্বেতাঙ্গরা ভারতসরকারের নিকট চিঠিপত্র লিখিয়া অসংখ্য ভারতীয় মজুর নাতালে লইয়া যাওয়ার জন্য অনুমতি লয়। শর্ত্ত হয় এই যে—মজুরেরা পাঁচ বৎসরের চুক্তিতে নাতালে আসিবে। পাঁচ বৎসর কাজ করিবার জন্য তাহারা বাধ্য থাকিবে। তাহার পর চুক্তির মেযাদ ফুরাইয়া গেলে তাহারা স্বাধীন হইবে। যদি ইচ্ছা করে তবে তাহারা নাতালে জমি কিনিয়া স্বাধীনভাবে বসবাস কবিতেও পারিবে।

চুক্তির শেষে দেখা গেল যে ভারতীয় মজুরেরা চাষবাস করিয়া নাতালে অপর্য্যাপ্ত লাভ করিতেছে। তাহারা প্রচুর পরিমাণে শাকসব্জী উৎপন্ন করিতেছে, ভারত হইতে নূতন নূতন শাকসব্জী আনিয়া প্রবর্ত্তন করিতেছে, ভারত হইতে আম আনিয়াও তাহারা সেখানে উহা প্রবর্ত্তন করিল। তাহারা ফলমূল শাকসব্জীর ব্যবসায় কবিতেও সুরু করিল। ব্যবসাযে লাভের সংবাদ ভারতেও পৌছিল। ভারত হইতে মজুরদিগের পশ্চাতে ব্যবসাযীরাও সেখানে গিয়া জুটিতে লাগিলেন।

ইহাতে শ্বেতাঙ্গ ব্যবসাযীগণ চমকিয়া উঠিলেন। ভারতীয়দিগের ব্যবসায়-বুদ্ধি দেখিয়া, লাভের পরিমাণ দেখিয়া তাঁহারা শিহরিলেন। ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকগণ যদি স্বাধীনভাবে কৃষক হিসাবে আফ্রিকায় বসবাস করিত, শ্বেতাঙ্গগণের তাহাতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু ভারতীয়েরা তাহাদের ব্যবসায়ের লাভে অংশ বসাইতে সুরু করিল, ইহা শ্বেতাঙ্গদের নিকট অসহ্য হইল।

ইহার ফলে ভারতীয়দিগের সহিত শ্বেতাঙ্গদিগের বিরোধ ঘনাইয়া উঠিল। ভারতীয়দিগের ভোট দিবার অধিকার উঠাইয়া দিয়া এবং চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদিগের উপর কর চাপাইয়া দিয়া এই বিরোধ মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। ১৮৯৪ সালে আইন প্রণীত হইল যে—চুক্তিবদ্ধ মজুর যদি পাঁচ বছরের চুক্তিশেষে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করে ত উত্তম। নইলে মজুর খাটিবার জন্য তাহাদিগকে নূতন চুক্তি করিতে হইবে। নতুবা তাহাদিগকে বাৎসরিক মাথাপিছু পঁচিশ পাউণ্ড কর দিতে হইবে। দরিদ্রদিগের প্রতি অন্যায় জুলুম সন্দেহ নাই! কিন্তু স্বার্থান্ধগণ দরিদ্রের উপর এমনি জুলুম চিরকালই এ পৃথিবীতে করিয়া আসিতেছে।

গান্ধীজী তাঁহার দলবল লইয়া ইহার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন সুরু করিয়া দিলেন। লর্ড এলগিন তখন ভারতের গবর্ণর জেনারেল। ভারতীয়দিগের উপর অবিচারের এতটা আতিশয্য তিনিও সমর্থন করিলেন না। সুতরাং করভার পঁচিশ পাউণ্ড হইতে তিন পাউণ্ডে নামিল।

কর হ্রাস পাওয়ায় গান্ধীজী খুশী হইলেন না। ভারতীয়দিগকে কেন কর দিতে হইবে তাহার অর্থ তিনি সুরু হইতেই খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। এই কর দানের নীতিটাই তাঁহার কাছে অন্যায বলিয়া প্রতীযমান হইয়াছিল। সুতরাং এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি তাঁহার সংগ্রাম থামাইলেন না।

করভার তুলিয়া দিবার সঙ্কল্প লইয়া নাতাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল, সঙ্কল্প পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে কংগ্রেস সে আন্দোলন ত্যাগ করে নাই। ইহাই ত 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'র……'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতনে'র পূর্ব্বাভাষ!

অন্যায় কর প্রত্যাহার করাইবার জন্য যে আন্দোলন সুরু হইল, তাহা সার্থকতামণ্ডিত হইতে দীর্ঘ কুড়ি বৎসর লাগিয়াছিল। তাহাতে কেবল নাতালের নয়, সারা দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দিগের যোগ দিতে হইয়াছিল। মহামতি গোখলেও এই আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইয়া পড়িযাছিলেন৭ গান্ধীজীর

এই আন্দোলন অহিংস নীতির দ্বারাই চালিত হইয়াছিল। এই আন্দোলনে বহু ভারতীয়কে জরিমানা, বেত্রাঘাত, কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে। অনেককে গুলির আঘাতে প্রাণ দিতে হইযাছে। তখন গান্ধীজী আফ্রিকার ভারতবাসীদিগকে চালনা করিয়াছেন, কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ রাখিযাছেন। সত্যাগ্রহের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া তিনি আফ্রিকার সত্যাগ্রহী ভারতীয়দিগকে কর্ত্তব্যে প্রণোদিত করিয়াছিলেন।

তেইশ

ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন

তিন বৎসর আফ্রিকা প্রবাসের পর ১৮৯৬ সালে গান্ধীজী ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উদ্দেশ্য ছিল পরিবারবর্গকে লইয়া আফ্রিকায় পুনরায় যাইবেন। কারণ তিনি একথা বেশ বুঝিয়াছিলেন যে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহাকে দীর্ঘকাল থাকিতে হইবে। অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ ও প্রতিকারের জন্য, জনসেবার জন্য আফ্রিকায় তাঁহার উপস্থিতি অপরিহার্য্য ছিল। তিন পাউণ্ডের করটি তখনও প্রত্যাহৃত হয় নাই। উহা প্রত্যাহার করাইবার জন্য যে আন্দোলন তিনি সুরু করিয়াছিলেন তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষা রহিয়া গিয়াছিল। যতদিন না ঐ অন্যায় করভার প্রত্যাহৃত হয় ততদিন তিনি শান্তি পাইতেছিলেন না।

ভারতে ফিরিয়া গান্ধীজী আফ্রিকার সমস্যা লইয়াই ব্যস্ত রহিলেন। তিনি স্বদেশেও আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের হীন অবস্থা সম্বন্ধে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন অবস্থা লইয়া তাঁহার "সবুজ পুঁথি" রচিত হইল।

এদিকে বোম্বাইয়ে এই সময়ে ভীষণ এক মড়ক দেখা দিল। চারিদিকে আতঙ্ক। গান্ধীজী তখন রাজকোটে। পাছে রাজকোটেও ব্যাধি ছড়াইয়া পড়ে—এই আশঙ্কায় সেখানে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একটি সমিতি গঠিত হইল। গান্ধীজী স্বেচ্ছায় এই সেবাদলে যোগ দিলেন। তিনি ভার লইলেন পায়খানা পরিদর্শন করিবার। নিজের দলবল লইয়া তিনি অক্লান্তভাবে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

সেবাকার্য্য করিতে করিতে অস্পৃশ্যদিগের বস্তিতে যাওয়ার প্রয়োজনও হইল। কিন্তু ইহাতে সকলেই বাঁকিয়া বসিলেন। যাহাদের ঘরে পা দিলেই দেহ অপবিত্র হয়, তাহাদের পায়খানা পরীক্ষা করা সকলকার নিকটেই অসম্ভব বলিয়া মনে হইল। স্বেচ্ছাসেবকেরা গান্ধীজীর সঙ্গী হইতে চাহিলেন না।

গান্ধীজী একাই রওয়ানা হইলেন। বলিলেন, সেবাবৃত্তির মধ্যে অস্পৃশ্যতার স্থান নাই। গান্ধীজীর আদর্শে একজনের মধ্যে পরিবর্ত্তন দেখা গেল। তিনি গান্ধীজীর সঙ্গী হইলেন। এই একজন মাত্র সঙ্গী লইয়াই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া আসিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকাব ভারতীয়দিগের সম্বন্ধে ভারতবর্ষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সভাসমিতির আযোজনও গান্ধীজীকে করিতে হইল। সার ফিরোজ শা'র পরিচালনায একটি সভা আহূতও হইল। গান্ধীজী বক্তৃতা করিলেন। সভায় যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই বুঝিযা গেলেন যে প্রভুত্ববিলাসী শ্বেতকায ব্যবসায়ীদিগের হাতে কতকগুলি নিরপরাধ ভারতবাসী আফ্রিকায় কি অবর্ণনীয় লাঞ্ছনাই না সহ্য করে!

মাদ্রাজেও গান্ধীজী বক্তৃতা দিলেন। বালাসুন্দরমের মত শত শত নির্য্যাতিত মজুরের হীন অবস্থার কথা শুনিযা মাদ্রাজ-বাসীরাও ভারতীয়দিগের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিল।

এইরূপে গান্ধীজীর পক্ষে আন্দোলনের পথ ক্রমশঃ সহজ হইয়া উঠিতেছিল। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ আফ্রিকা হইতে টেলিগ্রাম আসিল—গান্ধীজীকে অবিলম্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিয়া যাইতে হইবে!

গান্ধীজী আর কালবিলম্ব না করিযা আফ্রিকা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। পথে নাতাল বন্দরে পৌছিবার তিন চারদিন পূর্ব্বে ভীষণ ঝড় হইল, সমুদ্রে তুফান উঠিল। সেবার দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌছিযাই তাঁহাকে যে ঝড়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, ইহা যেন তাহাবই পূর্ব্বাভায!

চব্বিশ

আফ্রিকায়

গান্ধীজী ভারতবর্ষে আসিযা দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে যে প্রচারকার্য্য করিযা-ছিলেন তাঁহার বিকৃত ও অতিরঞ্জিত বিবরণ আফ্রিকায পৌছিয়াছিল। তাহারা শুনিয়াছিল যে তিনি নাকি নাতালবাসী শ্বেতাঙ্গদিগের তীব্র নিন্দা ভারতে করিয়াছেন এবং ভারতবাসীর দ্বারা বোম্বাই জাহাজ লইয়া আসিতেছেন নাতালকে ভারতবাসী দ্বারা ভর্ত্তি করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে। ইহার ফলে আফ্রিকাস্থ শ্বেতাঙ্গগণ গান্ধীজীর উপর বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়াই ছিল। সুতরাং জাহাজ হইতে নামার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রুদ্ধ শ্বেতাঙ্গের দল তাঁহাকে আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে গান্ধীজী নির্ম্মমভাবে প্রহৃত হইলেন···তাঁহার উপর ইটপাটকেল বর্ষিত হইল। তিনি কোন রকমে একটি বাড়ির রেলিং ধরিয়া নিজেকে খাড়া রাখিলেন। নিষ্ঠুর শ্বেতাঙ্গদল তথাপি নিবৃত্ত হইল না। সৌভাগ্যক্রমে গান্ধীজী নাতালের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের স্ত্রীর সহায়তায় এবং পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহায়তায রক্ষা পাইলেন।

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী তখন চেম্বারলেন। গান্ধীজীর প্রতি ইংরাজদের অত্যাচারের সংবাদ তাঁহার নিকট পৌছিলে তিনি তৎক্ষণাৎ ন্যায-বিচারের ব্যবস্থা করিবার আদেশ দিযা তার করিলেন। তিনি হুকুম দিলেন গান্ধীজী যদি ইচ্ছা করেন তবে অপরাধীদিগের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারেন। আফ্রিকাস্থ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিবেন।

গান্ধীজী আক্রমণকারীদিগের কযেকজনকে চিনিতেন। ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাদিগকে আইনের সাহায্যে শাস্তি দেওয়াইতেও পারিতেন। কিন্তু তিনি অহিংস নীতির দ্বারা নিজেকে নিযন্ত্রিত করিলেন। অহিংসনীতির আশ্রয় লইয়া তিনি আক্রমণকারীদিগকে মাফ করিলেন, কাহারও নামে নালিশ তিনি করিলেন না।

আক্রমণকারীকেও মাফ করিবার ও তাহাদের অন্যায়ের প্রতিশোধ না লইবার সাহস ও বুদ্ধি ঈশ্বর গান্ধীজীর মধ্যে তাঁহার যৌবনকালেই দান করিয়াছিলেন। তাহারই প্রকাশ দেখা গেল নাতালে এবারকার এই ঘটনায়।

আক্রমণকারী বা অত্যাচারী উৎপীড়কের উপর কোনদিন তিনি রোষ পোষণ করেন নাই বরং তাহাদের অজ্ঞতায়, তাহাদের সঙ্কীর্ণতায় তিনি দুঃখবোধই করিয়াছেন। এবারও তাহাই করিলেন।

হাঙ্গামাকারীদিগের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে অস্বীকার করার ফল ভালই হইল। ইহাতে শ্বেতাঙ্গগণই তাহাদের ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হইয়া উঠিল। সংবাদপত্রসমূহও গান্ধীজীকে নির্দ্দোষ বলিয়া সমর্থন করিয়াছিল এবং হাঙ্গামাকারীদিগের নিন্দা করিয়াছিল।

পরিণামে ইহার দ্বারা গান্ধীজী লাভবানই হইলেন। ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রভাব প্রতিষ্ঠা ইহাতে বাড়িল এবং গান্ধীজীর কাজ সহজ হইল।

কিন্তু শ্বেতাঙ্গদল ভারতীয়দের এই প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া এবং দৃঢ়তার সহিত তাহাদের সংগ্রাম করিবার শক্তি দেখিয়া ভীত হইল। সুতরাং ভারতীয়দিগের অধিকার খর্ব্ব করিবার জন্য নাতালের কাউন্সিলে এমন দুইটি আইন তাহারা পাশ করিল যাহাতে ভারতীয় ব্যবসায়ের ক্ষতি হইল।

এই আইন পাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী পুনরায় কংগ্রেস ও ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার কার্য্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করিলেন। দেখা গেল উল্লিখিত আইন দুইটি পাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দিগের মধ্যে একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাহারা নিজেদের অধিকার এবং অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের স্বাধীনতাবোধ, মর্য্যাদাবোধ, মনুষ্যত্ববোধ একে একে সমস্তই জাগিয়া উঠিল। এই জাগরণের মূলে ছিল গান্ধীজীর সাধনা।

পঁচিশ

সেবাব্রত

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী গান্ধীজীর অন্তরকে বিশেষভাবে স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল অস্পৃশ্য ভারতবাসী, কৃষিজীবী নিঃসহায় ভারতবাসী……ইহাদের সেবার মধ্য দিয়া গান্ধীজী তাঁহার জীবনের চরম চরিতার্থতা খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। অসহায় এই জনসমাজের উন্নতি সুখ-স্বস্তির জন্য তিনি নিত্য নিরন্তর একটা প্রবল ব্যাকুলতা অনুভব করিতেন, উহাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন।

১৮৯৬ সালে রাজকোটের অস্পৃশ্যদিগের সেবায় তিনি অগ্রসর হইয়া পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। তারপর আফ্রিকায় গিয়াও সেবা করার প্রবৃত্তি তাঁহার অন্তরে প্রবল হইয়াই ছিল।

সেবার সুযোগও তিনি লাভ করিয়াছিলেন। একদিন এক কুষ্ঠরোগ-পীড়িত ব্যক্তি গান্ধীজীর গৃহে আসিল। তাহাকে শুধুমাত্র আহার্য্য দিয়া বিদায় করিতে গান্ধীজীর মন চাহিল না। তাহাকে একটি কামরায় রাখিয়া তিনি তাহার ঘা সাফ করিয়া সেবা করিলেন। তারপর তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন।

কিন্তু সেবাবৃত্তির যে দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনোমধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল তাহা সহজে মিলাইল না। আর্ত্ত ও পীড়িতের শুশ্রূষা নিয়মিতভাবে করিবার প্রেরণা তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত ডাক্তার বুথ নামে জনৈক চিকিৎসকের এক হাসপাতালে শুশ্রূষাকারীরূপে তিনি কাজ করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি রোগীদিগকে ঔষধ দিতেন। এইভাবে সেবাকার্য্যের মধ্য দিয়া ভারতীয়দিগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা নিবিড়তর হইতে থাকে এবং সেবার আনন্দে অন্তরে নির্ম্মল একটা শান্তি অনুভব করিতে থাকেন।

গান্ধীজীর এই সেবাব্রত বেথলহেমের মহামানবটির কথা মনে করাইয়া দেয়। যীশুর মতই কুষ্ঠরোগীর সংস্পর্শ না এড়াইয়া তাহার সেবা তিনি অসঙ্কোচেই করিয়াছিলেন। দুঃস্থ, পতিত, অস্পৃশ্য অসহায়ের প্রতি সেবা ও সহানুভূতিই গান্ধীজীকে মহামানব করিয়া তুলিয়াছিল।

গান্ধীজীর আফ্রিকাপ্রবাসকালেই দরিদ্রের প্রতি, অত্যাচারিত ও উৎপীড়িতদের প্রতি, রোগক্লিষ্ট জনমানবের প্রতি তাঁহার সুগভীর আন্তরিকতার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। দরিদ্রের প্রতি সহজ ও সুগভীর অনুভূতি আফ্রিকার মাটিতেই প্রথম তাঁহার মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

তাঁহার জীবনের প্রথম ও গভীরতম অনুভূতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও দারিদ্র্য-পীড়িতকে কেন্দ্র করিয়া পরিস্ফুট হইয়াছিল। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে দরিদ্রের প্রতি তাঁহার করুণা সমভাবে প্রবাহিত হইত। সেবাব্রতে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি কত তামিল গিরমিটিয়াদের শিশু ও নারী পরিবৃত হইয়া বাস করিয়াছেন। চালানী চুক্তিবদ্ধ মজুরশ্রেণীর প্রতি তাঁহার প্রীতি ছিল আন্তরিকতাপূর্ণ। আর্ত্তমানবমাত্রের প্রতিই তাঁহার করুণা ছিল অপরিসীম। দারিদ্র্যপীড়িত ও নিপীড়িতদিগের প্রতি ছিল সুগভীর অনুকম্পা এবং বাক্য অপেক্ষা কার্য্যের মধ্য দিয়াই পীড়িত, নির্য্যাতিত, অক্ষম, রুগ্ন ও অসহায়ের প্রতি তাঁহার অপার করুণা অভিব্যক্ত হইযাছিল।

১৮৯৯ সালে যখন বুয়র যুদ্ধ সুরু হয় গান্ধীজী সেই সময়ে ইংরাজ সরকারকে সাহায্য করার জন্য আহতদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য একটি সেবাদল গঠন করেন। যুদ্ধে আহতদিগের সেবা করা এই সেবাদলের কার্য্য হইল। নেতৃত্ব করিলেন গান্ধীজী।

ইতিপূর্ব্বে আফ্রিকার ইংরাজদের ধারণা ছিল যে ভারতীয়েরা কোন বিপদজনক কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারে না, স্বার্থ ছাড়া কিছুই তাহারা বুঝে না। কিন্তু বুয়র যুদ্ধের সময়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতীয়দিগের অক্লান্ত শুশ্রূষাকার্য্য লক্ষ্য করিয়া আফ্রিকাবাসী শ্বেতাঙ্গগণও ভারতীয়দিগের সেবাকার্য্যের প্রশংসা

করিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে আফ্রিকায যাঁহারা গান্ধীজীর বিরোধী ছিলেন তাঁহারাও তাঁহার সেবাপরাযণতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ভারতীয়দিগের প্রতিষ্ঠাও ইহাতে বাড়িল।

১৯০৪ সালে জোহনসবার্গে নিদারুণ প্লেগের আবির্ভাব হয। সে সময়েও গান্ধীজী অপূর্ব্ব কুশলতার সহিত সেবাকার্য্য করিযাছিলেন।

এই সকল সেবাকার্য্যেই তাঁহার আন্তরিকতা এবং নির্ভীকতার পরিচয পাওযা গিযাছিল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে এই সেবাকার্য্যে নামিয়া আফ্রিকার হিন্দু-মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান, মাদ্রাজী, গুজরাটী, সিন্ধী প্রভৃতি সকলেই ভারতবাসী বলিযা একটা দৃঢ় অনুভূতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইযাছিল। ইহার মধ্য দিযা তিনি একাধাবে জনহিতব্রতের আদর্শে এবং একতার মন্ত্রে ভারতীযদিগকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

ছাব্বিশ

সংযম ও ত্যাগশীলতা

সংযম এবং ত্যাগশীলতা গান্ধীজীর জীবনের অন্যতম গুণ ছিল। এই সংযম এবং ত্যাগশীলতার প্রতি তিনি আফ্রিকাপ্রবাসকালেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে তিনি ভোগময় জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা অধিকদিন টিকিল না। যৌবনে যে বয়সে মানুষ ভোগসুখে নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে চায়, গান্ধীজী সেই বয়সে ত্যাগ এবং সংযমের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ভোগসুখে নিমজ্জমান থাকিয়া তাঁহার তৃষিত আত্মা যেন আকুলি-বিকুলি করিতেছিল। এই ভোগই জীবনের চরম এবং পরম সত্য কি না সে প্রশ্ন তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। সত্যসন্ধানী ঋষির অন্তর শেষ পর্য্যন্ত সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেই আলোকচ্ছটায় তিনি উপলব্ধি করিলেন জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের সার্থকতা, ত্যাগের প্রযোজনীয়তা।

১৯০৬ সাল। যে মহামানব আজীবন সত্যদর্শনের জন্য উন্মুখ ছিলেন এই সময়ে জীবনের একটি পরম এবং চরম সত্য তিনি লাভ করিলেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মচর্য্যের সম্পূর্ণ পালন অর্থ যে ব্রহ্ম-দর্শন ইহা তিনি উপলব্ধি করিলেন এবং ব্রহ্মদর্শনের জন্য দেহ-মনকে শুচিশুভ্র নির্ম্মল করিয়া তুলিবার জন্য সাধনা সুরু করিলেন।

শাস্ত্র যাহা তাঁহাকে দিতে পারে নাই, ব্রহ্মচর্য্য তাঁহাকে তাহাই দিল। শাস্ত্রানুশীলন করিয়া, বিবিধ শাস্ত্র মন্থন করিয়াও ব্রহ্ম-দর্শন তিনি লাভ করেন নাই। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যে তিনি তাঁহার অভীপ্সিত জিনিস লাভ করিলেন।

তিনি অনুভব করিলেন যে, ব্রহ্মচর্য্যের মধ্য দিয়া শরীররক্ষা, বুদ্ধিরক্ষা, ও আত্মার রক্ষা সম্ভবপর। এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য গান্ধীজীর নিকট দুরূহ তপশ্চর্য্যার পরিবর্ত্তে এক রসময় বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল এবং ইহার দ্বারাই

তাঁহার জীবন নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রারম্ভকাল হইতেই তিনি উহার সৌন্দর্য্যের নিত্য নূতনত্ব দর্শন করিতে লাগিলেন।

বিশেষ সতর্কতার সহিত গান্ধীজী আজীবন তাঁহার এই ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন ও রক্ষা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য আস্বাদের ইন্দ্রিয়-রসনার উপর সংযম রাখার আবশ্যকতা তিনি প্রথমেই অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে স্বাদ যদি জয় করা যায় তবে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালন অতি সহজ হয়। তাই নিরামিষ আহারের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইলেন। ব্রহ্মচারীর খাদ্য অল্প এবং পরিমিত, সাদাসিধা, বিনা মসলায় ও স্বাভাবিক অবস্থার হওয়া প্রয়োজন একথা তিনি উপলব্ধি করিলেন। ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণের আরম্ভ হইতেই শুষ্ক ও টাটকা ফলমূলাদির উপর তিনি নির্ভর করিতেন। ব্রহ্মচর্য্যের জন্য আহারের প্রকৃতি ও পরিমাণ তিনি নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। উপবাসের আবশ্যকতাও তিনি এই সময় হইতেই অনুভব করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালনের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী সরল জীবনযাত্রাপ্রণালীও উদ্ভাবিত করিযাছিলেন। স্বাবলম্বের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া তিনি তাঁহার যৌবনকালেই স্বাবলম্বী হইয়াছিলেন।

এই ব্রহ্মচারী জীবন এবং স্বাবলম্বী ভাব তিনি আজীবন সফলতার সহিত রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

সাতাশ

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে

১৯০০ সাল। বুয়র যুদ্ধের গুরুতর অংশ ১৯০০ সালে শেষ হইযা যায়। যুদ্ধকালে গান্ধীজী নিজেকে আহতদের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যুদ্ধশেষে সেই কর্ত্তব্য হইতে মুক্ত হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিযাছিল।

দেশে ফিরিবার সঙ্কল্পের কথা তিনি আফ্রিকার ভারতীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে বলিলেন। একটি সর্ত্তে আফ্রিকাস্থ ভারতীয়গণ গান্ধীজীর দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। সর্ত্তটি এই যে, যদি এক বৎসরের মধ্যে আফ্রিকায গান্ধীজীর উপস্থিতির প্রয়োজন ঘটে তবে তিনি তথায় ফিরিবেন। গান্ধীজী বন্ধুদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ভারতে ফিরিলেন।

ভারতে ফিরিযা প্রথমে গান্ধীজীর কিছুদিন কাটিল ভ্রমণে।

১৯০১ সাল···কলিকাতায ভারতের জাতীয কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। দীনশা এডুলজী ওযাচা সেবারকার সভাপতি। গান্ধীজী এই সংবাদ পাইযা কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত হইবার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার বাসনা— ভারতীয় কংগ্রেসে আফ্রিকাস্থ ভারতীযদিগের উপরকার বিধিনিষেধ, অত্যাচার-উৎপীড়নের কথা কংগ্রেসকে জানানো, ভারতবাসীদিগকে সে বিষযে সচেতন ও সক্রিয় করা।

আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়দিগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে গান্ধীজী কলিকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত হইবার জন্য ট্রেনে চড়িয়াছেন। যে গাড়ীতে তিনি বোম্বাই হইতে রওনা হইয়াছেন, ফিরোজশা মেহ্‌তা, দীনশাজী, চিমনলাল শীতলবাদ প্রভৃতিও সেই গাড়ীতে যাইতেছিলেন। গান্ধীজী স্থির করিলেন যে পথেই দক্ষিণ আফ্রিকার কথাটা ইঁহাদিগকে বলিতে হইবে।

মাঝে একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। গান্ধীজী ইঁহাদের কামরায় কম্পিত-

বক্ষে সঙ্কুচিতভাবে গিয়া প্রবেশ করিলেন এবং আফ্রিকায় ভারতীয়দের দুর্দ্দশার কথা বিবৃত করিয়া কংগ্রেসে ভারতীয়দিগের উপর শ্বেতাঙ্গদিগের অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন।

গান্ধীজীর কথা শুনিয়া ফিরোজশা বলিলেন—"গান্ধী! তোমার কাজ হইবে না। তোমার প্রস্তাব আমরা পাশ করিয়া দিব। কিন্তু আমাদের নিজেদের দেশেই কি আমাদের সকল ন্যায্য পাওনা মিলে? আমি ত বুঝি যে, আমাদের দেশে আমাদের কর্ত্তৃত্ব যতদিন না স্থাপিত হয়, ততদিন উপনিবেশে আমাদের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে না।"

গান্ধীজী হতোদ্যম হইলেন।

যাহা হউক, কলিকাতায় পৌঁছিয়া তিনি কংগ্রেস-প্রতিনিধিদের সহিত রীপন কলেজে আশ্রয় লইলেন। সেখানে কতকগুলি জিনিস তাঁহার চক্ষে অতিশয় বিসদৃশ ঠেকিয়াছিল। তন্মধ্যে অস্পৃশ্যতা একটি। দ্রাবিড় পাকশালা একেবারে একান্তে ছিল। কংগ্রেসী সভ্যদিগের মধ্যে বর্ণবৈষম্য লক্ষ্য করিয়া তিনি ব্যথিত হইলেন। কংগ্রেসের প্রতিনিধিদিগের মধ্যে এইরূপ অস্পৃশ্যতার শুচিবায়ু দেখিয়া তিনি সেই সকল প্রতিনিধিদিগকে যাহারা পাঠাইয়াছে তাহাদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা যে কতখানি তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিলেন।

কংগ্রেস-প্রতিনিধিদিগের বাসস্থানের চতুষ্পার্শ্বস্থ অস্বাস্থ্যকর অপরিষ্কার অবস্থা দেখিয়াও গান্ধীজী মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইলেন, এবং অবস্থার প্রতিকারের জন্য অগ্রণী হইলেন।

প্রতিনিধিগণের বাসস্থানের সংলগ্ন পায়খানাগুলির অবস্থা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। সেগুলি অতিশয় অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন ছিল। স্বেচ্ছা-সেবকদিগকে গান্ধীজী তাহা দেখাইলেন। তাহারা উহা পরিষ্কার করিতে রাজি হইল না। তখন গান্ধীজী ঝাঁটা লইয়া পায়খানা সাফ করিলেন।

রাস্কিনের উপদেশ—"কোনো সেবাধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কখনও হীন হইতে পারে না"—ইহা তাঁহার মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। সেই বাণীকে গান্ধীজী তাঁহার আচরণে মূর্ত্ত করিয়া তুলিলেন। কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের কাছে তিনি সেবার সুযোগ প্রার্থনা করিলেন। সামান্য কেরাণী ও ভৃত্যের কাজ করিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন।

অতঃপর কংগ্রেস বসিল। মণ্ডপের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দৃশ্য, স্বেচ্ছাসেবকগণের পংক্তি, মঞ্চের উপর রাষ্ট্রগুরুদিগকে দেখিয়া তিনি অভিভূত হইলেন।

এই মহতী সভার একপ্রান্তে গান্ধীজী অলক্ষিত অবস্থায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সংশয়ে ও ভয়ে তাঁহার অন্তর আন্দোলিত। তাঁহার প্রস্তাবের কি হইবে, ইহাই তিনি ভাবিতেছেন। কত বক্তা কত প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছেন, প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া লইতেছেন। গান্ধীজীর সংশয়, এই তূর্য্যধ্বনির মধ্যে তাঁহার ক্ষীণ স্বর কি কেহ শুনিবে? ইতিপূর্ব্বে তিনি মহামতি গোখলের সহিত দেখা করিয়াছিলেন এবং অফ্রিকার প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারই সহায়তায় গান্ধীজীর প্রস্তাব উত্থাপিত হইল—তাহা অনুমোদিতও হইয়া গেল।

এই সময়ে তিনি গোখলে ভিন্ন, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, লোকমান্য তিলক প্রভৃতির সংস্পর্শেও আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের চরিত্র-মাহাত্ম্যে, জ্ঞানে ও দেশপ্রীতিতে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গান্ধীজীর উপর ইঁহাদের প্রভাবও বিস্তৃত হইয়াছিল।

আটাশ

পুনরায় দক্ষিণ আফ্রিকায়

আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের উপর আমলাতান্ত্রিক শাসকশ্রেণীর খামখেয়ালি-বশতঃ নিত্য নূতন বিধিনিষেধ আরোপিত হইতেছিল। ভারতীয়দিগের উপর অন্যায় জুলুম, অবিচার অত্যাচার চলিতেই ছিল। এমনি সময়ে মিঃ চেম্বারলেন আফ্রিকা গমন করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা।

তাঁহার নিকট ভারতীয়গণের অভাব-অভিযোগ ও দাবীর কথা উপস্থিত করিবার জন্য গান্ধীজী পুনরায় দক্ষিণ আফ্রিকায় আহূত হইলেন।

নাতালে মিঃ চেম্বারলেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গান্ধীজী ভারতীয়দের অবস্থা তাঁহাকে জানান। কিন্তু এই আবেদনে বিশেষ কোন ফল হইল না। গান্ধীজী হতাশ হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে আফ্রিকার কাজ আবার নূতন করিয়া তাঁহাকে সুরু করিতে হইবে। আফ্রিকায় পৌছিয়া তিনি দেখিলেন, ট্রানস্‌ভালে ভারতীয়দিগের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। বুয়র যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতীয়গণ বিনা বাধায় ট্রানস্‌ভালে প্রবেশ করিতে পারিতেন। কিন্তু গান্ধীজী এবার দেখিলেন যে সে দিন আর নাই। ট্রানস্‌ভালে প্রবেশ করিতে হইলে ভারতীয ও ইউরোপীয় সকলকার পক্ষে পাস লওয়ার বাধ্যবাধকতা স্থাপিত হইয়াছে। ইউরোপীয়গণ আবেদন করিবামাত্র পাস পাইতেন। কিন্তু ভারতীয়দের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইত। প্রিটোরিয়ার আবহাওয়াও তিনি শঙ্কাজনক দেখিলেন। 'এশিয়াটিক বিভাগ' ভারতীয়দিগের পীড়ন করার এক যন্ত্রস্বরূপ হইয়াছে ইহা তিনি লক্ষ্য করিলেন।

চেম্বারলেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতীয়দিগের হীন ঘৃণিত জীবনের অবস্থাটা তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত গান্ধীজী আফ্রিকায় ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিলেন। তাহাতে যখন বিশেষ কোন ফল হইল না এবং মিঃ চেম্বারলেনও ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন গান্ধীজী মহা-সঙ্কটে পড়িলেন।

একদিকে ভারতভূমির প্রতি তিনি একটা আকর্ষণ·· ভারতবর্ষকে সেবা করিবার একটা আকর্ষণ তিনি অনুভব করিতেছিলেন। ভারতের বিবিধ সমস্যা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই সকল সমস্যার অপনোদন করিয়া ভারতের বৃহত্তর ক্ষেত্রে সেবা করিবার একটা উদগ্র বাসনা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। অন্যদিকে আফ্রিকাতেও তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল এবং সে কর্ত্তব্যকেও তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

তিনি ভাবিলেন যে আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের সম্মুখে যে আসন্ন বিপদ রহিযাছে তাহা যদি তিনি অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিযা যাইবে। এই কর্ত্তব্য-পালনের প্রতি তাঁহার অন্তর বেশী করিয়া ঝুঁকিল। এই কর্ত্তব্য-পালনের জন্য যদি তাঁহাকে আজীবন আফ্রিকায় থাকিতে হয তথাপি যে পর্য্যন্ত সেই আসন্ন মেঘ দূরীভূত না হইতেছে ততদিন, অথবা সেই মেঘ এবং ঝড়ের মুখে শত চেষ্টা সত্ত্বেও যতদিন না তাঁহারা উড়িয়া যান ততদিন, তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিয়া যাওযা স্থির করিলেন।

আফ্রিকায ভারতীয নেতাদিগকে তিনি তাঁহার এই সঙ্কল্প জানাইলেন। আফ্রিকায় ভারতবাসীদিগের সেবা-করার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া তিনি ট্রানস্‌ভালে ব্যারিষ্টারি করার দরখাস্ত করিলেন। তাঁহার আশঙ্কা ছিল যে হযত তাঁহার দবখাস্ত অগ্রাহ্য করা হইবে। কিন্তু তাঁহার আশঙ্কা অমূলক ছিল। তিনি সুপ্রীম কোর্টের এটর্নী হইয়া জোহানসবার্গে অফিস খুলিলেন। ট্রানসভালের মধ্যে জোহানসবার্গে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভারতীযের বাস, সেইজন্য সেইখানেই তিনি তাঁহার জনসেবা ও জীবিকা অর্জ্জনের সুবিধা বলিযা অফিস খুলিলেন ১৯০৩ সালে।

অতঃপর দুই বৎসর কেবল 'এসিয়াটিক বিভাগে'র আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেই তাঁহার কাটিয়া গেল। 'এশিয়াটিক বিভাগ' ভারতবাসীদিগকে নির্ব্বাসন ও নির্য্যাতনের নূতন নূতন উপায উদ্ভাবন করিতেছিলেন। উহা দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদিগের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিতে, অথবা তাহাদিগকে

বহিষ্কৃত করিতে সক্রিয় হইযা উঠিযাছিল। গান্ধীজী ইহার প্রতিকারের জন্য দৃঢ়সংকল্প হইলেন।

আফ্রিকার ভারতীয় বিরোধী আইনগুলি বর্ণবিদ্বেষমূলক ছিল। ভারতীযেরা ভোট দিতে পারিবে না, তাহাদের জন্য যে 'লোকেশন' বা বস্তিপাড়া নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহার বাহিরে জমি কিনিতে পারিবে না—এমনি একটা আইন ছিল। 'এশিয়াটিক বিভাগ' অক্ষরে অক্ষরে এই সব আইন এই সময়ে প্রয়োগ করিতেছিলেন।

বুয়র যুদ্ধের সময়ে গান্ধীজীর নির্দ্দেশে আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদিগের বিরুদ্ধে ভারতীয়দিগের সংগ্রাম বন্ধ হইয়াছিল। তখন ভারতীযেরা যুদ্ধের সেবাকার্য্যে আত্মনিযোগ করিয়া এবং অনুকূলতা করিয়া প্রশংসাভাজনও হইযাছিলেন। কিন্তু যুদ্ধশেষে ভারতীয়দিগের অভিযোগ হ্রাস প্রাপ্ত না হইযা বরং বৃদ্ধি পাইতেছিল। যুদ্ধে সহাযতার কোন পুরস্কারই ভারতীযেরা পায নাই।

উপরন্তু এই সময়ে 'এশিয়াটিক বিভাগ' স্পষ্ট করিযাই বলিতে লাগিলেন যে ইতিপূর্ব্বে ট্রানস্‌ভাল সরকার যে এশিয়াটিক বিরোধী আইনসমূহ প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা যথেষ্ট কড়া নহে এবং সুশৃঙ্খলিতও নহে। আফ্রিকাপ্রবাসী এশিযাবাসীদিগকে শৃঙ্খলিত করিবার, তাহাদের অধিকার খর্ব্ব করিবার একটা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র এই সময়ে চলিতেছিল, গান্ধীজী তাহা বুঝিযাছিলেন।

ভারতীয়, তথা এশিযাবাসীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবার মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক। যদি ভারতীযেরা যখন ইচ্ছা ট্রানস্‌ভালে প্রবেশ করিতে পারে এবং যেখানে খুশী ব্যবসা করিতে পারে, তবে ইংরাজ ব্যবসায়ীদিগের সমূহ ক্ষতি হইবে—ইংরাজেরা ইহা বেশ বুঝিতেছিলেন। 'এশিয়াটিক বিভাগে'র নিকট এই যুক্তি এবং অন্যান্য এই প্রকারের নানা যুক্তি উপস্থাপিত করিযা ইংরাজগণ আফ্রিকায় নিজেদের অধিকারটা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। 'এসিয়াটিক বিভাগ' এই স্বার্থান্বেষী ইংরাজগণের আনুকূল্য করিয়া আসিতেছিলেন।

গান্ধীজী এ বিষয়ে সতর্ক হইলেন। তিনি নিষ্ক্রিয রহিলেন না।

ঊনত্রিশ

সত্যাগ্রহ ও তাহার পরিণতি

১৯০৬ সালে ট্রানস্‌ভাল সরকারের এক অতিরিক্ত ও জরুরী সংখ্যা বুলেটিন প্রকাশিত হইল। এই সংখ্যায় ছিল 'এসিয়াটিক অ্যামেণ্ডমেণ্ট্‌ অর্ডিন্যান্সের' খসড়া। এই আইনে ভারতীয়দিগের অধিকার সম্পূর্ণরূপে খর্ব্ব করিবার প্রস্তাব ছিল। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল—ভবিষ্যতে শুধু ভারতীয় নহে, এসিযাবাসী-মাত্রকেই দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ করিতে দেওযা হইবে না এবং ইতিমধ্যে যাহারা ট্রানস্‌ভালে বসবাস করিতেছিল তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করা না হইলে, তাহাদিগকে দাগী আসামীর মত লাঞ্ছিত জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে।

ভারতীয় তথা এশিযাবাসীদিগের অধিকার মনুষ্যত্ব ও মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ কবিবার এই ষড়যন্ত্র যখন ট্রানস্‌ভালে চলিতেছিল তখন নাতালে জুলু বিদ্রোহ উপস্থিত হয। নাতালের সহিত গান্ধীজীর স্মৃতি বিজড়িত ছিল। সুতরাং ট্রানস্‌ভালের 'এশিযাটিক অ্যামেণ্ডমেণ্ট্‌ অর্ডিন্যান্সের' বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিয়া তিনি নাতালের জুলু বিদ্রোহে সেবা করার জন্য ছুটিলেন।

গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ছিল এই বিদ্রোহে আহতদিগের শুশ্রূষার জন্য একটি সেবাদল গঠন করা। ২০।২৫ জন ব্যক্তি লইযা একটা ছোট সেবাদল তিনি গঠনও করিলেন। এই দলটি ছোট হইলেও ইহার ভিতরে সকল প্রদেশেরই ভারতবাসী ছিল। একমাস এই দলটি নিজদিগকে সেবাকার্য্যে নিয়োজিত রাখিয়াছিল। এই সেবাকার্য্যে রত থাকার সমযে গান্ধীজী তাঁহার অন্তরে অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। সেবার মধ্যে জীবনের চরিতার্থতা উপলব্ধি করিযাছিলেন।

সেবাকার্য্য করিতে করিতে কয়েকটা কথা গান্ধীজীর অন্তরে বিশেষভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল। প্রথমতঃ সেবাধর্ম্মীকে ব্রহ্মচারী হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিলে দারিদ্র্যকেও চিরকালের জন্য বরণ করিয়া

লইতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্য এবং দারিদ্র্য সেবাকারীকে সার্থকতায় মণ্ডিত করে ইহা তিনি উপলব্ধি করেন এই জুলু বিদ্রোহের সময়। ব্রহ্মচর্য্য ও দারিদ্র্য-ব্রতাবলম্বী সেবায় কোনরূপ সঙ্কোচ অনুভব করে না।

গান্ধীজীর জীবনে একটা জিনিস বারংবারই দেখা গিয়াছে যে উৎপীড়কদের প্রতি তিনি কোন বিদ্বেষভাব কখনও পোষণ করেন নাই। উৎপীড়নের ও লাঞ্ছনার প্রতিকারের জন্য তিনি জীবন পণ করিয়া সংগ্রাম করিয়াছেন। কিন্তু উৎপীড়কগণের বিপদের সুযোগ লইয়া স্বার্থপরের মত আরব্ধ কোন সংগ্রামকে কখনও তিনি সফল করিয়া তুলিতে চাহেন নাই। যে সংগ্রামকে তিনি সত্য ও ন্যায় বলিয়া মনে করিয়াছেন, সাহসের সহিত তাহা সর্ব্বদাই পরিচালনা করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের উৎপীড়নের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন।

এমন কি দেখা যায় যে, উৎপীড়কদের বিপদে তিনি তাঁহাদিগকে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইযাছেন। প্রতিবারেই যখন দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্র বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে, তখনই গান্ধীজী তাঁহার অসহযোগ আন্দোলন সাময়িকভাবে বন্ধ করিয়াছেন এবং স্বেচ্ছায় সরকারকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বুয়র যুদ্ধের সময়ে তিনি ভারতীয় রেড্‌ক্রশ বাহিনী গঠন করেন। ১৯০৪ সালে যখন জোহানসবার্গে বিরাট প্লেগের তাণ্ডব সুরু হয় তখনও গান্ধীজী একটি হাসপাতাল গঠন করেন। ১৯০৬ সালে জুলু বিদ্রোহের সময়েও তিনি 'এসিয়াটিক অ্যামেণ্ড্‌মেণ্ট্‌ অর্ডিন্যান্সে'র বিরুদ্ধে আন্দোলন সাময়িকভাবে বন্ধ করিয়া সেবাকার্য্যে আগাইয়া যান। এজন্য নাতালের গভর্ণর প্রকাশ্য সভায় তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

গান্ধীজী যখন জুলু বিদ্রোহে নাতালে সেবাকার্য্য করিতেছিলেন সেই সময়েই ট্রানস্‌ভালে ফিরিয়া আসার জন্য বারংবার তাঁহার কাছে আহ্বান আসিতেছিল। বিদ্রোহ থামিল···গান্ধীজী অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের যে পরিকল্পনা করিতেছিলেন তাহাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার জন্য ট্রানস্‌ভালে ফিরিলেন।

ট্রানস্‌ভালে ফিরিয়া ভারতীয়দিগের অধিকার খর্ব্ব করিবার জন্য যে বিল রচিত হইয়াছিল তাহা তিনি ভাল করিয়া দেখিলেন। এই বিলের মধ্যে ভারতীয়দিগের প্রতি ব্যবহারের যে চিত্র গান্ধীজী প্রত্যক্ষ করিলেন তাহাতে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। বিলের মধ্যে ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষ ভিন্ন আর কিছুই তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি একথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলেন যে, যদি এই বিল পাস হইয়া যায়, আর ভারতীয়েরা যদি উহা মানিয়া লয়, তাহা হইলে ভারতীয়েরা আফ্রিকা হইতে চিরকালের জন্য বিতাড়িত হইবে। এই বিলের সহিত ভারতীয়দিগের মরা-বাঁচার প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে, গান্ধীজী তাহা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিলেন।

গান্ধীজী আর নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারিলেন না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁহার অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তিনি স্থির করিলেন যে প্রথমে আবেদন-নিবেদনের দ্বারা বিলটি প্রত্যাহার করাইবার জন্য চেষ্টা করিবেন। তাহাতে যদি ব্যর্থ হন তবে নিশ্চেষ্ট হইযা বসিযা থাকিবেন না। এবার প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবেন।

আফ্রিকায ভারতীয়দিগের উপর অন্যায় অত্যাচার-উৎপীড়নের জন্য বহুদিন হইতেই তিনি বেদনাবোধ করিতেছিলেন। তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টায় আফ্রিকার ভারতবাসীগণ সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। এইবার এই প্রবুদ্ধ ভারতীযদিগকে লইযা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার বাসনা তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল।

'এসিয়াটিক আইনে' ভারতীয়দের লাঞ্ছনা অপমান ও দাসত্বকে কাযেমী করিবার উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট। সেইজন্য হয জয়লাভ নয় মৃত্যু—এই পণ গ্রহণ করিয়া তিনি এই 'ঘাতকী আইনে'র বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামিলেন। এই আইন ঘাতকের মত নিষ্ঠুরতার সহিত ভারতীয়দিগের সকল স্বার্থ সম্মান ধূলিসাৎ করিতে চাহিযাছিল বলিয়া গান্ধীজী ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন 'ঘাতকী আইন'।

গান্ধীজী প্রথমে আফ্রিকার নেতৃস্থানীয় ভারতীয়দিগকে আহ্বান করিয়া এই অপমানকর আইনের তাৎপর্য্য সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। গান্ধীজীর মুখে আইনের বিশ্লেষণ শুনিয়া গান্ধীজীর মতই অন্যান্য ভারতীয়গণ অপমানে ও ক্ষোভে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সকলেই বুঝিলেন যে ভারতীয়দিগের অস্তিত্ব আফ্রিকা হইতে লোপ করাই এই আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য। একথাটাও তাঁহারা বুঝিলেন যে, এই আইনটাই শেষ আইন নয়, ভারতীয়-দিগকে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে দূর করিয়া দেওয়ার এই প্রথম ব্যবস্থা। প্রস্তাবিত এই আইনে শুধু আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দিগের অপমান ছিল না, এই আইনে সমস্ত ভারতবাসীর অপমান স্পষ্ট হইয়াই ছিল—একথা আফ্রিকার ভারতীয়েরা উপলব্ধি করিলেন। উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা ঐ অপমানের প্রতিকারের জন্য অধীর হইয়া উঠিযাছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী উত্তেজিত জনতাকে অধীর হইতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন, অধীর হইলে, ক্রুদ্ধ হইয়া দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সংগ্রাম সুরু করিলে, সে সংগ্রামে আমাদের পরাজয় এবং অপমান কায়েমীই হইবে। "কিন্তু যদি শান্তভাবে প্রতিকার অনুসন্ধান করিয়া সময় মত প্রতিরোধ করি, সকলে একত্র হইয়া এই অপমানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে গিয়া যে-সকল দুঃখ হয় তাহা সহ্য করি, তবে আমি মনে করি ঈশ্বর আমাদিগকে সাহায্য করিবেন।"

ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল চিরদিনই ঈশ্বরের নির্দ্দেশ তাঁহার অন্তরে অনুভব করিয়াছেন। অনুভব করিয়া সেই নির্দ্দেশ অনুযায়ী নিজেকে চালিত করিয়াছেন। আফ্রিকায়ও অন্যায় অধর্ম্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বরের নির্দ্দেশ তিনি অন্তর-মধ্যে অনুভব করিলেন।

১১ই সেপ্টেম্বর জোহানসবার্গে তিন হাজার ভারতীয়ের এক বিরাট সভা হইল। দেখা গেল সূর্য্যের করস্পর্শে নূতন উৎসাহ, উদ্দীপনা ও চেতনায় সমস্ত জগৎ যেমন জাগিয়া উঠে, আফ্রিকার ভারতীয়েরাও সেইরূপ নূতন প্রাণ পাইয়া

জাগিয়া উঠিয়াছে। গান্ধীজীর অশ্রান্ত চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে, তাঁহার চেষ্টায় ভারতীয়দিগের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগিয়াছে।

এই সভায় ভগবান্‌কে সাক্ষী করিয়া সমবেত সকলেই এই আইনের বিরোধিতা করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিল। গান্ধীজী অহিংস নীতির এবং সত্যাগ্রহ নীতির ব্যাখ্যা করিলেন। সংগ্রামে দুঃখ-কষ্ট লাঞ্ছনার একটা চিত্র সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করিলেন। তিনি বলিলেন,—"আমাদিগকে জেলে যাইতে হইবে। জেলে গিয়া অপমান সহ্য করিতে হইতে পারে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-গ্রীষ্ম সহ্য করিতে হইতে পারে। উদ্ধত জেল-দারোগাদের নিকট মার খাইতে হইতে পারে। অর্থদণ্ড হইয়া মালপত্র ক্রোক হইয়া যাইতে পারে,…নির্ব্বাসন হইতে পারে। ক্ষুধায়, জেলের কষ্টে কেহ পীড়িত হইয়া পড়িতে পারে, কেহ মারাও যাইতে পারে। এমনি সংক্ষেপতঃ যত দুঃখ আপনারা কল্পনা করিতে পারেন, সে সমস্তই আমাদের সহিতে হইতে পারে। তাহাতে অসম্ভব কিছুই নাই।"

এইভাবে গান্ধীজী এই সভাতেই সর্ব্বপ্রথম সত্যাগ্রহ নীতির ব্যাখ্যা এবং সত্যাগ্রহীদিগের নির্য্যাতন প্রভৃতির চিত্র উপস্থিত করিলেন। তখনও অবশ্য 'সত্যাগ্রহ' এই নামটির উদ্ভব হয় নাই। অন্যায় এবং অসত্যের বিরুদ্ধ-নীতির একটা যথোপযুক্ত নামকরণ করিবার জন্য গান্ধীজী তাঁহার কাগজ 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে' একটি পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। পুরস্কার-প্রতিযোগিগণ এই এই নীতির বিভিন্ন নামকরণ করিলেন। প্রাপ্ত নামগুলির মধ্যে 'সদাগ্রহ' নামটি প্রথমে গান্ধীজী মনোনীত করেন। এই সদাগ্রহকেই গান্ধীজী পরে 'সত্যাগ্রহ' নামে পরিবর্ত্তিত করেন।

এই সময়েই গান্ধীজী অহিংসনীতিমূলক সংগ্রামের অপরিসীম শক্তির সহিত পরিচয় লাভ করেন। সত্যাগ্রহে বিরুদ্ধ পক্ষকে দুঃখ দেওয়ার চিন্তামাত্র করারও স্থান নাই এবং ইহাতে নিজে দুঃখ সহ্য করিয়া, দুঃখ বহন করিয়া বিরোধীকে বশীভূত করিবার শক্তির প্রয়োজন। এই সত্যদর্শন উক্ত সময়েই

গান্ধীজীর ঘটিয়াছিল। এই উপলব্ধির মূলে ছিল টলষ্টয় পরিকল্পিত প্যাসিভ্ রেজিস্ট্যান্স্ নীতির প্রভাব।

'ঘাতকী আইনে'র বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইল। প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতা হইয়া গান্ধীজী বিলাতে গেলেন। উপনিবেশের সেক্রেটারীর সহিত অনেক কথাবার্ত্তা তাঁহার হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ভারতীয়-দিগের অসম্মানজনক অবস্থার কোন প্রতিকার হইল না।

গান্ধীজী আফ্রিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আইন পাশ হইয়া গেল। ঘোষিত হইল—আইন অনুসারে ট্রানস্ভালে বাস করিবার জন্য সকল ভারত-বাসীকে নূতন করিয়া সরকারী খাতায় নাম লিখাইতে হইবে। গান্ধীজী তখন ভারতীয়গণের নেতা। তাঁহার সংস্পর্শে ও আদর্শে ভারতীয়দিগের মর্য্যাদাবোধ তখন জাগিয়াছে। কাজেই কেহই নাম লিখাইল না।

এই প্রথম সত্যাগ্রহের সুরু হইল। গান্ধীজী এবং আরও দু'শ জন কারাগারে গেলেন। তখন ট্রানস্ভালের শাসনকর্ত্তা জেনারেল স্মাট্স্। তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে এই আপোষ করিলেন যে, লোকে স্বেচ্ছায় নাম রেজিষ্ট্রী করিলে তিনি ঐ আইন রদ করিয়া দিবেন। গান্ধীজী ইহাতে সম্মত হন। কিন্তু স্মাট্স্ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন না। ভারতীয়েরা নাম রেজিষ্ট্রী করিল। কিন্তু আইন রদ হইল না। তখন পুনরায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইল। ভারতীয়দিগের মর্য্যাদারক্ষার জন্য এবং জনসেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া এই সময়েই গান্ধীজী তাঁহার আইন ব্যবসায় ত্যাগ করেন।

স্মাট্সের প্রতিজ্ঞাভঙ্গের প্রতিবাদে এবং ভারতীয়দিগের স্বাধীন সত্তাকে আফ্রিকায় অক্ষুণ্ণ রাখিবার সঙ্কল্পে গান্ধীজী যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তিনি পর পর তিনবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তাঁহার সশ্রম কারাদণ্ড হইল। তাঁহার হাত-পা বাঁধিয়া একবার তাঁহাকে পিঁজরায় পুরিয়া রাখা হইল।

কিন্তু গান্ধীজী সকল প্রকার লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিলেন। কোনমতেই

তাঁহার বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন ঘটিল না। প্রতিবারকার লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগের পর তাঁহার অসত্যের সহিত, অন্যায়ের সহিত, সংগ্রাম করিবার শক্তি প্রবলতর হইতে লাগিল।

গান্ধীজীর প্রথম সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয় ১৯০৬ সালে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। তাঁহার দ্বিতীয় সত্যাগ্রহ সুরু হয় ১৯০৮ সালে জেঃ স্মাট্‌সের প্রতিজ্ঞাভঙ্গের বিরুদ্ধে।

১৯০৮ সালের ১৬ই আগষ্ট···যে আগষ্ট মাসে ভারতীয় স্বাধীনতালাভের অবিস্মরণীয় সংগ্রামের সূচনা হইয়াছিল···বৎসরের সেই মাসটিতেই গান্ধীজীর দ্বিতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল আফ্রিকার মাটিতে। ত্যাগ, লাঞ্ছনা, অন্যায়, অত্যাচার, উৎপীড়ন সহিয়া ভারতের আগষ্ট বিপ্লবীরা যেমন অসামান্য শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিযাছিল, আফ্রিকার সত্যাগ্রহীরাও এই ১৯০৮ সালের আগষ্ট মাসের সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে অসীম শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল।

সেদিন জোহানসবার্গের এক সভায় দু'হাজার ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের বহ্ ্যৎসব করা হইল। ইহার প্রতিক্রিয়া ভীষণভাবে দেখা দিল। জরিমানা, বেত্রদণ্ড, কারাদণ্ড, গুলিবর্ষণ এবং আরও নানা প্রকার অত্যাচার ও সংগ্রাম চলিল দীর্ঘ আট বৎসর। শেষ পর্য্যন্ত গান্ধীজীর এই দ্বিতীয় সত্যাগ্রহ জয়ী হইয়াছিল। যে 'ঘাতকী আইনে'র বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম সুরু করিয়াছিলেন তাহা রদ হইয়াছিল।

গান্ধীজীর এই সত্যাগ্রহ সংগ্রামের জয়গান করিয়া মহামনীষী রোঁমা রোলাঁ বলিয়াছেন—"অদম্য স্থৈর্য্য ও মহা-আত্মার যাদু কাজ করিল। প্রশান্ত শক্তির সম্মুখে নত হইল হিংস্র বল। ভারতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা বনেদি শত্রু জেনারেল স্মাট্‌স্···যিনি ১৯০৯ সালে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে আইনী-কিতাব হইতে তিনি এই ভারত-বিরোধী আইনকে কোনমতেই সরাইবেন না, পাঁচ বৎসর বাদে * এই আইনের অপসারণে প্রীত হইলেন।"

---

* ১৯১৪ সালে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের একটি বিলে যেসকল ভারতীয় স্বাধীন শ্রমিক হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিতে চাহিবেন তাঁহাদিগকে মর্য্যাদার সহিতই আফ্রিকায় থাকিবার অনুমতি দেওয়া হইল। এইরূপে গান্ধীজীর নির্ব্বিরোধ সত্যাগ্রহ সংগ্রাম সার্থকতামণ্ডিত হইয়াছিল।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যেমন অসাধারণ ত্যাগ হইতে তাহার সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল, আফ্রিকার সংগ্রামেও তদ্রূপ ত্যাগ, নিষ্ঠা ও সহিষ্ণুতাই সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এজন্য হাজার হাজার আফ্রিকাস্থিত ভারতীয় কারাবরণ করিয়াছেন, গান্ধীজীও কারাবরণ করিয়াছেন। কারাগারে অসংখ্য ভারতীয়ের জন্য যখন স্থান সঙ্কুলান হইল না, তখন তাঁহাদিগকে খনিতে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু এই সংগ্রামে সমস্ত পৃথিবীর মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। ভারতে ইহার প্রতি সহানুভূতি জাগিয়াছিল। ভারতের বড়লাট জনমতের চাপে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ফলে ভারতীয়দের স্বাধীন সত্তা, তাহাদের মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

ইতিমধ্যে ১৯১৩ সালে গান্ধীজীর আর একটি—অর্থাৎ তৃতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। এই আন্দোলন ট্রান্সভালের 'ঘাতকী আইন' সম্পর্কিত নহে। ইহা নাতালের একটি ঘটনা সম্পর্কিত।

উত্তর নাতালের খনি অঞ্চলে ৩ পাউণ্ডের এক 'জিজিয়া' করের বিরুদ্ধে ছয় হাজার ভারতীয় শ্রমিকের এক প্রবল ধর্ম্মঘট চলিতেছিল। সেই সমস্ত ধর্ম্মঘটীরা গান্ধীজীর সাহায্য ভিক্ষা করিয়া জন্য নাতালের নিউকাসল শহরে জমায়েৎ হয়।

গান্ধীজী চিরদিনই অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন। ধর্ম্মঘটীদের পক্ষে ন্যায় ও সত্য আছে জানিয়া তিনি উহাদের আহ্বানে সাড়া দিলেন। উহাদের নেতৃত্ব করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া এক মহা সমস্যার সম্মুখীন তিনি হইলেন। এতগুলি ধর্ম্মঘটীকে তিনি আশ্রয় কোথায় দিবেন? উহাদিগকে কি

খাওয়াইবেন! ট্রানস্ভালের 'ঘাতকী আইনে'র বিরুদ্ধে তিনি যে সংগ্রাম সুরু করিয়াছিলেন, সে সংগ্রামের সত্যাগ্রহীগণ টলষ্টয়ের আদর্শে পরিকল্পিত ফিনিক্স আশ্রমে বাস করিতেন, সেখানে থাকিয়া সত্যাগ্রহ অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইতেন। কিন্তু নাতালের সত্যাগ্রহীদিগকে তিনি কোথায় আশ্রয় দিবেন...... কোথায় তাহাদিগকে রাখিয়া সত্যাগ্রহের মন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন!

শেষ পর্য্যন্ত তিনি স্থির করিলেন যে নাতালের শ্রমিকদিগকে তিনি হাঁটাইয়া ট্রানস্ভালে লইয়া যাইবেন। সেখানে তাহারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেও অনাহার হইতে বাঁচিবে, আশ্রয়লাভ করিবে।

২০৩৭ জন পুরুষ, ১২৭ জন স্ত্রীলোক এবং ৭৫টি শিশুর এক বাহিনী গান্ধীজীর নেতৃত্বে নাতাল সরকারকে জানাইয়া নাতাল হইতে ট্রানস্ভালের দিকে যাত্রা করিল।

দীর্ঘ পথে সত্যাগ্রহীরা কত না কষ্ট সহ্য করিল। মাঝে মাঝে তাহাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত, অধৈর্য্য হইয়া তাহারা শৃঙ্খলা ও আইন ভঙ্গ করার জন্য উৎসুক হইত। কিন্তু তাহারা তাহাদের নেতার অবিচল মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইত, তাহাদের বিশ্বাস ফিরিয়া আসিত।

এই নারী পুরুষ ও শিশুর সত্যাগ্রহী-বাহিনী[১] ট্রানস্ভাল সীমান্ত পার পার হইল। এতক্ষণ পুলিশ ইহাদিগকে বাধা দেয় নাই। কিন্তু এইবার গান্ধীজী গ্রেপ্তার হইলেন। আবার জামিনে মুক্তিও পাইলেন। তিনি এই সময়ে চার দিনে তিনবার গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। গান্ধীজী যখন কারাগারের অন্তরালে প্রেরিত হইতেন তখন ভারত হইতে গোখলে কর্ত্তৃক প্রেরিত পোলক এই সত্যাগ্রহী বাহিনীর নেতৃত্ব করিতেন। অবশেষে অবশ্য গান্ধীজীর সঙ্গে সঙ্গে পোলক এবং টলষ্টয় ফার্ম্মের কলেনবেকও গ্রেপ্তার হন। নেতাহীন সত্যাগ্রহ-বাহিনী ইহাতেও নিরুৎসাহ হয় নাই। নেতাবিহীন অবস্থায়ই তাহারা সংগ্রাম করিতে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হয়। তিন পাউণ্ডের 'জিজিয়া' কর উঠিয়া যায়। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

দীর্ঘ কুড়ি বৎসরকাল ধরিয়া গান্ধীজী আফ্রিকায় তাঁহার সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিতও হইয়াছিল। ইহার সাফল্যের পশ্চাতে গান্ধীজীর ত্যাগ, নিষ্ঠা, দৃঢ়তা অসাধারণ কাজ করিয়াছিল। যে মন্ত্রে তিনি আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দিগকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, যে শক্তিতে তিনি তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার শক্তি ছিল অপরিমেয়। তাই উহাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থান্বেষীগণের হয় নাই।

ত্রিশ

টলষ্টয় আশ্রম

১৯০৯ সালে গান্ধীজী আফ্রিকার নিপীড়িত ভারতীয়দিগের প্রতিনিধিরূপে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই নির্ব্বিরোধ সংগ্রামের—সত্যাগ্রহের দুর্দ্দমনীয় শক্তির মহিমা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে সুরু করিয়াছিলেন। বিলাত হইতে তিনি কোন সুসংবাদ লইয়া ফিরিতে পারেন নাই সত্য; আমলাতান্ত্রিক সরকারের কাছে তাঁহার আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হইয়াছিল বটে। কিন্তু ফিরিবার পথে সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট একটা ধারণা তাঁহার মনোমধ্যে এই সময়ে জাগিয়া উঠে। সত্যাগ্রহের অলৌকিক ও ব্যাপক শক্তি সম্বন্ধে তিনি সচেতন হন এবং পথে জাহাজে বসিয়া 'হিন্দ্ স্বরাজ' নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। বইখানিতে তিনি সত্যাগ্রহের অসীম শক্তি ও মাহাত্ম্যের পরিচয় বিবৃত করিলেন। হিংসাত্মক শক্তির বিরুদ্ধে অহিংসাত্মক নীতির শ্রেষ্ঠতা ঐ গ্রন্থে দৃঢ়তার সহিত আলোচিত হইয়াছিল।

পশুশক্তির বিরুদ্ধে, হিংস্র অস্ত্রবলের সম্মুখে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম একদিন জয়লাভ করিয়াছিল। অন্যায়, অসত্য এবং অধর্ম্ম অস্ত্রবলের দ্বারা সমর্থিত হইলেও, তাহা সত্য ও ন্যায়ের নির্ব্বিরোধ সংগ্রামের সম্মুখে যে টিকিতে পারে না গান্ধীজীই এ জিনিসটি বিশ্ববাসীর নিকটে প্রমাণ করিয়াছিলেন। একদিন জগৎবাসী তাঁহার এই সত্যাগ্রহ নীতির অসার্থকতা কল্পনা করিয়া হাসিয়াছিল। কিন্তু ইহার সার্থকতা প্রমাণ হইযা গিয়াছে। ভ্রান্ত জগৎবাসী সত্যাগ্রহের দুর্জ্জয় শক্তি লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছে।

যে সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনকে সার্থকতামণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল······যে সত্যাগ্রহের আঘাতে ভারতের পরাধীনতা-শৃঙ্খল মুক্ত হইয়াছে, সেই সত্যাগ্রহের শক্তি গান্ধীজী আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দিগের জন্য সংগ্রাম সুরু করিয়া তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রথম অনুভব করেন।

আফ্রিকায় লাঞ্ছিত ভারতীয়গণের লাঞ্ছনা-মোচনের জন্য যে শক্তির পরীক্ষা ও প্রথম প্রয়োগ ঘটিয়াছিল, ভারতে তাহারই পুনঃ প্রয়োগ হইয়াছিল। আফ্রিকায় ইহা সার্থক হইয়াছিল। ভারতেও উহা সার্থক হইয়াছিল। আফ্রিকায় উহার সার্থকতা গান্ধীজীর অন্তরে আনিয়া দিয়াছিল ইহার প্রতি এক দৃঢ় বিশ্বাস এবং অবিচলিত শ্রদ্ধা। এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা একদিনের জন্যও ম্লান হয় নাই অথবা সংশয়ের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় নাই।

কিন্তু যেভাবে গান্ধীজী নিজেকে এবং তাঁহার দেশবাসীদিগকে এই সত্যাগ্রহ সংগ্রামের সেনারূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহার ইতিহাসটুকুও পরম বিস্ময়কর।

সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে প্রস্তুতির জন্য এবং এই আন্দোলনকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য আফ্রিকায় ১৯১০ সালে গান্ধীজী টলষ্টয় আশ্রম নামে একটি আশ্রম গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ভারতে সবরমতী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া সত্যাগ্রহী গড়িয়া তোলার পূর্ব্বাভাষ এই টলষ্টয় আশ্রমেই হইয়াছিল। এই আশ্রম গঠন করিয়া গান্ধীজী নিজে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সত্যাগ্রহীগণ এই আশ্রমে থাকিতেন এবং নিজেদেরকে ত্যাগের মন্ত্রে, স্বাবলম্বনের মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেন।

সত্যাগ্রহীদের একজায়গায় সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য, সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য গান্ধীজী বহুদিন হইতে এইরূপ একটি আশ্রম গঠনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছিলেন। আফ্রিকা হইতে ভারতীয়দিগের মর্য্যাদা এবং স্বাধীনতা বিলোপ করিবার জন্য জেনারেল স্মাট্‌স এবং আফ্রিকার আমলাতান্ত্রিক ইংরাজগণ যে অনমনীয় মনোভাব পোষণ করিতেছিলেন তাহার সহিত সংগ্রামের জন্য উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করার প্রয়োজন ছিল।

জেনারেল স্মাট্‌স এবং আমলাতান্ত্রিক ইংরাজদের পক্ষে ছিল হিংসাত্মক যাবতীয় অস্ত্র। সুতরাং সংগ্রাম যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে ইহা সহজেই অনুমেয়। এই দীর্ঘকাল স্থায়ী-সংগ্রামকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অর্থের প্রয়োজন

অপেক্ষা আত্মবল ও চরিত্রবলের অধিকতর প্রয়োজনীয়তার কথা গান্ধীজী এই সময়ে উপলব্ধি করেন। গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করিতে গিয়াই লক্ষ্য করেন যে দানব-শক্তির সহিত তাঁহাদিগকে লড়িতে হইবে। সত্য ও ন্যায়ের অস্ত্র লইয়া তাঁহাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহাদের প্রয়োজন আত্মশুদ্ধির, আত্মবলের এবং চরিত্রবলের।

সংগ্রাম যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে ইহা একরূপ নিশ্চিতই ছিল। কতকাল উহা স্থায়ী হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া সত্যাগ্রহীদিগকে সঙ্কল্পে অটল থাকিতে হইবে। তাহাদের মনের ভাব অপরিবর্ত্তিত রাখিতে হইবে। সংগ্রাম সুরু হইলেই সত্যাগ্রহীদিগকে কারাবরণ করিতে হইবে। কারামুক্ত হইয়া আসিলে কে তাহাদিগকে চাকুরী দিবে? জেল হইতে বাহির হইয়া সত্যাগ্রহীগণ নিজেই বা কি খাইবে, আর তাহার পরিবারবর্গকেই বা খাওয়াইবে কি? তাহারা কোথায় থাকিবে, তাহাদিগকে বাড়ী ভাড়াই বা দিবে কে? সুতরাং জীবিকাবিহীন হইয়া সত্যাগ্রহীদিগের শুকাইয়া মরার সম্ভাবনা ছিল। নিজে ক্ষুধায় মরিয়া, পরিবার-পরিজনকে ক্ষুধায় মারিয়া যুদ্ধ করিবার মত লোক জগতে সচরাচর পাওয়া যাইবে না, গান্ধীজী তাহা উপলব্ধি করিলেন।

ইহা উপলব্ধি করিয়াই গান্ধীজী সত্যাগ্রহী পরিবারবর্গকে একত্র রাখিবার এবং নিজে সকলের সঙ্গে থাকিয়া প্রত্যেককে দিয়া নিজেদের কাজ করাইয়া লইবার আশা মনে মনে পোষণ করিলেন। কিন্তু আশাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করিবার সমস্যা ছিল।

সত্যাগ্রহীদিগকে একত্র রাখিবার জন্য জায়গার অন্বেষণে গান্ধীজী ব্যাপৃত হইলেন। শহরে উহাদিগকে রাখা তিনি সমীচীন বোধ করেন নাই। কারণ তাহাতে ব্যয় অধিক হইবে এবং উহা সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনের অনুকূল হইবে না।

ফিনিক্সে গান্ধীজী প্রতিষ্ঠিত এক আশ্রম ছিল। এখান হইতে

'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' নামে একখানি কাগজ গান্ধীজী প্রকাশ করিতেছিলেন। সেখানে কিছু চাষবাস হইত, অন্যান্য কতকগুলি সুবিধাও এখানে ছিল। কিন্তু জায়গাটি জোহানসবার্গ নগরী হইতে তিনশত মাইল দূরে বলিয়া এখানে সত্যাগ্রহীদিগের শিবির তিনি প্রতিষ্ঠা করেন নাই। ট্রানস্‌ভালের মধ্যে এবং জোহানসবার্গের কাছে কলেনবেকের ৩৩০০ বিঘা জমি কেনা ছিল। তিনি উহা গান্ধীজীকে দিলেন সত্যাগ্রহ-শিবির প্রতিষ্ঠার জন্য।

এই জমিতে ফলের বাগান ছিল, জলের ঝরণা ছিল। জোহানসবার্গ হইতে উহা ২১ মাইলের ব্যবধান মাত্র। এইখানে ঘর তুলিয়া সত্যাগ্রহীদিগকে ও তাহাদের পরিবারবর্গকে রাখা স্থির হইল।

...গঠিত হইল টলষ্টয় আশ্রম নামে আত্মনির্ভরশীল এক প্রতিষ্ঠান। সত্যাগ্রহীরা এই আশ্রমে থাকেন, আর নিজেদের জীবনকে সত্যাগ্রহীর আদর্শে গড়িয়া তুলিবার সাধনায় ব্রতী হইলেন। ত্যাগ, শিক্ষা, স্বাবলম্বন, কষ্টসহিষ্ণুতা তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইল। সত্যাগ্রহীদিগকে শিক্ষিত করিতে, ত্যাগ, স্বাবলম্বন ও কষ্টসহিষ্ণুতার মহাব্রতে দীক্ষিত করিয়া সত্যাগ্রহীদিগকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য গান্ধীজী সুরু করিলেন অক্লান্ত অমানুষিক পরিশ্রম। ঋষি টলষ্টয় গান্ধীজীর এই মহৎ আন্দোলনকে, স্বাবলম্বন-আদর্শকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পত্র প্রেরণ করিলেন। টলষ্টয়-পন্থী বলিয়া গান্ধীজীর নাম এই সময়ে ঘোষিত হইল দেশ-দেশান্তরে।

টলষ্টয় আশ্রমের মত একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠায় গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ছিল সত্যাগ্রহী পরিবারদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখা, খরচ বাঁচানো এবং অবশেষে স্বাশ্রয়ী হওয়া। তিনি একথাটা বেশ বুঝিয়াছিলেন যে এইরূপ করিলেই তাঁহারা অমিত পরাক্রমশালী আমলাতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে যতদিন খুশী ততদিন লড়িতে পারিবেন।

টলষ্টয় আশ্রম ছিল একটা বৃহৎ পরিবার, সেখানে পিতারূপে ছিলেন গান্ধীজী। যুবকদিগের শিক্ষার দায়িত্ব, তাহাদের জীবননিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব,

চরিত্রগঠন, শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান, আত্মিক বল-সঞ্চার—এ সকলেরই দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আশ্রমে চাকর-বাকর ছিল না। পায়খানা সাফ হইতে আরম্ভ করিয়া রান্না করা পর্য্যন্ত সকল কাজই আশ্রমবাসী সত্যাগ্রাহীদিগকেই করিতে হইত। গাছপালার যত্ন লইতে হইত। মিঃ কলেনবেক এই আশ্রমে যোগ দিয়াছিলেন সত্যাগ্রহীরূপেই। তাঁহার কৃষির সখ ছিল। তাঁহার সহিত যুবকেরা ও বালকেরা কৃষির কাজে, বাগানের কাজে লাগিয়া যাইত। বাগানে গর্ত্ত খুঁড়িতে হইত, গাছ কাটিতে হইত, বোঝা উঠাইতে হইত। ইহাতে বালক ও যুবকগণের একাধারে শরীরচর্চ্চা ও আনন্দলাভ দুই-ই হইত, অন্য ব্যায়াম বা খেলাধূলার দরকার তাহারা বোধ করিত না।

আশ্রমবাসীদিগকে স্বাবলম্বী করার জন্য গান্ধীজীর চেষ্টার অন্ত ছিল না। আশ্রমবাসীদিগের জন্য ঘর-দুয়ার তৈয়ারী করার আবশ্যক ছিল। মিঃ কলেনবেকের পরিচালনায় রাজমিস্ত্রী ও ছুতারের কাজ সকলে মিলিয়া করিল। সত্যাগ্রহীদিগের বাসস্থান তৈযারী হইয়া গেল। সত্যাগ্রহীগণ আশ্রমের পথ-ঘাট নির্ম্মাণ করিলেন। আশ্রমের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রত্যেকেই মনোযোগী হইলেন। আশ্রমের আযতন বিশাল হইলেও আবর্জ্জনা, ময়লা ও উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি কাহারও চোখে পড়িত না। উচ্ছিষ্ট শাক-পাতা, মল প্রভৃতি গভীর গর্ত্ত করিয়া পোঁতা হইত। কিছুকাল পরে উহা বহুমূল্য সার হইত। এসকল কাজই আশ্রমবাসীগণ করিত। ময়লা পরিষ্কার এবং সেই ময়লাকে কাজে লাগানর অদম্য উৎসাহ আশ্রমবাসীদিগের মধ্যে জাগিয়াছিল। এই উদ্যমের মূলে ছিলেন গান্ধীজী।

টলষ্টয় আশ্রমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও গান্ধীজী করিয়াছিলেন। শিক্ষা দেওয়ার ভার প্রধানতঃ গান্ধীজী ও মিঃ কলেনবেকের উপর পড়িয়াছিল। আশ্রমে সকল ধর্ম্মের লোকজন—হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শী, খৃষ্টান ছিল—সকল দেশের বালকবালিকা ছিল। উহাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার সমস্যা ছিল।

গান্ধীজীর উহাদিগকে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা হইত। কারণ তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানেই শিক্ষার সম্পূর্ণতা নির্ভর করে। কিন্তু সকল দেশের ভাষা—বিশেষতঃ তেলেগু প্রভৃতি দুই-একটি ভাষা না জানার দরুণ তিনি বড় অসুবিধা বোধ করিতেন। তাই সকল সময়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা তিনি দান করিতে পারিতেন না। মাঝে মাঝে ইংরাজিতে তাঁহাকে কাজ চালাইতে হইত। এজন্য তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন।

টলষ্টয় আশ্রমে গান্ধীজী যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহাতে নূতনত্ব ছিল। অক্ষর পরিচয় ও পুঁথিগত বিদ্যা বালকবালিকা ও যুবকদিগকে দেওয়া ত হইতই। ইহা ভিন্ন, ব্যবস্থা এই ছিল যে—প্রধানতঃ তাহারা যাহাতে আনন্দ পায় এমন কিছু গল্প করা বা পড়িয়া শোনানো। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও বিভিন্ন দেশবাসী বালকবালিকা ও যুবককে একসঙ্গে মিশিতে দিয়া মিত্রভাব, সেবাভাব শিক্ষা দেওয়াও একটা উদ্দেশ্য ছিল।

আত্মিক শিক্ষার জন্য···প্রার্থনার জন্য ভজন গাওয়ান হইত, নীতিবিষয়ক পুস্তক পাঠ করিয়া শোনান হইত। কিন্তু ইহাতে গান্ধীজীর অন্তর যেন পরিতৃপ্ত হইতেছিল না। আত্মিক শিক্ষার জন্য এই উপায় তাঁহার মনঃপূত হইতেছিল না। তিনি বুঝিলেন যে বালকবালিকার আত্মার শুদ্ধির নিমিত্ত পুঁথিগত শিক্ষা বা নীতিই যথেষ্ট নহে। শরীরের শিক্ষা শারীরিক ব্যায়ামচর্চ্চা দ্বারা দেওয়া যায়, বুদ্ধির শিক্ষা বুদ্ধি-চর্চ্চা দ্বারা দেওয়া যায়···আত্মার উন্নতি শিক্ষকের বা গুরুজনের ব্যবহার হইতেই পাওয়া যায়। এসম্বন্ধে গান্ধীজী নিজেই বলিতেছেন, "আমি যদি মিথ্যা বলি ও আমার শিষ্যদিগকে সত্য কথা বলিতে প্রযত্ন করি তাহা হইলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। ভীরু শিক্ষক শিষ্য-দিগকে বীরত্ব শিক্ষা দিতে পারে না। ব্যাভিচারী শিক্ষক শিষ্যদিগকে সংযম শিক্ষা কেমন করিয়া দিবে ?"···এই সত্যটি উপলব্ধি করিয়া গান্ধীজী তাঁহার আশ্রমবাসী শিষ্যদিগের সম্মুখে নিজেকে আদর্শ করিয়া রাখিতে যত্নবান্ হইলেন। শিষ্যদের

জন্য গুরুর সমস্ত আচরণ শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক এ কথা গান্ধিজী বুঝিলেন। যে সংযম-সাধনার আবশ্যকতা তিনি বহুদিন আগেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, টলষ্টয় আশ্রমে অতিশয় যত্নের সহিত তিনি তাহার অনুশীলন করিলেন। তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের অধিবাসীগণও সংযমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন।

এই আশ্রমে আশ্রমবাসীদিগকে অক্ষরজ্ঞান ও পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষা দান করার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের বিকাশকে এবং চরিত্রগঠনকে বরাবরই তিনি প্রধান স্থান দিয়া আসিয়াছিলেন···উহাদিগকে শিক্ষার সার বলিয়া তিনি মনে করিতেন। সেইজন্য সত্যাগ্রহীদিগের হৃদয়ের বিকাশ ও চরিত্রগঠনের প্রতি তিনি সবিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে চরিত্র-গঠনই অন্য সকল শিক্ষার ভিত্তি। সকল শক্তির মূল উৎস। সেই ভিত্তি যদি পাকা হয় তাহা হইলে বালকবালিকাগণ অন্য সকল শিক্ষাই নিজেদের আবশ্যকমত নিজেরাই গ্রহণ করিতে পারিবে।

শারীরিক শিক্ষার আবশ্যকতাও গান্ধীজী বুঝিতেন। তাই কার্য্যের ভিতর দিয়া সে শিক্ষা তিনি আশ্রমবাসীদিগকে দিয়াছিলেন। সকলকেই নিজ নিজ কর্ম্ম এবং সমবেতভাবে আশ্রমের সকল কার্য্যই করিতে হইত।

আশ্রমবাসীগণ যে সকল কার্য্য করিতেন তাহাতে কাহারও মধ্যে বিরক্তির কোন ভাব কখনও লক্ষিত হইত না। কাজ করার সঙ্গে আনন্দ মিশ্রিত থাকিত। টলষ্টয় আশ্রমে প্রথম হইতেই এই নিয়ম ছিল যে, যে কাজ কোন শিক্ষক করিবেন না, সে কাজ বালকদিগকে দিয়াও করানো হইবে না। এই জন্য ছেলেরা আনন্দ করিয়া শিখিত, আনন্দে কাজ করিত।

জীবিকার্জ্জনকে গান্ধীজী তাঁহার শারীরিক শিক্ষার একটা অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিতেন এবং সকলকেই কোন না কোন উপযোগী কাজ শিখাইবার চেষ্টা করা হইত।

একবার মিঃ কলেনবেক এক মঠে গিয়া চটী জুতা তৈয়ারী করা শিখিয়া আসেন। তাঁহার নিকট হইতে গান্ধীজীও উহা শিখিয়াছিলেন এবং শিখিয়া যেসব ছেলেরা এই কাজ শিখিতে চাহিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি উহা শিখাইয়াছিলেন।

টলষ্টয় আশ্রমে এইরূপ শিক্ষাদান করা ব্যর্থ হয় নাই। আশ্রমবাসীরা একে অন্যের প্রতি সহিষ্ণু ছিল, একে অন্যের ধর্ম্মের প্রতি, আচরণের প্রতি উদারতা প্রকাশ করিতে শিখিয়াছিল। সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছিল, কর্ম্মঠ হইয়াছিল।

আশ্রমবাসীদিগের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সত্যাগ্রহীরা বিশুদ্ধ আশ্রমে স্থান পাইয়াছিল, অসদাচরণ ও দাম্ভিকতার পথ তাহারা পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং ভাল ও মন্দ পৃথক হইয়াছিল। সত্যাগ্রহীগণ নিয়মানুবর্ত্তিতার বশবর্ত্তী হইয়াছিল, তাহাদের সততা ও সাধুতার খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সত্যাগ্রহীদিগের বিবেক, তাহাদের ধৈর্য্য, তাহাদের দুঃখ সহ্য করার শক্তি—এ সমস্তই এই টলষ্টয় আশ্রম স্থাপনার ফলেই হইয়াছিল।

বাস্তবিক সত্যাগ্রহের যুদ্ধের জন্য টলষ্টয় আশ্রম এক অধ্যাত্মিক শুদ্ধি ও তপশ্চর্য্যার স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যদি এরূপ একটি স্থান না পাওয়া যাইত অথবা গড়িয়া না উঠিত, তাহা হইলে গান্ধীজীর আফ্রিকাস্থিত সত্যাগ্রহ সংগ্রাম শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিত কি না—অথবা শেষ পর্য্যন্ত জয়যুক্ত হইতে পারিত কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এমনভাবে গান্ধীজী এই আশ্রমটিকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন যে তাহার ফলে হাজার হাজার লোক আকৃষ্ট হইয়া এই আশ্রমে যোগদান করিতেন… সত্যাগ্রহ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিতেন… প্রয়োজন হইলেই কারাবরণ করিতেন। ১৯১৩ সালে যে বৃহত্তর ভিত্তির উপর সত্যাগ্রহ সংগ্রাম সুরু হইয়াছিল সে সংগ্রামও তাহার শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল এই আশ্রম হইতে। এখানে বালক এবং যুবকদিগকে শাসন

করিবার জন্য গান্ধীজী সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ তিনি তাঁহার নিজের আচরণের দ্বারা আশ্রমবাসীদিগের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়বোধ্ অথবা কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের বোধ জাগাইয়া দিতেন। কঠিন তিনি বড় একটা কাহারও উপর হইতেন না। যদি কখনও কাহারও উপর কঠিন হইতেন, তখনই তাহাকে তাঁহার কঠিন ভাবের কারণ বুঝাইয়া দিতেন।

একবার এই আশ্রমের একটি অতিশয় দুর্দ্দান্ত বালককে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া শোধরাইবার চেষ্টা গান্ধীজী করিয়াছিলেন। কিন্তু সেবারে তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। অর্থাৎ বালকটিকে বুঝানতে কোন ফল হইল না। তাহার দুর্দ্দান্তপনা কমিল না। ইহাতে গান্ধীজী ক্রোধে অন্ধ হইয়া একটি রুল দিয়া বালকটির হাতের উপর আঘাত করিলেন। কিন্তু আঘাত করিযাই তিনি ক্রোধের বিষময ফল সম্বন্ধে সচেতন হইয়া অনুতাপে কাঁপিতে লাগিলেন। গান্ধীজীর মুখে-চোখে সঙ্গে সঙ্গে একটা অনুতাপের ভাব ফুটিয়া উঠিল। বালকের বেদনায় তিনি ব্যথিত হইলেন এবং সেই ব্যথা তাঁহার মুখেচোখে ব্যক্ত হইল। বালক উহা লক্ষ্য করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কৃতকর্ম্মের জন্য··· দুর্দ্দান্তপনার জন্য সে কাঁদিয়া ফেলিল। সে গান্ধীজীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। আঘাতের বেদনায় সে কাঁদে নাই—অনুতাপে সে কাঁদিয়াছিল।

গান্ধীজী তাঁহার জীবনে এইরূপ দুই-একবার ভিন্ন কাহাকেও আঘাতের দণ্ড দিয়া শোধরাইবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু প্রতিবারেই এইরূপ দণ্ডদান করিয়া তিনি অনুতাপে জর্জ্জরিত হইয়াছেন। আঘাত করিয়া শিক্ষা দেওয়ার বিরোধী তিনি আজীবন ছিলেন। তিনি মনে করিতেন কাহাকেও শোধরাইবার জন্য আন্তরিকতা যদি থাকে, তবে তাহা আঘাত করার চেযে ভাল ফল দান করিয়া থাকে। আঘাতের দ্বারা কাহারও সংশোধন করিতে গেলে মানুষ তাহার ভিতরকার পশুশক্তিরই পরিচয় দিয়া থাকে—তাহার আত্মার পরিচয়, আন্তরিকতার পরিচয় তাহাতে পাওয়া যায় না।

টলষ্টয় আশ্রমে গান্ধীজীর জীবনী ও বাণীর এক অপরূপ সমন্বয় দেখা গিয়াছিল। এখানে তাঁহার জীবনই ছিল তাঁহার বাণী। ব্যক্তিগত আচার আচরণের মধ্য দিয়া এই সময় হইতেই তিনি তাঁহার বাণী অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া দিতে সুরু করিয়াছিলেন। প্রচার-করা বাণী অপেক্ষা ইহার ফল ভালই হইত।

টলষ্টয় আশ্রমে গান্ধীজীর বিচিত্র অভিজ্ঞতালাভও ঘটিয়াছিল। 'জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ করা' বলিয়া বাংলায় যে একটা প্রবাদ আছে গান্ধীজীর জীবনে এই সময়ে তাহার অভিজ্ঞতালাভ ঘটে। জুতা সেলাই সত্যসত্যই তিনি করিয়াছেন······তাহার মধ্য দিয়া স্বাবলম্বনের শিক্ষা দান করিয়াছেন, প্রার্থনা এবং সদাচার সংযমের দ্বারা আশ্রমবাসীদিগের মধ্যে ধর্ম্মভাব জাগাইয়া তুলিয়াছেন—ইহা আমরা দেখিয়াছি। চিকিৎসা-বিদ্যায়ও এই সময় হইতে তাঁহার প্রবণতা দেখা গিয়াছিল।

আশ্রমে ব্যারাম পীড়া কদাচিৎ হইত, হইলেও চিকিৎসার বিশেষ কোন আয়োজন ছিল না। গান্ধীজী তাঁহার আশ্রমের ব্যারাম পীড়ার অল্পতার কারণ নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন যে "আমার বিশ্বাস ছিল যে সাদাসিধা জীবনযাত্রায় অসুখ করিবেই বা কেন?" আশ্রমবাসীগণ সরল অনাড়ম্বর সংযত জীবনযাপন করিত বলিযাই সেখানে অসুখবিসুখ করিত না, গান্ধীজীর ইহাই বিশ্বাস ছিল।

যদি কখনও আশ্রমে কাহারও অসুখবিসুখ করিত তাহা হইলে গান্ধীজীই তাহাদিগের চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার চিকিৎসার পদ্ধতি ছিল প্রাকৃতিক উপায়। তিনি বলিয়াছেন, "এই সময়ে ছেলেমেয়েদের নিষ্পাপ থাকা সম্বন্ধেও আমার যেরূপ শ্রদ্ধা ছিল, প্রাকৃতিক উপায়ে পীড়া আরোগ্য করার সম্বন্ধে আমার তেমনি শ্রদ্ধা ছিল।"

উত্তরকালে গান্ধীজী প্রকৃতিক উপায়ে চিকিৎসা করা সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মাটি ও জলের সাহায্যে পীড়া আরোগ্য করার

উপরে তাঁহার অসীম বিশ্বাস ছিল। এই সময়েই এই টলষ্টয় আশ্রমের পীড়িতদিগের আরোগ্যের নিমিত্ত তিনি প্রাকৃতিক উপায়ে চিকিৎসা করিতে সুরু করেন। তিনি মনে করিতেন যে কেবলমাত্র জল, মাটি ও উপবাসের প্রযোগ দ্বারা এবং সঙ্গে সঙ্গে আহারের পরিবর্ত্তন দ্বারা সকল প্রকার রোগই অরোগ্য করা সম্ভব। এই উপায়ে চিকিৎসার পরীক্ষায় গান্ধীজী আশাতীত ফললাভ করিয়াছিলেন, সেইজন্য এই রীতির চিকিৎসায় তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল।

বাস্তবিকই, আশ্রমে কোন একটা রোগেও ঔষধ কিংবা ডাক্তারের প্রয়োজন হয় নাই। একজন সত্তর বৎসরের উপর ভারতবাসী বৃদ্ধের হাঁপানী কাশী গান্ধীজী কেবল খাদ্যের পরিবর্ত্তন ও জলের প্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়াছিলেন।

টলষ্টয় আশ্রমে গান্ধীজীকে শিক্ষক ও অভিভাবক হিসাবে সত্যাগ্রহীদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল, তাঁহাকে তাহাদের সুখদুঃখের ভাগ লইতে হইয়াছিল, তাহাদের জীবনের অনেক রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া জানিতে হইয়াছিল, তাহাদের উচ্ছ্বসিত যৌবন-তরঙ্গকে সৎমার্গে পরিচালিত করিতে হইয়াছিল।

আশ্রমবাসী সত্যাগ্রহীর পতন হইলে গান্ধীজী প্রায়শ্চিত্তের জন্য উপবাস করিতেন্। একবার তিনি প্রায়শ্চিত্তের জন্য সাত দিনের উপবাস ও সাড়ে চার মাস একবেলা আহারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আশ্রমবাসীর পতনে তিনি ব্যথিত হইয়া উপবাস করিতেন, কারণ তিনি মনে করিতেন যে, তিনি যদি আশ্রমবাসীদের পতনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেন, তবে যাহারা পতিত তাহারা তাঁহার দুঃখ বুঝিতে পারিবে ও তাহাদের নিজেদের দোষ বুঝিয়া দোষ স্খালন করিতে চেষ্টা করিবে।

ঠিক এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়াই গান্ধীজী উত্তরকালে বহুবার প্রায়শ্চিত্তরূপ উপবাসব্রত পালন করিয়াছিলেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। দোষীকে এবং পাপাচরণকারীকে তাহার দোষ এবং পাপ সম্বন্ধে সচেতন করিবার জন্য তিনি

বহুবারই উপবাস করিয়াছেন। দেশ যখন সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জ্জরিত হইয়াছে, পৃথিবী যখন হিংসায় উন্মত্ত হইয়াছে—তখন সঙ্কীর্ণমনা, হিংস্র জন-সমাজের মধ্যে চেতনা ও কর্ত্তব্যবোধ জাগাইবার জন্য তিনি এই উপবাসরূপ অস্ত্র ব্যবহার করিতেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

আর একবারও গান্ধীজী আফ্রিকাবাসকালে তাঁহার আশ্রমবাসীর পতনের জন্য ১৪ দিনের উপবাস করেন। ইহার পরিণামও খুব ভাল হইয়াছিল।

তাঁহার উপবাসে আশ্রমের সকলেই ব্যথিত হইযাছিলেন। অপরাধীর অপরাধে তিনি যে কতখানি দুঃখ পাইযাছিলেন তাহা তাঁহার উপবাসের দ্বারাই সকলেই বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার এই উপবাসে ক্রোধ ছিল না—ছিল সহানুভূতি ...ছিল সংশোধনের সুতীব্র একটা আকুতি। আশ্রমের সকলেই তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই দুষ্কৃতকারীদের মধ্যেও জাগিয়াছিল একটা অনুতাপ · আশ্রমের বায়ুমণ্ডল শুদ্ধ হইয়াছিল...পাপের কালিমা কাটিয়া গিযাছিল। পাপ করা কি ভয়ঙ্কর তাহা আশ্রমবাসীগণ গান্ধীজীর উপবাসে বুঝিতে পারিযাছিলেন। ইহাতে আশ্রমবাসী এবং গান্ধীজীর মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা খুব নিবিড় ও সরল হইয়াছিল।

একত্রিশ

সংযম-সাধনা

গান্ধীজীর বালকবয়স হইতেই সংযম-সাধনা তাঁহার জীবনের অন্যতম নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি আমিষ আহার ত্যাগ করিয়া শুধুমাত্র দুধ ও ফলমূলের উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করিয়া সংযম-সাধনা করিয়াছিলেন। আফ্রিকায় প্রবাসকালে তিনি দুধও পরিত্যাগ করিয়া শুধুমাত্র ফলমূলের উপর নির্ভর করিতে সুরু করিয়াছিলেন এবং আজীবন ফলমূল আহার করিয়াই জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন।

দুধ যে ইন্দ্রিয়বিকার উপস্থিতকারী একথা গান্ধীজী ভারতে থাকিতে রাজচন্দ ভাইয়ের নিকট হইতে বুঝিয়াছিলেন। শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য দুধ যে অত্যাবশ্যক নয় একথা বহুদিন হইতেই তিনি বুঝিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু আফ্রিকায় পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দুধ পরিত্যাগ তিনি করেন নাই।

ইন্দ্রিয় দমনের জন্য দুধ ছাড়া যে অত্যাবশ্যক একথা যখন তাঁহার অনুভূতিলোকে জাগিতেছিল, সেই সময়ে তিনি জানিতে পারেন যে কলিকাতা প্রভৃতি নগরে গরু-মহিষকে নিঃশেষে দোহন করা হয়, গরু-মহিষকে প্রাণঘাতী কষ্ট দিয়া দুধটুকু নিঃশেষে দুহিয়া দুগ্ধপানকারীদিগকে প্রদান করা হয়। ইহাতে ‘ফুকা’ নামক সংঘাতিক ও ভয়ানক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে গান্ধীজী অবহিত হইলেন এবং দুগ্ধ ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। এই সঙ্কল্পে অংশ গ্রহণ করিলেন মিঃ কলেনবেকও। তিনি অত্যন্ত সাহসী ও সংযমী ছিলেন। তাই দুধ ছাড়ার পরীক্ষা করিতে তিনি তখনই প্রস্তুত হইলেন। গান্ধীজী ও মিঃ কলেনবেক দুধ খাওয়া ছাড়িয়া দিলেন এবং মাত্র শুষ্ক ও টাট্‌কা ফলের উপর তাঁহারা নির্ভর করিতে লাগিলেন। এই ঘটনা টলষ্টয় আশ্রমে ১৯১২ সালে ঘটিয়াছিল। রান্নাকরা জিনিস খাওয়াও এই সময়ে গান্ধীজী বন্ধ করিয়াছিলেন।

ফলাহার করার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া গান্ধীজী নিজেই বলিয়াছেন—"ফলাহার মানে, যেসকল ফল খুবই সস্তা তাহারই উপরে নির্ভর করা। দীন-দরিদ্র যেভাবে জীবন যাপন করে, আমরা সেইরূপ গরীবের জীবন যাপন করা স্থির করিলাম। ফলাহারে আমরা খুব সুবিধাও পাইয়াছিলাম। ফলাহারে বড় একটা উনুন জ্বালাইবার দরকার হয় না। কাঁচা মুগফলী, কলা, খেজুর ও জলপাইয়ের তেল—ইহাই আমাদের সাধারণ খাদ্য হইয়া পড়িল।"*

কিন্তু এইরূপে দুধ ত্যাগ করিয়া শুধুমাত্র ফলমূল আহার করা সুরু করিয়া গান্ধীজী কোনরূপ দুর্ব্বলতা বা ব্যাধি ভোগ করেন নাই। তখন তাঁহার শারীরিক শক্তি সম্পূর্ণই ছিল। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, "এমন শরীর ছিল যে একদিনে পায়ে হাঁটিয়া ৫১ মাইল গিয়াছিলাম। ৪০ মাইল দিনে চলা ত সোজা জিনিস হইয়াই পড়িয়াছিল।"†

এই পরীক্ষার আধ্যাত্মিক পরিণাম গান্ধীজীর জীবনের উপরে খুব ভালরূপই হইয়াছিল। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে দুধ ত্যাগ করায় তাঁহার আত্মশুদ্ধিই ঘটিয়াছে। এই আত্মশুদ্ধির অনুভূতি ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা গান্ধীজীর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহসংগ্রাম পরিচালনায় প্রেরণা এবং আত্মবিশ্বাস আনিয়া দিয়াছিল। তাঁহার সংযমসাধনা আশ্রমবাসীদিগের মধ্যেও একটা সংযত আচরণ আনিয়াছিল, তাহাদিগকেও দুর্জ্জয় শক্তিতে শক্তিশালী করিয়াছিল।

দুধ ও শস্য আহার ত্যাগ করিয়া গান্ধীজী ফলাহারের পরীক্ষা সুরু করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে সংযমের জন্য উপবাসও তিনি আরম্ভ করিলেন। ইতিপূর্ব্বেও গান্ধীজী উপবাস করিতেন। কিন্তু তাহা কেবল স্বাস্থ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, শরীরকে নীরোগ রাখিবার জন্য। দেহ-প্রবৃত্তিকে দমন করিবার জন্যও যে উপবাসের প্রয়োজন আছে, তাহা আফ্রিকা প্রবাসকালে

* গান্ধীজীর আত্মকথা—সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

† দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ ঐ

তিনি ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম বলিযা এবং মাতা কঠিন ব্রতচারিণী ছিলেন বলিযা, একাদশী ইত্যাদি ব্রত তিনি দেশে থাকিতে পালন করিতেন। তবে সে সকলের মধ্যে অনুকরণ-প্রবৃত্তিটাই ছিল প্রবল, পিতামাতাকে সুখী করিবার অভিলাষটাই ছিল মুখ্য। ঐ সকল ব্রত হইতে কিছু লাভ হয় কি না বুঝিতেন না, লাভ হয না ইহাই মনে করিতেন। কিন্তু আফ্রিকায় থাকিতে জনৈক বন্ধুর দেখাদেখি ব্রহ্মচর্য্যের সহায়রূপে উপবাস-ব্রত তিনি পালন করিতে সুরু করেন। আত্মশুদ্ধি, সংযম-সাধনার জন্য উপবাসব্রত পালনের অত্যাবশ্যকতা এই সময়ে তিনি বুঝিয়াছিলেন। অনেকে একাদশী প্রভৃতির উপবাসে ফলাহার করিয়া থাকেন। কিন্তু গান্ধীজী স্বভাবতঃই ফলাহার করিতেন বলিয়া তিনি একাদশী প্রভৃতি উপবাসব্রত পালন করিতে কেবল জল ছাড়া আর কিছুই পান করিতেন না।

টলষ্টয় আশ্রমে থাকিতে গান্ধীজী যে সংযম-সাধনা তাঁহার নিজের জীবনে সুরু করিয়াছিলেন, আশ্রমবাসীগণও তাঁহার দেখাদেখি সেই সংযম-সাধনায ব্রতী হইয়াছিলেন। গান্ধীজী বলিয়াছেন, "যখন কোন ভাল কাজ আমি করিতেছি বলিয়া আমার মনে হয়, তখন আমার সঙ্গে যাহারা থাকে তাহাদিগকেও উহার সহিত যুক্ত করিতে প্রযত্ন করি।"* গান্ধীজীর আদর্শে তাঁহার আশ্রমে সংযমসাধনা বিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভই করিয়াছিল।

একবার মুসলমানদের রোজা এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রদোষব্রত † এক সমযেই অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে পড়িল। গান্ধীজীর দেখাদেখি উপবাসের সার্থকতা হিন্দু ও মুসলমান সকলেই সমানভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল। সুতরাং এই উপলক্ষে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই উপবাস পালন করিতে সুরু করিয়াছিল। গান্ধীজী এই সময়ে পার্শী, শিখ ও খৃষ্টানদিগকেও মুসলমানদিগের উপবাসব্রতের সহিত যোগ দিতে বলেন। সকলেরই সংযমব্রতে যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য একথা

---

* গান্ধীজীর আত্মকথা—সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

† সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উপবাস-ব্রত

তিনি সকলকেই বুঝাইয়া দিলেন। সকল আশ্রমবাসীই আনন্দের সহিত গান্ধীজীর এই প্রস্তাব গ্রহণ করিল।

এইরূপ উপবাসব্রত পালনের ফলও ভাল হইয়াছিল। ইহাতে একদিকে যেমন সকলে উপবাস ও একাহারের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিল, তেমনি একের প্রতি অন্যের উদারতা পরমতসহিষ্ণুতা, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে একটা মধুর সখ্যভাব, তাহাও জাগিল। এ সম্বন্ধে গান্ধীজীর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য —"হিন্দু-মুসলমান ছেলেদের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া ঝগড়া অথবা বিবাদ একবারও হইয়াছে বলিয়া আমার স্মরণ নাই। বরঞ্চ ইহার বিপরীত ভাবই আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মে দৃঢ় থাকিয়া একে অপরের সম্মান রক্ষা করিত ও একে অপরের ধর্ম্মক্রিয়া করিতে সাহায্য করিত।"

বিভিন্ন সম্প্রদায় কিরূপ মিলিয়া-মিশিয়া বন্ধুভাবে, একে অন্যের প্রতি উদার ভাব পোষণ করিয়া থাকিতে পারে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি দিয়া গিয়াছেন।

টলষ্টয় আশ্রমে নিরামিষাহারের নিয়ম ছিল। গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই সকলে এই নিয়ম মানিযা লইযাছিলেন। গান্ধীজী আশ্রমবাসীদিগের মাংসাহারের ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীকে দেখিয়া, তাঁহার আচরণ লক্ষ্য করিয়া, সংযমের পক্ষে মাংসাহার পরিত্যাগের প্রয়োজনীযতা আশ্রমবাসীগণ বুঝিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহারা স্বেচ্ছায়ই মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সাদাসিধা আহারের প্রয়োজনীয়তা—তাহাও গান্ধীজী হইতে আশ্রমবাসীগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই আশ্রমে সাদাসিধা আহারই পরিবেশিত হইত। এইভাবে আশ্রমে সংযমের আবেষ্টন ক্রমশই বাড়িয়াছিল। উপবাস ও একাহারে অথবা মিতাহারে আশ্রমবাসীদিগের মধ্যে একটা একতার ভাব, মধুর বন্ধুভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল।

বত্রিশ

মিঃ কলেনবেক ও মহামতি গোখলে

মিঃ কলেনবেকের সাহচর্য্যের কথা এবং মহামতি গোখলের সহিত সাক্ষাতের বর্ণনা না দিলে আফ্রিকার সত্যাগ্রহের কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকে, টলষ্টয় আশ্রমের কাহিনীও অসম্পূর্ণ থাকে। সুতরাং আমরা এই পরিচ্ছেদে মিঃ কলেনবেক ও মহামতি গোখলের সম্বন্ধে কিছু বলিব। ইঁহাদের প্রভাব গান্ধীজীর জীবনকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিব।

মিঃ কলেনবেক প্রথমজীবনে—বিশেষতঃ গান্ধীজীর সহিত সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বে—অতিশয় বিলাসী ও ভোগী ছিলেন। তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয়ে গান্ধীজী তাঁহার সখ ও খরচের বহর দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই অবস্থা কাটাইয়া ক্রমে তিনি এমন সাদাসিধা জীবন যাপন করিতে অভ্যস্থ হইয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার সেই পরিবর্ত্তন গান্ধীজীকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছিল। কলেনবেক গান্ধীজীর মতই কঠোর ত্যাগের ব্রতে নিজেকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। গান্ধীজীর মতই তিনি সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন।

আশ্রমের সকলের সঙ্গে মিশিয়া তিনি একেবারে তাহাদেরই একজন হইয়া গিয়াছিলেন। কলেনবেক জীবনে কখনও কায়িক পরিশ্রমে অভ্যস্থ ছিলেন না। কখনও কোনও অসুবিধা তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় নাই। আরাম ও বিলাসের মধ্যে জীবন যাপন তাঁহার ধর্ম্ম ছিল। পৃথিবীতে যাহা কিছু সুখকর তাহা ভোগ করিতে তিনি বাকী রাখেন নাই। ধনসম্পদ্ দ্বারা যে জিনিস পাওয়া যায়, নিজের সুখের জন্য তাহা সংগ্রহ না করিয়া তিনি ছাড়েন নাই।

এই প্রকার লোকের পক্ষে টলষ্টয় আশ্রমে বাস করা, সকলের মত সাদাসিধা খাওয়া-দাওয়া করা, শোওয়া বসা যেমন-তেমন কথা নহে। গান্ধীজীর প্রভাবে

এবং তাঁহার উদ্দেশ্য ও আদর্শের আন্তরিকতা লক্ষ্য করিয়া কলেনবেকের জীবনে একটা অভাবনীয় পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল—একথা বলা যায়।

কলেনবেকের ত্যাগের শক্তি দেখিয়া আশ্রমবাসী সকলের দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছিল—তাঁহার প্রতি সকলের সম্মান সম্ভ্রম বাড়িয়া গিয়াছিল। আশ্রমবাসীগণ নিজদিগকে ঐরূপ আদর্শে গড়িয়া তুলিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। কলেনবেক নিজের ত্যাগকে কখনও দুঃখদায়ক বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া যত না আনন্দ পাইয়াছিলেন, ত্যাগের মহামন্ত্রে গান্ধীজীর নিকট দীক্ষিত হইয়া তদপেক্ষা অধিক আনন্দের আস্বাদন করিয়াছিলেন। সরল জীবনের সুখের কথা বর্ণনা করিতে তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন এবং যাঁহারা তাঁহার কাছে সরল জীবন-যাপনের মহিমার কথা শুনিতেন তাঁহারাও সরল জীবন-যাপনের আনন্দ উপভোগের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিতেন। ছোট বড় সকলের সহিত তিনি সমান হইয়া বন্ধুভাবেই মিশিতে পারিতেন। কায়িক পরিশ্রমকে তিনি মর্য্যাদামূলক বলিয়া মনে করিতেন। তাই বাগান করিতে, জুতা সেলাই করিতে তিনি লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। কায়িক পরিশ্রমের মর্য্যাদা এবং স্বাবলম্বনের যে আদর্শ গান্ধীজী তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে সত্যাগ্রহীদিগের মধ্যে স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা যেন এই কলেনবেকের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

কলেনবেক ছিলেন গান্ধীজীর ধর্ম্মালোচনার সঙ্গী। গান্ধীজীর সহিত পরিচয়ের প্রথমেই তিনি মানিয়া লইয়াছিলেন যে, যে কাজ বুদ্ধি সমর্থন করে, সেই অনুযায়ী আচরণ করা উচিত ও তাহাই ধর্ম্ম। কবি বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি —যাহা বিশ্বাস্য তাহাই শাস্ত্র, যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে—একথার তাৎপর্য্য গান্ধীজী এবং কলেনবেক উভয়েই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং সেইভাবে নিজেদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করিতেন, আশ্রমবাসীদিগের জীবনকেও সেইভাবে তাঁহারা নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিতেন।

কলেনবেকের সহিত গান্ধীজীর আহার সম্বন্ধে, আহারে সংযম সম্বন্ধেও

আলোচনা হইত। এক হিসাবে বলা যায় যে আফ্রিকায় এই দুই মনীষীর জীবন যেন একই সুরে বাঁধা হইয়াছিল। ধর্ম্ম, সংযমসাধনা ও সত্যাগ্রহী-দিগের আদর্শ নিরূপণ—সকল বিষয়েই গান্ধীজী তাঁহার মতামত এই মনীষী ব্যক্তিটির মতামতের সহিত আলোচনা করিয়া যাচাই করিয়া লইতেন।

মহামতি গোখলের প্রতি গান্ধীজীর শ্রদ্ধা ছিল অসীম। সেইজন্য আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের অবস্থাটা একবার প্রত্যক্ষ করিয়া যাইবার জন্য গান্ধীজী অনেকদিন হইতেই তথায় গোখলের আগমন আশা করিতেছিলেন। ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতাগণের কেহ আসিয়া গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ সংগ্রামের স্বরূপ, সত্যাগ্রহীদিগের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও শক্তি প্রত্যক্ষ করেন ইহা গান্ধীজীর অন্তরের বাসনা ছিল। তাঁহার সেই বাসনা সত্যসত্যই পূর্ণ হইল। মহামতি গোখলে আফ্রিকায় আসিলেন।

গান্ধীজীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি গোখলের জন্য রাজার মত অভ্যর্থনার আয়োজন করিলেন। নানা স্থানে তাঁহার অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন হইল। তিনি বক্তৃতাও দিলেন।

অতঃপর গোখলে আফ্রিকার মন্ত্রীমণ্ডলীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, সাক্ষাৎ করিয়া গান্ধীজীকে জানাইলেন যে তাঁহাকে একবৎসরের মধ্যে ভারতে ফিরিতে হইবে। কারণ আফ্রিকার ব্যাপারটার একটা মীমাংসা গোখলে আশা করিয়াছিলেন। তিনি গান্ধীজীকে বলিলেন, "সকল ব্যাপারেরই মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। 'এশিয়াটিক আইন' রদ হইবে। ইমিগ্রেশান আইন হইতে বর্ণভেদ উঠি যাইবে। তিন পাউণ্ড্ কর রদ হইবে।" মন্ত্রীদিগের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া গোখলের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু গান্ধীজী মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রতিশ্রুতিতে কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করিলেন না। তিনি বলিলেন, অনেকবার আশা করিয়া নিরাশ হইয়াছেন বলিয়া মন্ত্রীমণ্ডলীর কথায় আস্থা স্থাপন করিতে তিনি সমর্থ হইতেছেন না। মন্ত্রীমণ্ডলী ইতিপূর্ব্বে প্রতিশ্রুতি অনেক রকমই করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিশ্রুতি তাঁহারা রক্ষা করেন

নাই। এবারেও তাঁহারা যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবেন না গান্ধীজী সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন। কাজেই তিনি বলিলেন যে আফ্রিকার শাসকশ্রেণী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন ভাল, নতুবা তাঁগাকে পূর্ণ উদ্যমে সংগ্রাম করিতে হইবে।

গোখলে গান্ধীজীকে বলিয়াছিলেন যে এক বৎরের মধ্যেই আফ্রিকায তাঁহার কাজ শেষ হইয়া যাইবে—এক বৎসরের মধ্যেই তথায় ভারতীয়দিগের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। গান্ধীজীর আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হইল। মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হইল না।

গান্ধীজীর দৃঢ়তা ইহাতে বাড়িয়া গেল। প্রতিশ্রুতি রক্ষা না হওয়াতে সংগ্রামের প্রযোজনীয়তা তিনি এবং সত্যাগ্রহীগণ বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলেন। পূর্ণোদ্যমে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম সুরু হইল এবং ভারতীয়গণ একসঙ্গে তাহাদের সকল দাবী পূরণ করার জন্য আফ্রিকার মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর চাপ দিতে লাগিল।

আফ্রিকায গোখলের আগমনে গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম বিশেষভাবেই শক্তি সঞ্চয করিয়াছিল—সত্যাগ্রহ সংগ্রামের উদ্দেশ্য ও আদর্শ বেশ একটা ব্যাপকতা অর্জ্জন করিয়াছিল। গোখলের কাছে আফ্রিকার মন্ত্রীমণ্ডলী ভারতীয়দিগের মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য যে সকল অপমানকর বিধি-বিধান রদ করিযা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন, প্রতিশ্রুতি রক্ষা না হওয়ায় গান্ধীজী প্রত্যেকটি অপমানকর আইন ও কর রদ করাইযা ভারতীয়দিগের মর্য্যাদা ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম সুরু করিলেন। এই সংগ্রামে ভারত হইতে অজস্র অর্থ সাহায্য আসিয়াছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জও তাঁহার সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ভারত হইতে মিঃ এণ্ড্রুজ ও মিঃ পীয়ার্সন এই সময়েই গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ সংগ্রামে যোগদান করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন। কয়েক সপ্তাহের জন্য হইলেও, গোখলে আফ্রিকায় না গেলে ভারতে আফ্রিকা সম্বন্ধে এমনিতর একটা চেতনা জাগিয়া উঠিত না।

মিঃ কলেনবেক ও মহামতি গোখলে

আফ্রিকার সত্যাগ্রহ সংগ্রাম দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু এই সংগ্রামে স্ত্রী-পুরুষ, যুবা-বালক, শ্রমিক, অস্পৃশ্যগণ সমবেতভাবে যে দৃঢ়তার, সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অসাধারণ। গান্ধীজীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সত্যাগ্রহীগণ কর্ত্তব্যে ছিলেন অবিচলিত। সহস্র নির্য্যাতনেও তাহাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আসে নাই, বিপদে তাহারা অধৈর্য্য হয় নাই। শত অত্যাচার তাহাদের উপর হওয়া সত্ত্বেও তাহারা হিংসাত্মক কার্য্যের দ্বারা প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করে নাই। এইজন্যই সংগ্রাম শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইয়াছিল। ১৯১৪ সালে বিখ্যাত গান্ধী-স্মাট্স চুক্তির ফলে আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দিগের উপর হইতে অমর্য্যাদাকর আইনসকল উঠিয়া যায়, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হয়। ১৯১৪ সালে তিনি ইংলণ্ড হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

দীর্ঘ কুড়ি বৎসরকাল গান্ধীজী আফ্রিকায় ছিলেন। যতদিন তিনি উপলব্ধি করিতেছিলেন যে ভারতীয়দিগের স্বার্থ ও মর্য্যাদারক্ষার জন্য আফ্রিকায় তাঁহার থাকা উচিত, ততদিন তিনি তথায় ছিলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি মনে করিলেন যে আফ্রিকায় তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়াছে এবং যাঁহারা সেখানে রহিয়াছেন তাঁহারাই যোগ্যতার সহিত তাঁহার আরব্ধ কার্য্য শেষ করিতে পারিবেন।

একদিন আফ্রিকার ভারতীয়গণ তাঁহাদের অপমানকর অবস্থার প্রতিকারের জন্য উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট ছিলেন। এই উদাসীন ভারতীয়দের মধ্যে স্বাধীনতার মর্য্যাদাবোধ, একটা চেতনাবোধ গান্ধীজী জাগাইয়াছিলেন—তাহা আমরা দেখিয়াছি। আফ্রিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে তিনি একথাটা বেশ ভালরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, যে মন্ত্রে তিনি আফ্রিকাবাসীদিগকে দীক্ষিত করিয়াছেন তাহার প্রভাব কোনদিন ক্ষীণ হইবার নহে। আফ্রিকার ভারতীয়েরা চিরদিন নিজেদের স্বার্থ ও স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য অবহিত থাকিবে।

আফ্রিকার কর্ম্মক্ষেত্রে, স্বাধীনতাযুদ্ধে নির্ব্বিরোধ সংগ্রামের শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া গান্ধীজী ভারত অভিমুখে রওয়ানা হইয়াছিলেন। আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের স্বাধীন সত্তা, মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গান্ধীজী অক্লান্ত পরিশ্রম করায়, ত্যাগ, নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও সাফল্যের পরিচয় দান করায় পরাধীন শৃঙ্খলিত ভারতে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। আফ্রিকার ভারতীয়দিগের শৃঙ্খলমোচনের জন্য গান্ধীজীর পরিকল্পনা ও কর্ম্মপদ্ধতি মহামতি গোখলে প্রত্যক্ষ করিয়া ভারতে ফিরিয়াছিলেন। তাঁহারই সহৃদয় সহায়তায় একথাটা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল যে ভারতীয়দিগের পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের জন্য গান্ধীজীর মত একজন কর্ম্মীর প্রযোজন রহিয়াছে।

সুতরাং আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলন গান্ধীজীকে রাজনীতিক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। তিনি নেতার সম্মান লইয়া······পরাধীন ভারতের লাঞ্ছনা মোচন করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়া, ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন তাঁহারই নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিবার সুযোগপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

তেত্রিশ

দেশের মাটি

করমচাঁদ গান্ধী স্বদেশের শান্তিময় কোলে ফিরিয়া আসিলেন।

আজ আমরা স্মরণ করিতেছি ১৮৯০ সালের সেই ছাত্র মোহনদাস গান্ধীকে, যিনি বিলাতের সভ্যতার বিলাসের মধ্যে অবগাহন করিয়াও বিলাসিতার পঙ্ক দেহে মাখেন নাই, যিনি ইউরোপের সভ্যতার মিথ্যা মোহকে বর্জন করিয়া সত্যের নূতন আলোর স্পর্শলাভের জন্য অশনবসন সমস্ত কিছুর আড়ম্বর বর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই;···আর এই সঙ্গে দেখিতেছি ১৯১৫ সালের করমচাঁদ গান্ধী। সত্যের আলো সত্যাগ্রহীর সামনে খুলিয়া দিয়াছে আর এক নূতন পথের দ্বার—অহিংসার শান্তিময় অথচ অসীম শক্তিশালী অস্ত্র!

সত্য ও অহিংসার অমৃত স্পর্শ তিনি আফ্রিকার কর্ম্মক্ষেত্রে পাইয়াছিলেন, সত্য ও অহিংসার কল্পনাতীত শক্তি ও সাফল্যে তিনি নিজেই তৃপ্ত অথচ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তবুও চিন্তা করিয়াছিলেন, "এই শক্তি কি আমার দেশ গ্রহণ করিবে, পথহারা ভারত কি অসত্য ও সর্ব্বনাশা হিংসার অন্ধকার হইতে সত্য ও অহিংসার আলোকে ফিরিয়া আসিবে?"

রাজা হরিশ্চন্দ্র······

সত্যরক্ষার জন্য রাজ্য দিলেন···ঐশ্বর্য্য দিলেন······প্রিয়তমা দিলেন··· আত্মজ দিলেন······

সত্যসন্ধ কাঙ্গাল হরিশ্চন্দ্র······

রিক্ত নিঃস্ব হইয়া দাঁড়াইলেন মৃত শ্মশানের চিরনির্জীব মৃত্তিকার উপর··· কিন্তু রিক্ত ও নিঃস্ব সত্যাগ্রহীর সত্যের অস্ত্র ঝলকিয়া উঠিল······

দাম্ভিক বিশ্বামিত্র পরাজিত হইলেন······

মৃত ও অন্ধকার শ্মশান জীবনের প্রদীপ জ্বালাইল······হাহাকারের মাঝে আনন্দের উচ্ছ্বাস জাগিল।

ব্যারিষ্টার মোহনদাস......সত্যরক্ষার জন্য সুখ ত্যাগ করিলেন......বিলাস ত্যাগ করিলেন......ঐশ্বর্য্য বর্জ্জন করিলেন...

সত্যসন্ধ কাঙ্গাল মোহনদাস......রিক্ত হস্তে দাঁড়াইলেন প্রাণহীন ভারতের চিরনির্জীব অসাড় মাটির উপর... ..

কিন্তু রিক্ত মোহনদাসের অস্ত্র কি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল ?......

বিংশ শতাব্দীর নবশক্তি ও জ্ঞানবলে বলীয়ান দাম্ভিক বিশ্বামিত্র কি পরাজিত হইয়াছিলেন ?..

উদ্যমবিহীন ও নির্জীব ভারতের মাটির উপর কি নবজীবনের উচ্ছ্বাস জাগিয়াছিল ? .....

আজ আমরা সকলেই ইহার উত্তর পাইয়াছি। তাই সেদিনের যুদ্ধ, সেদিনের জয় ও নবজীবন গঠনের ইতিহাস জানিবার জন্যই ১৯১৫ সালের ঘটনাপঞ্জী খুলিযা পড়িবার চেষ্টা করিতেছি। আফ্রিকার মাটিতে থাকিয়াই মোহনদাস সত্য কি, আর অহিংসা কি তাহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই নিপীড়িত ভারতীয়গণকে সত্য ও ন্যায্য অধিকার লাভে সজাগ করিয়াছিলেন, অহিংস প্রতিরোধের দ্বারা বিদেশে সহায়হীন ভারতীয়গণের শক্তি শতগুণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, প্রেমের যাদুমন্ত্রে অত্যাচারী প্রভু-গোষ্ঠীর ভিতর হইতেও বন্ধু ও ভক্ত শিষ্য লাভ করিয়াছিলেন।

এই আফ্রিকার অভিজ্ঞতাই তাঁহাকে আশান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহাকে ভারতের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল ! .. ...

তাঁহার অন্তর কহিল—

নিজবাসভূমে পরদেশী হযে
বন্ধনৈ কাল গেল যা'র ব'যে...

এই সত্যবলে—এই অহিংসাবলে তাহাদের শৃঙ্খলের বন্ধন কি মোচন করিতে পারিব না ?..কিন্তু তাঁহার অন্তরের সত্যই আবার কঠোর সমালোচনা করিল—"না, আমি সাম্রাজ্য-বিরোধী হইতে পারিব না। ব্রিটিশ জাতির সভ্যতার

উপর বিশ্বাস রাখিব। আমাদের অযোগ্যতাই আমাদের পরাধীনতার কারণ। কাজের দ্বারা—সত্যের দ্বারা আমাদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য দেখিলে বৃটিশ অবশ্য আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী স্বীকার করিবে এবং আমাদের মুক্তি দিবে।” আমরা স্রোতকে খাল হইতে একেবারে সমুদ্রের মোহানার মধ্যে টানিয়া আনিলাম। কথাটা খুলিয়াই বলি। সত্য ও অহিংসার বিকাশ সম্বন্ধে বলিতে বলিতে মোহনদাসের স্বদেশপ্রীতি আর স্বদেশ-উদ্ধারের কামনার বিশালক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তাহা ত আসিতেই হইবে। এই সত্যানুসন্ধান ও অহিংসাই যে তাঁহার হৃদয়ে দেশের কথা জাগাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু সত্যের যজ্ঞে তখনও অসহযোগের ঘৃত পড়ে নাই, তাই যজ্ঞের শান্ত শিখা সেদিনের রাজশক্তিকে পুড়াইবার বদলে তাহার আলোকে তাহাকে উজ্জ্বল করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল,...রাজশক্তির সাহায্য ও প্রতিদানে স্বদেশের মঙ্গল কামনা করিতে ও অন্ধকার দূর করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল!

বাস্তবিক—সেদিনের মোহনদাস গান্ধী রাজদ্রোহী ছিলেন না। ছিলেন রাজভক্ত অনুগত নাগরিক, ছিলেন আশাবাদী। আশা করিয়াছিলেন—ভারতের ও ভারতবাসীর সত্য ও ন্যায্য অধিকার ব্রিটিশ শাসক স্বীকার করিয়া লইবেন, এবং সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য শেষ পর্য্যন্ত ভারতকে সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি স্বাধীন ও স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্ররূপে পরিণত হইবার সুযোগ দিবেন। কিন্তু এই অধিকার-লাভের জন্য ভারতকে পরীক্ষা দিতে হইবে, ভারতকে আন্তরিকভাবে ব্রিটিশের সাহায্যকারী হইতে হইবে, ভারতকে বিশ্বস্ত ও যোগ্য হইতে হইবে।

১৯১৫ সালের নরমপন্থী মোহনদাস এই ধারণা লইয়াই সদ্য রোগমুক্ত রুগ্ন দেহে বোম্বাইযের বন্দরে অবতরণ করিলেন।

চৌত্রিশ

গোখলের উপদেশ

মোহনদাস গান্ধী বোম্বাইতে আসিলে তাঁহার গুণমুগ্ধ কতিপয় গুজরাটী তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য একটি সভার আয়োজন করিলেন। তখনকার দিনে ভারতীয়গণ ইংরাজি শিক্ষার মোহে এত মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন যে নিজেদের ঘরোয়া সভাসমিতিতে পর্য্যন্ত ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা দেওয়াটাকেই সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতেন। সেদিনের গুজরাটী সুধীগণও মনে করিয়াছিলেন যে আফ্রিকার সত্যাগ্রহী দলের শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও ব্যারিষ্টার মোহনদাস গান্ধীকে ইংরাজিতে সংবর্দ্ধনা জানানই বোধহয় শোভন হইবে। গান্ধীজী কিন্তু সভায় দেশীয় ভাষায় সংবর্দ্ধনার উত্তর দিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। নিজের আচরণের দ্বারা স্বদেশীয়দের যেন শিখাইলেন, ইংরাজী ভাষা যতই প্রয়োজনীয় হোক অথবা যতই সুললিত হোক, ভারতীয়গণের একান্ত ব্যক্তিগত মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে তাহার কোন প্রয়োজন নাই, তাহার কোনও মূল্য নাই।

গুজরাটীগণ তাঁহার আচরণে বিস্মিত হইলেন, লজ্জিতও হইলেন। বুঝিলেন, ইংরাজের মোহে মুগ্ধ থাকিয়া বা পাশ্চাত্য ভাবধারায় ডুবিয়া থাকিয়া দেশের কোন কাজই করা উচিত নহে। কৃত্রিমতা দ্বারা দেশের সেবা করা যায় না।

মোহনদাস গান্ধী শুনিলেন মহামতি গোখলে বোম্বাইতে আছেন। গোখলে তাঁহার বাগ্মিতায়, তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যে ও তাঁহার নির্ভীকতায়, তাঁহার শিশুর মত সরল ব্যবহারে পূর্ব্বেই মোহনদাসের মন হরণ করিয়াছিলেন। মোহনদাস এই উদার-প্রাণ বিরাট ব্যক্তিটিকে মনে মনে গুরুর আসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

আগেই জানিয়াছি বিদেশের কাজের মধ্য দিয়া স্বদেশের সেবার আকাঙ্ক্ষা মোহনদাসের অন্তরে জাগিয়াছিল। কিন্তু আফ্রিকায় কর্ম্ম-বাহুল্যের জন্য

তিনি স্বদেশের সমস্যা ও প্রয়োজনের দিকে মন দিতে পারেন নাই, স্বদেশে একটানা ভাবে দীর্ঘদিন বাস করিতে পর্য্যন্ত পারেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, দেশের প্রতি ভালবাসা থাকিলেও দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা ও ত্রুটির বিষয়ে তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান নাই, তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় নাই। আর বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই প্রথমেই দেশের সেবায় অগ্রসর না হইয়া দেশসেবার পথটিকে জানিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মোহনদাসের অন্তর বলিল, এই পথ তাঁহাকে দেখাইয়া দিতে পারেন শুধু মহামতি গোখলে। মোহনদাস আদর্শলাভের আশায় গোখলের সহিত দেখা করিলেন।

গোখলে তখন বিশেষ পীড়িত। কিন্তু শয্যাশায়ী গোখলে মোহনদাসকে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তাঁহাকে একান্ত স্নেহের সঙ্গে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। গোখলে স্নেহের বাঁধনে মোহনদাসকে বাঁধিলেন। দেশসেবার জন্য প্রতিষ্ঠিত তাঁহার 'সার্ভেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া' নামক সমিতির মধ্যেও মোহনদাসকে আনিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সমিতির অন্যান্য সভ্যগণ মোহনদাসের নিজস্ব কর্ম্মপ্রণালী ও আদর্শের জন্য তাঁহাকে সমিতির মধ্যে গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিলেন। গোখলে ইহা বুঝিলেন, মোহনদাসও ইহা বুঝিলেন। গোখলে তাই আর মোহনদাসকে জড়াইতে চেষ্টা করিলেন না। আর মোহনদাসও বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সমিতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মতভেদের সংঘর্ষ তুলিয়া সভ্যগণের ও গোখলের মনঃপীড়ার কারণ হইতে ইচ্ছা করিলেন না। তাই তিনি গোখলের আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও দুঃখের সঙ্গে তাঁহার অনিচ্ছার কথা জানাইলেন।

এখানে একটি প্রশ্ন মনে জাগে। সমিতির সকল সভ্যই ব্যক্তিগতভাবে মোহনদাস গান্ধীকে শ্রদ্ধা করিতেন বা স্নেহ করিতেন, কিন্তু তবুও তাঁহারা তাঁহাকে সমিতির মধ্যে গ্রহণ করিলেন না কেন ?······

উত্তর দিতে গেলে মনে হয়, কর্ম্মধারার ও চিন্তার পার্থক্যই বোধ হয় এই বিভেদের একমাত্র কারণরূপে বর্ত্তমান ছিল। সোসাইটির সভ্যগণ মনে

করিতেন, শুধু প্রতিবাদ করিয়াই কিংবা প্লাটফর্ম্মের উপর হইতে বক্তৃতা করিয়াই, আর সংবাদপত্রের মারফৎ ইংরাজ সরকারের নিকট নিজেদের দাবী জানাইয়াই তাঁহারা দেশের সেবা করিতেছেন। ইহার অপেক্ষা অন্য কোন উন্নততর উপায়ে দেশের কাজ আর কেহ করিতে পারে না, করিলেও সেই কাজকে তাঁহারা ভাল বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না। সেইজন্যই মতভেদের বিরাট সমুদ্র সৃষ্টি হইল দুইটি পক্ষের মধ্যে।

মোহনদাসের ইচ্ছা, প্রয়োজন হইলে প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন, অসীম শক্তিশালী সরকারকে যুদ্ধে আহ্বান করিবেন। তাঁহার আফ্রিকার সত্যাগ্রহ তাঁহার এই ইচ্ছাকে সভ্যগণের নিকট সহজেই ব্যক্ত করিয়া দিয়াছিল। ইহা ছাড়া, সভ্যগণ তখন ধারণা করিতেই পারেন নাই যে, কেবলমাত্র সত্যাগ্রহের দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী শাসককে কেমন করিয়া বিতাড়িত করা যায়! আর বিতাড়ন?……

বিতাড়নের কথা তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তাঁহারা কল্পনা করিতেন, আবেদন-নিবেদনের দ্বারা সরকারের মন নরম করিবেন, শাসন-বিষয়ে কিছু সংস্কার করিবেন, সংস্কারের দ্বারা কিছু অধিকার লাভ করিবেন।

ভস্মের তলায় ঢাকা আগুনের শিখা……বোঝা যায়, অনুকূল বাতাস আসিলেই ভস্ম ভেদ করিয়া শিখার তেজ জ্বলিয়া উঠিবে…

জঞ্জাল ও আবর্জ্জনাকে দগ্ধ করিবে।

'সার্ভেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র সভ্যগণ এই শিখাকে দেখিতে পান নাই, কিন্তু গুণগ্রাহী গোখলে ইহা দেখিয়াছিলেন। তাই তিনি মোহনদাসকে সোসাইটির মধ্যে আশ্রয় না দিয়া নিজের অন্তর-মধ্যে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সেদিন গোখলে সস্নেহে বলিয়াছিলেন, তোমার "আদর্শের পার্থক্যের জন্য সভ্যগণের সঙ্গে তোমার মিল হইল না। কিন্তু তুমি সোসাইটির সভ্য হও আর না হও, আমি অন্তরে তোমাকে আমাদেরই একজন বলিয়া মনে করিব।"

গোখলের উপদেশ

স্নেহমুগ্ধ মোহনদাস জানাইলেন, গোখলের স্নেহ তিনি কোনদিন ভুলিবেন না।

দেবতার সহিত দেবতার মিলন হইল···

শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনের মিলন হইল!

গুরুর সহিত শিষ্যের বন্ধুত্ব হইল!

গোখলেকে আমরা মোহনদাস গান্ধীর গুরুই বলিব। কারণ এই উদার সরলপ্রাণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটির চরিত্র মোহনদাসের মনে নীতি ও শ্রদ্ধার ভাব জাগরিত করিয়াছিল।

গোখলের ইচ্ছা অনুসারে সোসাইটির সভ্যগণ মোহনদাসকে একটি ভোজে সম্মানিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। মোহনদাসের সহিত মত ও আদর্শের মিল না হইলেও, তাঁহারা তাঁহার বিনয় নম্র ব্যবহারে ও অকপটতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মোহনদাস মাংস ও খাদ্যশস্য বর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা মোহনদাসের সুবিধার জন্য ভোজে কেবলমাত্র ফলাদির আয়োজন করিলেন। ভোজসভায় মোহনদাস সোসাইটির সভ্যগণের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ও আপ্যায়িত হইলেন।

একদিন গোখলে জানিতে চাহিলেন কি ভাবে মোহনদাস ভারতবর্ষে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে বিস্তার করিতে চান। মোহনদাস জানাইলেন, সঠিক কোন কিছু করিবার আগে তিনি আফ্রিকায় ফিনিক্সের অথবা টলষ্টয় আশ্রমের আদর্শ ও প্রণালীমত একটি আশ্রম সর্ব্বপ্রথমে স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন।

ফিনিক্সের আশ্রম ও টলষ্টয় আশ্রম সম্বন্ধে আমরা আফ্রিকার সত্যাগ্রহ বিবরণে প্রায় সবই জানিয়াছি। মোহনদাস যখন আফ্রিকা ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে বাস করিবার ব্যবস্থা করিলেন, তখন তিনি তাঁহার ফিনিক্সের আশ্রমবাসীদেরও ভারতে আনিবার ইচ্ছা করিলেন। আশ্রমের বিশিষ্ট অধিবাসী মহামতি এণ্ড্রুজ সাহেব, মগনলাল গান্ধী, সদাশয় পীয়ার্সন প্রভৃতি

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও তাঁহার সহিত ভারতবর্ষে আসিয়া কর্মক্ষেত্র রচনা করিতে ইচ্ছা করিলেন। সকলেরই ইচ্ছা, ভারতের কোন নির্জ্জন শ্যামল প্রান্তরে আশ্রম বাঁধিবেন, সরল প্রকৃতির মধ্যে সরল ও আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করিবেন, শান্ত আশ্রমের শান্ত আবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া নীরবে মনুষ্যত্বের সাধনায় মগ্ন হইবেন। কিন্তু শুধু ইচ্ছা থাকিলেই আশ্রম স্থাপনা করা যায় না। আশ্রমের জন্য ভূমি চাই, অর্থ চাই, প্রাথমিক ব্যবস্থাদি চাই। অবশ্য ভূমির ভাবনা বা অভাব প্রথমে থাকিলেও পরে আর তাহা রহিল না। আফ্রিকার 'স্মাটস্‌জয়ী সত্যাগ্রহী গান্ধীর' কথা তখন সাধারণ ভারতবাসীগণ না জানিলেও শিক্ষিত ও দেশহিতৈষী অধিকাংশ ভারতীয় তাহা বিশেষভাবে জানিতেন। সেইজন্য গান্ধী যখন ভারত-ভ্রমণে বহির্গত হন, তখন বহু ধনী ও নেতার নিকট হইতে প্রয়োজনীয় ভূমি ও স্থান দানের প্রস্তাব আসিয়াছিল।

গান্ধীজী ভারতে আসিয়া প্রথমে যে কাহারও নিকট হইতে সাহায্য পাইবেন এমন ভরসা করিতে পারেন নাই। অথচ তাঁহার এবং ফিনিক্সের আশ্রমবাসীগণের একান্ত ইচ্ছা ভারতে নীড় বাঁধিবেন। তাই আজ গোখলের জিজ্ঞাসায় গান্ধীজী তাঁহার প্রিয় আশ্রমটির স্থিতির ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।'

আশ্রমের গঠনের ও কার্য্যের ইতিহাস শুনিয়া গোখলে ত মহা খুশি! তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'তুমি অবশ্যই ঐ আশ্রম করিবে। ··তোমার আশ্রমের জন্য যাহা আবশ্যক তাহা আমার নিকট হইতে লইবে, উহা আমারই আশ্রম বলিয়া আমি গণ্য করিব।'

বিস্মিত গান্ধীজীর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। তাঁহার মুগ্ধ অন্তর জানাইল—'আমার কর্ম্মে আজ আমি একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায় পাইলাম, আমার যাত্রাপথে একজন দক্ষ পথপ্রদর্শকের দর্শন পাইলাম।'

দুশ্চিন্তার কুয়াশা ভেদ করিয়া বিশ্বাসের আলো ফুটিল!

মোহনদাস গান্ধী এবার গোখলের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

শয্যাশায়ী গোখলে চোখ বুজিয়া কি একটু চিন্তা করিলেন, পরে হাসিয়া বলিলেন, 'এখন কোথায় যাইবে ?'

গান্ধী বলিলেন, 'রাজকোটে—বড় ভাইয়ের বাড়ী।'

গোখলে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আমি ভাবিলাম, বুঝি এবার ভারত সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিতে যাইবে!'

গান্ধী সরলপ্রাণ গোখলের হাসিতে যোগ দিলেন। বলিলেন, 'এখন আর তা হচ্ছে কই। যুদ্ধে সরকারের সাহায্য করার জন্য উল্টে সরকার যে আজ আমাকে উপাধি দান করেছেন।'

গান্ধীজী এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিয়া ব্রিটিশ সরকারকে যুদ্ধের সময়ে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি হইয়াছিল এবং তিনি তিনি 'কাইজার-ই-হিন্দ' নামক উপাধিদ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন।

গান্ধীজীর কাছে গোখলে সব শুনিলেন। তারপর বলিলেন, 'কিন্তু আমি দেখিতেছি, আজ যে সরকাব তোমায় সম্মান করিতেছেন, দুইদিন বাদে তাঁহারাই আবার তোমাকে বন্দী করিবেন। যে আদর্শে তুমি সরকারকে সেবা করিয়াছ, সেই আদর্শের জন্যই একদিন তুমি সরকারকে আবার যুদ্ধে আহ্বান করিবে। তুমি ত তোমার সত্যের দ্বারা সব কিছু বিচার করিবে ?'

গান্ধীজী সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়িলেন। একটু বাদে গোখলে আবার বলিলেন, 'তবে এ বিষযে তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।' জিজ্ঞাসুভাবে গান্ধীজী গোখলের দিকে চাহিলেন। গোখলে বলিলেন, "ভারতের আর ভারতবাসীর জন্য কোন কাজ করিবার আগে তুমি একবার ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ কর। কারণ এখানে তোমার কর্ম্মক্ষেত্র দক্ষিণ আফ্রিকার মত মাত্র কয়েক হাজার ভারতবাসী লইয়া নহে—এখানে চল্লিশকোটি ভারতবাসীকে লইয়া তোমায় কাজ করিতে হইবে। সেইজন্য বলিতেছি, চল্লিশকোটির সেবা করিতে হইলে তোমার মত কর্ম্মীর চল্লিশকোটিকে যতদূর

সম্ভব জানা ভাল। সমগ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানের ভারতবাসীর কি অভাব-অভিযোগ, কি দুঃখকষ্ট আগে তাহা জানা উচিত।”

গান্ধীজী গোখলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সত্যাশ্রয়ী মোহনদাসের মনে হইল, ‘সত্যইত, দেশকে সেবা করিতে হইলে, দেশকে তো আগে জানা দরকার। শুধু বোম্বাই সহর আর রাজকোট বেড়াইলে বিশাল ভারতবর্ষ ও তাহার কোটি কোটি অধিবাসীদের জানা যাইবে না। আগে ভারতের অভাব জানিতে হইবে, সাধ্যমত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে।’

গান্ধীজী ভারতে তাঁহার আদশ অনুসারে কাজ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের ধারা তখনো স্থির করেন নাই। গোখলে যেন তাঁহার সেই ধারাটিকে দেখাইয়া দিলেন।

গান্ধীজী সন্তোষের সহিত গোখলেকে জানাইলেন যে তিনি গোখলের উপদেশ পালন করিবেন। রাজকোট ঘুরিয়া আসিযা সাধ্যমত সমস্ত ভারত পরিভ্রমণ করিবেন।

পীড়িত গোখলে তৃপ্তির সহিত হাসিতে লাগিলেন। গান্ধীজীও হাসিমুখে জানাইলেন যে আজ তিনি চলিয়া যাইতেছেন, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক সমস্যায় তিনি এমনি করিয়া বারবার তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিবেন।

গোখলে বলিলেন, ‘যতবার ইচ্ছা আসিও। আমার কাছে তোমার দ্বার ত খোলা।’

শিশুর মত সরল কিন্তু দেবতার মত মহান্ একটি হৃদয়কে প্রণাম করিযা মোহনদাস গান্ধী তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

এখানে আর একটি মাত্র কথা জানাইয়া গান্ধীজীর ভারত-ভ্রমণের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব। আগেই জানিয়াছি, তাঁহার আফ্রিকার ইতিহাস-বিখ্যাত সত্যাগ্রহের দ্বারা তিনি ব্রিটিশ সরকারের কোপদৃষ্টি আকর্ষণ করিবাছিলেন, আবার প্রথম মহাযুদ্ধে সরকারকে সাহায্য দ্বারা সরকারের শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ইংরাজ সরকার গান্ধীর

উদ্দেশ্যের সন্ধান পান নাই, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের সত্য ও অকপটতার সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাই গান্ধী যখন বিলাত হইতে বোম্বাইয়ে আসিলেন তখন বোম্বাইয়ের শাসনকর্ত্তা [লর্ড উইলিংডন্ তখন (১৯১৫) বোম্বাইয়ের গভর্ণর ছিলেন] গান্ধীজীকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান করিলেন। গান্ধীজী শাসনকর্ত্তার সহিত দেখা করিলেন। শাসনকর্ত্তা এ'কথা সে'কথা বলিবার পর গান্ধীজীকে বলিলেন,—একটা কথা আপনাকে বলিতেছি, সরকারের বিরুদ্ধে আপনাকে যদি কখনও যাইতে হয়, তাহা হইলে আমার সঙ্গে প্রথমে দেখা করিয়া, কথা বলিয়া যাহা হয় তাহা করিবেন। ইহা আমার অনুরোধ।" গান্ধীজী বলিলেন, একথা আমি সহজেই আপনাদের দিতে পারি। কারণ সত্যাগ্রহী হিসাবে আমার এই নিয়ম যে, কাহারও বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইলে, তাহার দৃষ্টিতে জিনিসটা জানা ও যতটা তাহার অনুকূল হওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই নিয়ম আমি পালন করিয়াছি ও এখানেও তাহাই করিব।

শাসনকর্ত্তা তাঁহার মনোভাব জানিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। গান্ধীজী ফিরিয়া আসিলেন।

এখানে গান্ধীজীর কার্য্যধারা সম্বন্ধে আরও একটু জানা দরকার। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ এক অপূর্ব্ব ও বিচিত্র অস্ত্র! তাঁহার এই সত্যাগ্রহ লইয়া বর্ত্তমানে পৃথিবীতে কি আলোচনা হইতেছে, আমরা জানি না, কিংবা ভবিষ্যতে ইহার কি ব্যাখ্যা হইবে তাহাও জানিতে চাহি না; তবে এইটুকু জানি, অন্ততঃ তাঁহার নিজের কথায় জানি যে, তিনি যাহার বিরুদ্ধে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিতেন, আগে তাহাকে ভাল করিয়া চিনিয়া লইতেন। তাহার স্বভাব ও কার্য্যধারা অনুধাবন করিতেন। শুধু তাহাই নয়, তাহার রুদ্ধে সংগ্রাম করিবার পূর্ব্বে তাহার হৃদয়ের পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার (গান্ধীজীর) ইচ্ছা ও দাবীর প্রতি তাহাকে সহানুভূতি-সম্পন্ন করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। তাহাকে তাঁহার উদ্দেশ্য

জানাইতেন, দাবী জানাইতেন, দাবী পূর্ণ করিবার জন্য তাহার বিবেককে অনুরোধ করিতেন, প্রয়োজন হইলে বিনীতভাবে তাহার নিকট প্রার্থনাও করিতেন। কিন্তু যখন আপোষ ও প্রার্থনার পালা শেষ হইয়া যাইত, তখন পৃথিবীর এই প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সত্যাগ্রহীর কর্ম্মপ্রণালীও স্থির হইয়া যাইত। কেবল মাত্র তখনই—সেই নিরুপায় অবস্থার মধ্যে তিনি তাহার বিরুদ্ধে তাঁহার সত্যাগ্রহ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেন, তাহাকে সত্য ও নীতির দিক দিয়া পরাজিত করিতেন।

তাঁহার 'সত্যাগ্রহ-ধারা' আলোচনা করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই,—তবে তাঁহার ভবিষ্যতের কার্য্য-প্রণালীগুলি বর্ণনা করিবার জন্য আমরা এইখানে তাঁহার সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে জগতের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক 'রোমাঁ রোলাঁ' কি বলিয়াছিলেন তাহা জানিয়া রাখিব। রোমাঁ রোলাঁ বলিযাছেন,—"তাঁহার আন্দোলনের মূল কথা হইল 'সক্রিয় প্রতিরোধ'—প্রেমের দ্বারা, বিশ্বাসের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা। এই ত্রয়ী শক্তিই প্রকাশ লাভ করিয়াছে 'সত্যাগ্রহ' কথাটির মধ্যে"……গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে রোমাঁ রোলাঁ আর এক জায়গায বলিয়াছেন—"তিনি কখনো আপোষের মধ্যে আসেন না, কখনো কূটনীতির আশ্রয় লন না, কখনো বক্তৃতায় মাৎ করিতে চান না।……নির্জ্জন নিঃশব্দে থাকিতে তিনি ভালবাসেন, কারণ তখন তিনি বিধাতার নীরব নির্ম্মল বাণী শুনিতে পান।"

মনীষী রোলাঁ মহাত্মার সত্যাগ্রহের রূপ পূর্ণভাবে দেখিয়াছিলেন। সত্য কখনও আপোষ করে না। সত্য কখনো অন্যায় ও মিথ্যা চাতুর্য্য-পূর্ণ কূটনীতি স্পর্শ করে না, কখনো বক্তৃতার জয়ঢাক পিটাইয়া নিজের যুক্তিকে ছড়াইয়া দিতে চাহে না। সত্যাগ্রহী অকপট হৃদয়ে সত্যকে গ্রহণ করিয়া নির্ভয়ে নিজের পথে অগ্রসর হইয়া যায়! গান্ধীজীর জীবনে এই স্বভাব ও কার্য্যধারা আমরা কতবার দর্শন করিয়াছি।

পঁয়ত্রিশ

ভারত-ভ্রমণ

দীর্ঘ পথ······

পথে বাধা······কষ্ট······ভয় ·· ·

দৃঢ়চিত্ত পথিক অগ্রসর হয়·····

বাধা দূর করে······কষ্ট বরণ করে ·· ··ভযকে জয করে ···

পথের শেষে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হয।

জীবনের দীর্ঘ পথ······

পথে কত বাধা আসিবে······কত কষ্ট······কত ভয··· ·

দৃঢ়চিত্ত মোহনদাস গান্ধী···সত্যাশ্রয়ী মোহনদাস গান্ধী······

পথে অগ্রসর হইলেন······

বাধা কি দূর করিবেন ?

কষ্ট কি বরণ করিবেন ?

বিপদ কি জয় করিবেন ?

গান্ধীজীর ভ্রমণের ইতিহাস হইতেই আমরা তাঁহার পথের বাধা, কষ্ট ও বিপদ-জযের ইতিহাস জানিতে পারিব।

মোহনদাস গান্ধী তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করিতে রাজকোটে চলিলেন। বোম্বাই হইতে 'ওয়াড়াওয়ান' নামক একটি 'রেলষ্টেশনে' আসিলেন। ষ্টেশনে রাজকোটগামী গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময় একটি যুবক আসিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার নামই কি মোহনদাস গান্ধী ?'

মোহনদাস মিষ্ট হাসির সহিত মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিলেন। যুবকটি বলিল, 'আপনার আফ্রিকার কথা আমরা শুনিয়াছি। তাই এখানকার

একটা মস্তবড় অন্যায় আর অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য আপনার কাছে আবেদন করিতেছি।'

মোহনদাস তেমনিধারা হাসিয়া বলিলেন, 'আমি এখানে আসিব, জানিলেন কেমন করিয়া?'

যুবক বলিল, 'আমার নাম মতিলাল, আমি এখানে দরজির কাজ করি। আমরা বোম্বাই হইতে আপনার সংবাদ লইতেছিলাম, তাই জানি, আপনি আজ এখানে আসিবেন।' মোহনদাস বলিলেন, 'বলুন, আপনাদের কথা, আমি নিশ্চয়ই শুনিব।'

মতিলাল বলিল, 'এখানকার রেল-যাত্রীদের দুর্দ্দশার কথা কিছু জানাইব। এই স্থান হইতে যত যাত্রী বাহিরে গমনাগমন করে, রেলের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের জিনিসপত্রাদির উপর অসম্ভব শুল্ক ও বিশেষ ভাড়া দাবী করে। মাল অল্প হইলেও রেহাই দেয় না, আর শুল্ক না দেওযার অপরাধে রেলের কর্ম্মচারীগণ গরীব যাত্রীদের নিকট হইতে জোর করিয়া ঘুষ আদায় করে। ঘুষ না দিলে অত্যাচার করে, গালাগাল দেয, বিশ্রামাগারে আটকাইয়া রাখে। এইসব দুর্নীতি এখানকার যাত্রীদের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিযাছে। আমাদের অনুরোধ, আপনি ইহার প্রতিকার করুন।'

মোহনদাস একটু ভাবিলেন।

আবার মুখ তুলিযা বলিলেন, 'প্রতিকার আমি করিতে পারি না, পারেন আপনারা। তবে আমি উপায় দেখাইতে পারি মাত্র। আপনারা, এখানকার জনসাধারণ, দরকার হইলে জেলে যাইতে পারিবেন?'

যুবক শান্তভাবে উত্তর দিল, 'খুব পারিব, আমরা অন্যায়ের আর অত্যাচারের শেষ চাই'। গান্ধীজীর মনে বিদ্যুতের স্পর্শ লাগিল।......'এইত অখ্যাত অজ্ঞাত ওযাড়াওয়ানের যুবকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে, মিথ্যার বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার সাহস জাগিয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্র অন্যায অধর্ম্ম অত্যাচারের বিরুদ্ধে এমনিতর একটা সুতীব্র অনুভূতি একবার

জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই ত তিনি আফ্রিকার সত্যাগ্রহ অভিযানের মত এক শক্তিশালী অভিযান এদেশে সুরু করিতে পারিবেন!

গান্ধীজীর মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

মনের আশা আর আনন্দকে মনে দমন করিয়া উপরে শান্তভাব প্রকাশ করিয়া তিনি জানাইলেন, 'বেশ, রাজকোট হইতে ফিরিয়া আমি আপনাদের সহিত মিলিত হইব এবং ইহার প্রতিকারের জন্য অবশ্যই চেষ্টা করিব।'

যুবক মতিলাল বলিল, 'এখানকার যুবকদের এবিষযে উৎসাহ দেখিয়া আপনি খুশি হইবেন। এখানকার কাজ ছাড়া যদি অন্য কোন কাজে কোনদিন আপনি আমাদের গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আপনাব সহিত কাজ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ পাইব।'

তখনকার মত মতিলাল বিদায় লইল।

গাড়ী শীঘ্রই আসিবে জানিযা গান্ধীজী তৃতীয শ্রেণীর টিকিট কিনিতে গেলেন।

টিকিট কাটাইবার সময শুনিলেন, গাড়ী হইতে গন্তব্যস্থলের ষ্টেশনে নামিবার পর স্থানীয রেলের চিকিৎসকের নিকট তাঁহাকে তাঁহার স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করাইতে হইবে, কারণ তখন ওয়াড়াওযানে•ও আশেপাশে প্লেগ হইতেছিল,...প্লেগের বিস্তার অন্যদেশে নিবারণ করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ এই স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

গান্ধীজী এই ব্যবস্থায দুঃখিত হইলেন না, কিন্তু ব্যবস্থার ত্রুটি জানিয়া দুঃখিত হইলেন। ত্রুটি দুইরকমের ছিল, প্রথমতঃ অন্যান্য উচ্চতর শ্রেণীর যাত্রীদের এই পরীক্ষা দিতে হইত না, দ্বিতীয়তঃ তৃতীয শ্রেণীর দরিদ্র ও নিরীহ যাত্রীদের পরীক্ষার নামে এত বেশী উৎপীড়ন ও অবিচার করা হইত, যাহা মানুষে মানুষের প্রতি করিতে পারে না।

গান্ধীজীর আফ্রিকার কথা স্মরণ হইল।

দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি গাড়ীতে উঠিলেন।

গাড়ীতে উঠিয়া আবার তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অবস্থা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সরু সরু খানকয়েক কাঠের বেঞ্চির উপর মানুষগুলি ঠাসাঠাসি করিয়া বসিয়া আছে, যেন বোচকা-বুঁচকীগুলিকে যতদূর সম্ভব গায়ে গায়ে ঠাসিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাহারও ঘাড়ে কাহারও পা,...কাহারও পিঠে কাহারও মাথা! আবার যাহারা বসিবার এই সৌভাগ্যটুকুও লাভ করিতে পারে নাই, তাহারা দাঁড়াইয়া আছে।

দাঁড়াইয়া আছে ঐ পর্য্যন্ত...কিন্তু নিজের কোন অবলম্বন, কোন ভারসাম্য নাই। ভীড়ের চাপে পিষ্ট হইয়া, এদিকে-ওদিকে বিক্ষিপ্ত নিজেদেরই থুথু, কফ, ধূলা প্রভৃতি নোংরায় ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া, পাশের পায়খানার মলমূত্রের দুর্গন্ধে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়া, একজন আর একজনের ঘাড়ে ..একজন আর একজনের পিঠে...একজন আর একজনের বুকে অবলম্বন করিয়া কোনরকমে খোঁয়াড়ের ভেড়ার মত অসহায়ভাবে দাঁড়াইয়া আছে!

গান্ধীজীও তাহাদের যন্ত্রণা ও দুর্দ্দশার একজন সাথী হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, এই অবস্থা, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের এই দুর্দ্দশা কাহার জন্য?... বুঝিতে পারিলেন, ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী রেল কর্তৃপক্ষ। তাঁহারা মনেই করেন না যে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরাও 'মানুষ'। তাই তাঁহারা ধনীদিগের জন্য সুন্দরব্যবস্থাবিশিষ্ট সুন্দর গাড়ীগুলির ব্যবস্থা করেন। আর মানুষ হইয়াও দরিদ্র হওয়ার জন্য মানুষের অধিকারে বঞ্চিত এই পশুতুল্য আরোহীদের জন্য এই ব্যবস্থাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন।...কিন্তু এই অবস্থার জন্য আরোহীদের নিজেদেরও কতকটা ত্রুটি আছে। তাহারা গাড়ীর মধ্যে কষ্ট পায়, তবু আর একজন আরোহীকে জায়গা থাকিলেও জায়গা না দিয়া কষ্ট দেয়,...তাহারা ঠাসাঠাসি করে,...পরস্পর গালাগালি দেয়...নিজের জায়গা প্রয়োজনের অতিরিক্ত দখল করিয়া নেয়, নিজেদের দুর্দ্দশা বৃদ্ধি করিবার জন্য থুথুতে, খাদ্যের উচ্ছিষ্টে, কাগজের পাতায় কামরাখানিকে অস্বাস্থ্যকর ও দুর্গন্ধযুক্ত করে!

গান্ধীজীর চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল, আফ্রিকার তৃতীয় শ্রেণীর সেই

একই অবস্থার চিত্র। দেশের দরিদ্র-সাধারণের প্রতি কর্তৃপক্ষের এই অবিচারে···দরিদ্র দেশবাসীর আপন ত্রুটিতে, তাঁহার হৃদয় বেদনার আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িল!

তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন, ইহার কি কোন প্রতিকার নাই, তৃতীয় শ্রেণীর এই অজ্ঞ ও অসহায় যাত্রীগণের দুঃখ-মোচনের কি কোন উপায় নাই? ···গাড়ীর মধ্যে এত কষ্ট পাইয়াও তাহাদের কষ্টের শেষ হয় না, কর্ম্মচারীরা ইহাদের পয়সা লুট করে, টিকিট দিতে হয়রাণ করে, দেরি করাইয়া ট্রেণ ফেল করায়, কোন কথা বলিতে গেলে গালাগালি দেয়, প্রহার করে!······এই সব অনাচারের কি কোন প্রতিবিধান নাই?

ইহার প্রতিকার ও প্রতিবিধানের উপায় তাঁহার অন্তরে জাগিল। তিনি বুঝিলেন, ইহার প্রথম প্রতিকারের উপায় রহিয়াছে যাত্রীদেরই হাতে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণ যদি নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হন, নিজেদের সুখ-সুবিধার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট সঙ্ঘবদ্ধভাবে দাবী করেন, তাহা হইলে কতকটা ব্যবস্থা অবশ্যই হইতে পারে। কিন্তু এই অবিচারের খুব সন্তোষজনক প্রতিকার করিতে পারেন দেশের ধনী ও শিক্ষিতের দল। অসহায় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কথা স্মরণ করিয়া, যাত্রীদের অজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়া, সমবেদনাপূর্ণ হৃদয় লইয়া যদি ধনবান ও শিক্ষিতগণ তৃতীয় শ্রেণীতে গরীবের মত ভ্রমণ করেন এবং যাত্রীর ন্যায্য অধিকার ও পাওনার বিষয়ে দাবী করেন; অত্যাচার অসুবিধাগুলি নীরবে সহ্য না করিয়া উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, বিদ্রোহ করেন—তাহা হইলে কর্তৃপক্ষের অনেক সময় চৈতন্য হইবে, দায়িত্ব-বোধের কথা মনে হইবে। কর্তৃপক্ষ নিজ অপরাধ সংস্কারের জন্য সজাগ হইবেন।

সেইদিন রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে বসিয়া যাত্রীদের দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি যে প্রতিকার অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা ভবিষ্যৎ জীবনে বহুবার দেশ-বাসীর নিকট প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রচারে দেশে সম্পূর্ণ চৈতন্য

না জাগিলেও একটা আলোড়ন জাগিয়াছিল,…আর সেই আলোড়নের ফলে কর্ত্তৃপক্ষও কতকটা সতর্ক হইলেন, মধ্যে মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর অসুবিধার কিছু সংস্কার করিলেন এবং অধিকতর সংস্কারের আশা দিলেন। বৃটিশ শাসনে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর দুর্দ্দশা দূর হয নাই,—আশা করি, আমাদের জাতীয় সরকার মহাত্মার হৃদয় স্মরণ করিয়া, নিজ দেশের কোটি কোটি দরিদ্র মানুষের হৃদয় স্মরণ করিয়া এই অসুবিধাগুলি সমূলে ধ্বংস করিবেন।

দরিদ্র-বন্ধু মোহনদাস গান্ধী রাজকোট ষ্টেশনে গাড়ী হইতে নামিলেন। স্বাস্থ্য-পরীক্ষার জন্য ষ্টেশনের চিকিৎসকের নিকট গেলেন। চিকিৎসকটি কিন্তু তাহার কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া তাঁহার পরিচয় জানিতে পারিলেন। তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন, গান্ধীজীকে পরীক্ষার বিড়ম্বনা হইতে মুক্তি দিলেন।

নিজে মুক্তি পাইলেন, কিন্তু দরিদ্র অসহায ভাইযেদের পীড়নের চিন্তা অন্তরে পীড়া দিতে লাগিল।

রাজকোট হইতে আবার ওযাড়াওযানে আসিলেন। মতিলাল ও অন্যান্য যুবকদের সহিত দেখা হইল। তিনি তাহাদের জানাইলেন, আগে আমি কর্ত্তৃপক্ষকে এ বিষযে জানাইব এবং প্রতিকার প্রার্থনা করিব। আশা করি, তাঁহারা এই অন্যায় বুঝিতে পারিবেন, এবং প্রতিকার করিবেন। কিন্তু যদি তাঁহারা ইহা স্বীকার না করেন, তাহা হইলেই আপনাদের কাজে নামিতে হইবে।

যুবকদল তাঁহার প্রণালীমত অপেক্ষা করিবে স্বীকার করিল।

গান্ধীজী স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যকলাপ বর্ণনা করিয়া দিল্লীর কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষকে পত্র দিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ প্রথমে ইহাতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিলেন না, কিন্তু গান্ধীজীও সহজে ছাড়িলেন না। প্রায় দুইবৎসর ধরিয়া এই বিষয়ে পত্রালাপ চলিল, অবশেষে লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের সহিত তাঁহার যখন সাক্ষাৎ হইল, তাঁহার নিকট তখন তিনি রেলকর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের অভিযোগ জানাইলেন। চেমস্‌ফোর্ড ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলেন। তিনি অনুসন্ধানের ফলে স্থানীয় কর্ম্মচারীদের অন্যায় দুর্নীতির কথা জানিতে পারিলেন, যাত্রীদের মালের শুল্ক-গ্রহণ প্রথা তুলিয়া দিলেন।

ওয়াড়াওয়ানের যুবকদল মুগ্ধ হইল। তাহারা এই নাছোড়বান্দা কর্ম্মীটির সঙ্গে যুক্ত হইয়া কাজ করিতে চাহিল। গান্ধীজী জানাইলেন, তিনি তাহাদের অবশ্যই কাজ দিবেন। ভারত ভ্রমণ করিয়া আসিবার পর তিনি তাহাদের আহ্বান করিবেন। গান্ধীজী পরে এই যুবকদের অনেককে সবরমতীর সত্যাগ্রহ আশ্রমে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইযা আশ্রমের অনেক কাজ করিয়াছিল।

ইহার পর মোহনদাস গান্ধী গুজরাট জেলার কয়েকটি স্থানে ভ্রমণ করিলেন। গুজরাটে তিনি তাঁহার ছোটখাট সেবার কাজের দ্বারা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিলেন। গুজরাট রাজনৈতিক সম্মেলনে একবার সভাপতিত্বও করিলেন। গুজরাটের বাগসেরা নামক স্থানে একবার সত্যাগ্রহ কি এই বিষযে বক্তৃতা দিযাছিলেন। তাঁহার এই বক্তৃতার সংবাদ যথাসময়ে গুপ্তচর মারফৎ ইংরাজ সরকারের কর্ণগোচর হইল। সরকারের কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি কেন এই অসন্তোষজনক বক্তৃতা করিযাছেন জানিতে চাহিলেন। গান্ধীজী ইহার উত্তর দিবার জন্য বলিলেন, "দেশের লোকের মঙ্গলের জন্য আমি দেশ-বাসীকে সজাগ করিতেছি মাত্র।·····ইহা লোকশিক্ষা। লোকের নিজের দুঃখ দূর করার জন্য সকল প্রকার সম্ভবপর উপায দেখান আমার জীবনের ধর্ম্ম। যে প্রজা স্বাধীনতা পাওয়ার ইচ্ছা করে, তাহার নিকট নিজের রক্ষার চরম উপায় থাকা আবশ্যক। সাধারণতঃ এই চরম উপায় হিংসার মধ্য দিয়া দেখা দেয়। কিন্তু আমি হিংসার বদলে সত্যাগ্রহের উপায় দেখাইয়াছি। সত্যাগ্রহ শুদ্ধ অহিংস অস্ত্র। তবুও উহার ব্যবহার ও সীমা বুঝাইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।"

বুঝা যাইতেছে, গান্ধীজী ভারতের দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে তাঁহার একামী অস্ত্র 'সত্যাগ্রহকে' ভারতের শাসকের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবার জন্য সেই সময়ে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিলেন। অফ্রিকার অভিজ্ঞতা তাঁহাকে জানাইয়াছিল—সত্যাগ্রহ সর্ব্বজয়ী অস্ত্র। বিরুদ্ধপক্ষ যতই শক্তিমান হউন, উপযুক্ত ভাবে উপযুক্ত আবহাওয়ায় প্রযুক্ত হইলে সত্যাগ্রহের জয় অবশ্যম্ভাবী।

সত্যাগ্রহ সংগ্রাম সুরু করিবার পূর্ব্বে ভারতের পক্ষে সর্ব্বাগ্রে একটি বিশেষ সমস্যার সমাধানের প্রয়োজন ছিল। উপযুক্ত ভাব ও উপযুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি। সত্যাগ্রহ করিবার আগে দেশবাসীকে উহার বিষয়ে সজাগ ও যোগ্য করিতে হইবে, দেশ ইহার জন্য কতটা প্রস্তুত তাহা দেখিতে হইবে, স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসী কতখানি আগ্রহান্বিত তাহা জানিতে হইবে।

ভারতীয় আত্মা শোষণের কবল হইতে উদ্ধার চায়, স্বাধীনতা চায়, তাহা গান্ধীজী অন্তর দিয়া বুঝিতেন। কিন্তু তবুও পড়াশুনার জন্য, আর আফ্রিকার নিপীড়িত ভারতীয়দের জন্য তিনি দীর্ঘ তেইশ বৎসর স্বদেশ হইতে দূরে ছিলেন। তাই স্বদেশে ফিরিবার পর তাঁহার প্রথম কাজ হইয়াছিল দেশের পারিপার্শ্বিক সকল বিষয় লক্ষ্য করা, দেশবাসীর অবস্থা, আগ্রহ ও অনুভূতিগুলি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া নিজের চিন্তা, অনুভূতি ও কর্ত্তব্য স্থির করা।

তাই সত্যাগ্রহ লইয়া সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে তিনি সাধ্যমত ভারতের এখানে-ওখানে ঘুরিতে লাগিলেন, প্রয়োজন হইলে দুই-একস্থানে আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস বর্ণনাচ্ছলে সত্যাগ্রহের কৌশল সাধারণকে জানাইতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে চিন্তাযুক্ত নীরবতার মধ্য দিয়াও মানুষের আকাজ্ক্ষা ও কামনা জানিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অনুভূতি কতকটা প্রকাশিত হইয়াছিল গুজরাটের বাগসেরা গ্রামে, আর এই অনুভূতিটুকুই তিনি নির্ভীকভাবে অল্প কথায় সরকারী কর্ম্মচারীটিকে জানাইয়া দিয়াছিলেন।

ইহার পর গান্ধীজী বাংলায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত 'শান্তিনিকেতনে' আসিলেন। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন না, কিন্তু শান্তিনিকেতনের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ ও অধ্যাপকগণ পরম সমাদরে সদাহাস্যমুখ শীর্ণদেহী আফ্রিকায় ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী এই বীরটিকে নিজেদের আশ্রমের শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে সাদরে বরণ করিয়া লইলেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন বিদেশে, কিন্তু বিদেশ হইতে তিনি পত্র দ্বারা গান্ধীজীকে আফ্রিকার সত্যাগ্রহের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন এবং গান্ধীজী যেন একবার তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'শান্তিনিকেতন আশ্রমে' গমন করেন তাহার জন্যও অনুরোধ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইহাও শুনিযাছিলেন যে গান্ধীজী আফ্রিকার ফিনিক্সের আশ্রমবাসীদেরও ভারতে আনিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাই তিনি গান্ধীজীকে জানাইয়াছিলেন, গান্ধীজী যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ভারতের কোন স্থানে তাঁহার নিজ আশ্রম স্থাপনা করিবার আগে, তিনি ফিনিক্সের আশ্রমবাসীগণকে তাঁহার শান্তিনিকেতনে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন। এবিষয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে ব্যবস্থা-পত্রও পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

আমরা আগেই জানিয়াছি, গান্ধীজী ফিনিক্সের আশ্রমবাসীদের তাঁহার সহিত ভারতে আনিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু উহাদের আনিয়া কোথায় রাখিবেন, কেমন করিয়াই বা উহাদের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করিবেন, কেমন করিযা আশ্রমের ব্যয নির্ব্বাহ করবেন, এই সব ভাবিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িযাছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পত্রে গান্ধীজী যেন একটা সাময়িক ব্যবস্থার উপায় খুঁজিয়া পাইলেন। আপাততঃ আশ্রমবাসীদের শান্তিনিকেতনে রাখিয়া দিলেন। পরে ভ্রমণের পথে নিজেও শান্তিনিকেতনে আসিলেন। আশ্রমের অধ্যাপকগণ তাঁহার হাতে রবীন্দ্রনাথের প্রেরিত আর একখানি পত্র দিলেন। পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, 'আশা করি মহাত্মা এবং শ্রীমতী গান্ধী এত দিনে বোলপুরে এসে পৌচেছেন।'.

গান্ধীজী পত্র পড়িয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট হাসি হাসিলেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম গান্ধীজীকে মহাত্মা রূপে চিনিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু কেন?

পূর্ব্বাকাশে উদীয়মান উজ্জ্বল সূর্য্য……

সূর্য্য তাহার আলো সাগরের নীল জলে ছড়াইয়া দিল… …

নীল সাগর তাহার গভীর বিশালতা লইয়া……মহান বিরাটত্ব লইয়া…… অনন্ত শক্তি লইয়া সূর্য্যের সম্মুখে প্রকাশিত হইল… …

জগতের মধ্যে সূর্য্যই প্রথম দেখিল, ঐ অনন্তের মধ্যে বিস্তারিত রহিয়াছে অসীম জলরাশি……প্রভাতের ঐ শান্ত স্থির জলরাশির গর্ভে চাপা রহিয়াছে তরঙ্গের বিরাট গর্জ্জন……ঐ অসীমের বিলীয়মান দিগন্তে লুক্কায়িত রহিয়াছে প্রলয়-কালের ঝটিকার তাণ্ডব!

সূর্য্যই প্রথম চিনিতে পারিল……শান্ত সমুদ্রের অশান্ত রূপ …

বুঝিতে পারিল……অনন্ত জলরাশির অনন্ত মাহাত্ম্য!

উজ্জ্বল সূর্য্য বিরাট্ ও মহান সমুদ্রকে প্রভাতের লগনে সর্ব্বপ্রথম বরণ করিল!

পৃথিবীর ভিতর বিশ্বকবিই সর্ব্ব প্রথম দেখিলেন, ঐ মানুষটির মধ্যে সঞ্চিত রহিয়াছে বারিধির অসীম শক্তি……শান্ত ধীর ও মৃদুহাস্যময় মুখখানির ভিতর চাপা রহিয়াছে সঙ্কল্প ও প্রেরণার বিরাট উৎস……ক্ষুদ্রদেহের মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে কর্ম্ম ও সংগ্রামের প্রলয়গর্জ্জন! বিশ্বকবি বুঝিতে পারিলেন…… আফ্রিকার সত্যাগ্রহীর হৃদয়ের মাহাত্ম্য!

বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবকে নবীন ভারতের নবীন প্রভাতে সর্ব্বপ্রথম বরণ করিলেন…'মহাত্মা' বলিয়া আবাহন জানাইলেন। স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর আফ্রিকার সংগ্রাম, সত্যাগ্রহ-বিবরণ, আশ্রমের বিলাস-বর্জ্জিত সংযত ও ব্রহ্মচর্য্যের ঘটনা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি দরিদ্র অসহায় ও নিপীড়িত ভারত-

সত্য ও সুন্দরের পূজারীদ্বয়

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্তের সৌ

যাত্রীদের প্রতি গান্ধীজীর স্নেহ প্রীতি ও সেবার কথা শুনিয়াছিলেন, শত্রুমিত্র নির্ব্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি তাঁহার উদার আচরণের বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে না দেখিয়াই নিজ অন্তরের বিরাটত্ব দিয়া গান্ধীজীর অন্তরের বিরাটত্ব অনুভব করিযাছিলেন, আর অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই সকলের আগে স্বেচ্ছায় সানন্দে তাঁহাকে 'মহাত্মা' রূপে সম্বোধন করিয়াছিলেন!

* * * *

মহাত্মা গান্ধী শান্তিনিকেতনে বাস করিতে লাগিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি আশ্রমবাসীগণের আপনার জন হইযা গেলেন। শান্তিনিকেতনের শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে ভারতের প্রাচীন শিক্ষার ধারা লক্ষ্য করিয়া তিনি মুগ্ধ ও তৃপ্ত হইলেন। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও উদ্যম দেখিয়া তিনি বিশ্বকবিকে ভক্তিভরে প্রণাম জানাইলেন। আশ্রমের অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীদের বলিলেন, এই আশ্রম, ইহার শিক্ষাপ্রণালী, ইহার জীবন-যাপন প্রণালী, আমাকে প্রাচীন গৌরবান্বিত ভারতবর্ষের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। বিশ্বকবি শুধু শ্রেষ্ঠ কবি নহেন, তিনি আধুনিক কৃত্রিম সভ্যতার মোহে ভ্রান্ত ও পথহারা ভারতবাসীর পথ-প্রদর্শক, তিনি আমার জীবনের পথ-প্রদর্শক হইলেন...আমার 'গুরুদেব' হইলেন।

বিশ্বকবির উদ্দেশ্যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব অসীম শ্রদ্ধাভরে মাথা নত করিলেন।...

আমরা আগেই জানিয়াছি গান্ধীজীর আফ্রিকার আশ্রমের আশ্রম-বাসীগণের প্রায় সকলেই শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছিলেন। মগনলাল গান্ধী, মহামতি এণ্ড্রুজ, পিয়ারসন, শ্রীমতী কস্তুরবাই প্রভৃতি সকলেই শান্তিনিকেতনের শান্ত গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া নূতন কাজের জন্য নূতন শক্তি সংগ্রহ করিতেছিলেন, আর গান্ধীজীর নির্দ্দেশের অপেক্ষা করিতেছিলেন।

এই সময়ে শান্তিনিকেতনের আশ্রমের একটি বিষয় কিন্তু গান্ধীজীর

দৃষ্টিতে সংস্কারের যোগ্য বলিয়া মনে হইল। কিন্তু এই বিষয় লইয়া প্রথমে তিনি তাঁহার সঙ্গীগণের সহিত আলোচনা করিলেন, পরে ইহার সংস্কার ও পরিবর্ত্তন করা উচিত বিবেচনা করিয়া আশ্রমের অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীদেরও জানাইলেন।

বিষয়টি এখানে বলা দরকার। আশ্রমের অধিবাসীগণ পাচকের দ্বারা পাক করা খাদ্য খাইতেন। গান্ধীজী তাঁহাদের জানাইলেন, ইহাতে আশ্রমবাসীদিগের আত্মনির্ভরতার এবং শিক্ষার ত্রুটি থাকিয়া যাইতেছে, আর সাক্ষাৎ ব্যবস্থার অভাবে খাদ্যের বিশুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতারও বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। কারণ বেতনভোগী পাচক বিশুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া তাড়াতাড়ি কার্য্য শেষ করিবার দিকেই কেবলমাত্র লক্ষ্য করিয়া থাকে। ইহাতে গুরুদেবের আশ্রমধর্ম্মের ক্ষতি হইতেছে।

ছাত্রগণকে তিনি গল্পচ্ছলে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার্থীদের এক কাহিনী শুনাইলেন। তখনকার ছাত্ররা অধ্যয়ন করিত, আবার আশ্রমের জন্য খাদ্য ও কাষ্ঠ সংগ্রহ করিত, নিজহস্তে রন্ধন করিত—সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিত। তবেই তাহাদের পূর্ণ আশ্রমধর্ম্ম পালিত হইত।

তাঁহার কথায় অধ্যাপকগণ ও ছাত্রগণ উৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহারা কুণ্ঠা পরিত্যাগ করিলেন, জড়তা ত্যাগ করিলেন, সময় করিয়া নিজেরাই নিজেদের খাদ্য রন্ধন করিতে লাগিলেন। অনাড়ম্বর অথচ বিশুদ্ধ খাদ্য তাঁহারা তৃপ্তির সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন। গান্ধীজীর সঙ্গীগণও এই স্বাবলম্বী আশ্রমবাসীগণের সহিত কাজ করিতে লাগিলেন। রন্ধনে সাহায্য করিতে লাগিলেন, রন্ধনের ও ভোজনের বাসনপত্রাদি মাজিতে লাগিলেন, রন্ধনশালা পরিষ্কার করিলেন। আশ্রমে যেন একটা নবজীবনের স্পর্শ লাগিল। সেবাব্রতী ও সত্যাগ্রহী গান্ধীজীর নিকট ইহা নূতন আদর্শ নহে। এই আদর্শ আমরা আফ্রিকার আশ্রমে দেখিয়াছি, ১৯০১ সালের কলিকাতার কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক রূপে এই সেবার আদর্শের পরিচয় পাইয়াছি। গান্ধীজী জানিতেন, সত্যাগ্রহীর ধর্ম্মই হইল সংযম ও স্বাবলম্বনকে মূলমন্ত্র

রূপে গ্রহণ করা। সত্যাগ্রহীর কর্ত্তব্য সাধারণের কাজ ও নিজের কাজ যথাসম্ভব নিজের শক্তিদ্বারা সম্পন্ন করা, যে কোন বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া আত্মনির্ভরশীলতার চর্চ্চা করা। এই আত্মনির্ভরশীলতার আদর্শই শান্তিনিকেতনের অধিবাসীগণকে সেদিন তিনি প্রদান করিয়াছিলেন।

যাহা হৌক, শান্তিনিকেতনে বেশী দিন তাঁহার বাস করা হইল না। অকস্মাৎ একদিন তারযোগে সংবাদ আসিল মহামতি গোখলে দেহত্যাগ করিযাছেন। গান্ধীজী ব্যাকুল হইলেন—গোখলের স্নেহ, উপদেশ ও আদেশের মধ্যে তিনি পিতার মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। গান্ধীজী শোকে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। শ্রীমতী কস্তুরবাঈকে সঙ্গে লইয়া দ্রুত পুণার পথে যাত্রা করিলেন।

পুনায গোখলের শ্রাদ্ধাদি শেষ হইযা গেলে কেহ কেহ তাঁহাকে গোখলে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল 'সার্ভেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র মধ্যে প্রবেশ করিযা দেশের সেবা করিতে বলিলেন। কিন্তু গান্ধীজী জানাইলেন, গোখলের আদেশ তিনি মান্য করিবেন, কিন্তু গোখলের দলের সভ্যগণের সহিত তাঁহার আদর্শকে তিনি মিলাইতে অক্ষম হইবেন। কারণ সার্ভেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া সোসাইটির আদর্শে ও তাঁহার আদর্শে বিশেষ পার্থক্য ছিল। পার্থক্য লইয়া তিনি কাজ করিয়া আনন্দ পাইবেন না, কাজে সাফল্য লাভ করিবেন না। গোখলে নিজেও ইহা জানিতেন, তাই তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করা সত্ত্বেও তাঁহাকে নিজের দলের মধ্যে তিনি জড়াইতে চেষ্টা করেন নাই। নিজ আদর্শের ব্যাখ্যার দ্বারা সকলকে নিরস্ত করিযা গান্ধীজী আবার তাহার ভ্রমণের পথে বাহির হইলেন।

পুনা হইয়া তিনি ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন সহরে গমন করেন। সমুদ্র-পথেও তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন। জাহাজের তৃতীয শ্রেণীর দুর্দ্দশা তাঁহাকে বাষ্পীয-যানের দুর্দ্দশার কথাই স্মরণ করাইয়া দিল। তিনি জগতের দরিদ্রগণের নিপীড়নের আর একটি চিত্র দেখিলেন, বেদনায় তাঁহার অন্তর বিগলিত হইল। রেঙ্গুনের কাজ সারিয়া তিনি আবার ভারতে ফিরিলেন।

সেই বৎসর হরিদ্বারে কুম্ভমেলা বসিয়াছিল। গান্ধীজী ইচ্ছা করিলেন, তাঁহার আশ্রমবাসীগণকে লইয়া কুম্ভমেলায় যাইবেন, মেলাক্ষেত্রে আগত সংখ্যাতীত যাত্রীগণকে সেবা করিবেন। তিনি কুম্ভমেলায় গমন করিলেন। সেইখানে গোখলের দলের কতিপয় কর্ম্মীও স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করিতে আসিয়াছিলেন। গান্ধীজীর দল তাঁহাদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া ভক্ত ও দর্শনার্থী যাত্রীগণকে নানাবিষয়ে সেবা করিতে লাগিলেন। যাত্রীগণের জন্য তাঁহার দল পায়খানার গর্ত্ত খনন করিতেন, যাত্রীর দল মলত্যাগ করিলে তাঁহারা ঐ মল পরিষ্কার করিতেন, মেলাক্ষেত্রকে মলমুক্ত ও দুর্গন্ধমুক্ত করিতেন। গোখলের স্বেচ্ছাসেবকের দল পর্য্যন্ত তাঁহার দলের কাজ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন, গান্ধীজীর নাম মেলাক্ষেত্রের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িল। অগণিত তীর্থযাত্রী গান্ধীজীর দলের কাজ দেখিতে আসিল। সুধী মানুষ, পণ্ডিত মানুষ গান্ধীজীর কর্ম্ম ও প্রণালীর পক্ষ হইয়া, কেহ বা বিপক্ষ হইয়া, তাঁহার সহিত সেবা বিষয়ে, ধর্ম্মবিষয়ে বহুবিধ আলোচনা করিতে লাগিলেন। গান্ধীজী শুধু পরিচিত নহেন, এইরূপে বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। বাহিরে গেলে শত শত লোক তাঁহার সঙ্গে চলে, তাঁবুতে আসিলে শত শত লোক 'দর্শন' লাভ করিতে আসে।

গান্ধীজী অস্থির হইলেন, মধ্যে মধ্যে দর্শনার্থীর অন্ধপ্রেমে বিরক্ত হইলেন। প্রশংসা বা স্তুতির প্রতি গান্ধীজীর এই অনাসক্তি ও বিরক্তি গান্ধী চরিত্রের একটি মহান বিশেষত্ব। সামান্য কুম্ভমেলার কথা বাদ দিয়াও আমরা জানি, জগতে প্রসিদ্ধ হইবার পর, মহামানবরূপে জ্ঞাত ও পূজিত হইবার পর কত দেশের কত কোটি কোটি জনসঙ্ঘ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করিয়াছে, আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়াছে। ইহাতে মহাত্মা গান্ধী দুঃখিত হইয়াছেন, অনেক সময় বিরক্তও হইয়াছেন, সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

মনে পড়ে ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে কলিকাতার বেলেঘাটার কথা।

গান্ধীজী দর্শনার্থী জনতাকে দর্শন দিবার জন্ম বাহিরে আসিলেন, ভারতের এই জীবন্ত দেবতাটিকে দেখিয়া জনসমুদ্র আনন্দোচ্ছ্বল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—'মহাত্মা গান্ধীকি জয়!'

কিন্তু গান্ধীজী ?······

তাঁহার প্রশান্ত আননের শান্ত হাসি নিভিয়া গেল, আত্মপ্রশংসা শুনিয়া হতাশায় ও অসন্তোষে মুখ শুকাইয়া গেল, তিনি ব্যস্ত হইয়া দুই কান আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া ধরিলেন, সঙ্কোচে মাথা নীচু করিয়া আবার ভিতরে চলিয়া গেলেন।

তাই বলিতেছি, গান্ধী-চরিত্রের ইহা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনি জানিতেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিনি মানুষের সেবা করিতে আসিয়াছেন—সেবার বদলে মানুষের শ্রদ্ধা, স্তুতি বা পূজা লইতে আসেন নাই। বরং এইসব শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাঁহাকে যেন আত্মবিস্মৃত করিতে চেষ্টা করে, তাঁহাকে তাঁহার লক্ষ্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করে। স্তুতির প্রতি এই বৈরাগ্য গান্ধীজীকে অনন্ত স্তুতির যোগ্য ও অনন্যসাধারণ মহত্ত্বে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল।

কুম্ভমেলায় হিন্দুর কুসংস্কার ও বহুবিধ ভ্রান্তি এবং গোঁড়ামির দৃশ্য তাঁহাকে বিশেষভাবে ব্যথিত করিয়া তুলিল। তিনি দেখিলেন, এখানে লোকে শুদ্ধ ধর্ম্মলাভের জন্য আসে না, ভণ্ড উপায়ে ও মিথ্যার কৌশলে স্বার্থ ও অর্থলাভ করিতেও আসে। ভণ্ড মিথ্যাশ্রয়ীর দলই মেলাক্ষেত্রে বেশী আসে। কেহ পাঁচ পা-ওয়ালা গরু দেখাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করে, কেহ ছাই মাখিয়া সাধু সাজিয়া লোকের নিকট হইতে প্রণামী ও সিধা আদায় করে, কেহ মাতুলী ও কবচ দিয়া রোগ আরোগ্য করিবার ভাণ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। ধার্ম্মিক লোকও যে একেবারে আসে না তাহা নয়, তবে অধার্ম্মিক ও কুচক্রীর সংখ্যার তুলনায় তাহারা অতিশয় নগণ্য। এমন কি, ঐ সব ধার্ম্মিকগণও অনেক সময় সাধুদর্শনের মোহে বা মাতুলী ধারণ করিয়া সৌভাগ্য লাভ করিবার লোভে ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে।

কুম্ভমেলার এই দৃশ্য হিন্দু-সমাজের একটি মস্তবড় ত্রুটি তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া দিল। তিনি ব্যথিত হইলেন।

কুম্ভমেলা শেষ হইয়া গেল। তিনি হরিদ্বারের বিখ্যাত আশ্রম 'গুরুকুল' দর্শন করিতে গেলেন। কিন্তু সেখানে গুরুকুলের মোহান্ত মুনশী রামজীর নির্ম্মল ধর্ম্মজ্ঞান দেখিযা বিশেষ প্রীত হইলেন। ভণ্ড সাধুগণ ছাড়াও হিন্দুর মধ্যে এমন নিরহঙ্কারী পণ্ডিত ও শুদ্ধজ্ঞানী ব্রহ্মচারীও আছেন জানিয়া তাঁহার মন শ্রদ্ধায় নত হইয়া আসিল।

গুরুকুল হইয়া তিনি 'লছমন ঝোলা'য় আসিলেন। লছমন ঝোলাতেও ধর্ম্মস্থানে মানুষের নোংরামী, যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগ, এই সব কুকার্য্য দেখিয়া. তাঁহার মন বিতৃষ্ণায ভরিয়া উঠিল। এইখানেও সাধু-দর্শনের অছিলায় পয়সা অর্জ্জনের কৌশল তাঁহার অন্তরকে বেদনার্ত্ত করিল এবং লছমনঝোলার নূতন নির্ম্মিত লোহার সেতু দেখিয়া সহজ প্রকৃতির মধ্যে সভ্যতার কৃত্রিমতার আবির্ভাব অনুভব করিযা তাঁহার হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল।

তিনি লছমনঝোলা ত্যাগ করিলেন।

পথে তাঁহার বহু দেশবিখ্যাত মনীষী ও সেবকগণের সহিত পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। তখনকার যুগের বিখ্যাত ও মহান্ দেশকর্ম্মী স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর সহিত আলাপ ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল, কলিকাতার আরও অনেক বিখ্যাত ও বড় লোকের সহিত জানাশোনা ও ঘনিষ্ঠতা হইল।

এই ভ্রমণকালে তিনি ভারতের অনেক নেতা ও মহামানবের প্রকৃতি জানিতে পারেন।

এইখানে গান্ধীজীর জীবনের আর একটি বিশেষ ঘটনার কথা বলিয়া তাঁহার ভ্রমণের ইতিহাস শেষ করিব।

আমরা জানিয়াছি, আহারে পূর্ণ সংযম তিনি আফ্রিকাতেই অভ্যাস করিয়াছিলেন। লালসার জন্য ও রসনার তৃপ্তির জন্য অধিক আহার ও অনিয়মিত খাদ্য গ্রহণ তাঁহার আহার-নীতির বিপরীত ছিল। কিন্তু ভারত-ভ্রমণের

সময় তিনি তাঁহার অল্প, অনাড়ম্বর ও সংযত আহারকে আরও নিয়মিত, আরও সংযত ও আরও পরিমিত করিয়া তুলিলেন। এই কঠোর নিয়মনিষ্ঠার একটি কারণ ছিল। তিনি দেখিলেন, তিনি যেখানেই যান, লোকে তাঁহাকে খাওয়াইবার জন্য বিরাট আড়ম্বর করে, ফলের পাহাড় সাজাইয়া দেয়, বারবার আহার করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করে। ভোজ্যদ্রব্যে সংযত হওয়া সত্ত্বেও বিশুদ্ধ ও পবিত্র আহারও তাঁহার কাছে আড়ম্বরপূর্ণ ও বাহুল্যযুক্ত হইয়া উঠিতেছে, ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। সেইজন্যই এই আড়ম্বর ও বাহুল্যকে কঠোর ব্রত গ্রহণের দ্বারা চিরতরে বর্জ্জন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি স্থির করিলেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সর্ব্বসমেত পাঁচবার আহার করিবেন এবং রাতের আহার সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে শেষ করিবেন। ঔষধ খাওযা বা লেবুর রস সমেত জলপানকেও এই আহারের সংখ্যার মধ্যে গণনা করিলেন। আর রাত্রের আহার সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে শেষ করিয়া ভক্ত নরনারীর ভক্তির অত্যাচার হইতেও যেমন রক্ষা পাইলেন, তেমনি আবার রাত্রেও সুস্থচিত্তে কাজ করিবার অবসর পাইলেন।

আমরা জানি, এই ব্রত তিনি জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত পালন করিযা গিয়াছেন। তাঁহার এত অল্প আর পরিমিত আহার করিয়া এত অধিক ও বিরাট কর্ম্ম সম্পাদনার যোগ্যতা দেখিয়া মুগ্ধ হই·· ···ইহা কেবল গান্ধীজীর মত মহামানবের আচরণেই সম্ভব।

ছত্রিশ

আশ্রম-প্রতিষ্ঠা

আমরা আগেই জানিয়াছি ভারতবর্ষে আফ্রিকার ফিনিক্সের অনুরূপ একটি আশ্রম-স্থাপনের প্রবল ইচ্ছা গান্ধীজীর মনে জাগিয়াছিল। ভারতবর্ষে আসিবার পর তিনি এ বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, তবে অর্থ আর উপযুক্ত স্থানের অভাবে তিনি তাঁহার কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিতে পারেন নাই।

ভারত-ভ্রমণ করিবার পর তিনি আশ্রম-স্থাপনের দিকে বিশেষ ভাবে মন দিলেন। এইখানে একটি কথা আমরা বলিব। অনেকে হয়ত মনে করিতেছেন, ভারতে আসিয়াই গান্ধীজী যদি এমনভাবে সাধারণের কর্ম্মে লিপ্ত হইতে লাগিলেন, তবে নিজের সংসার-পোষণের জন্য তখন তিনি কি পেশা অবলম্বন করিয়াছিলেন ?

আমরা জানি, সংসার-পালনের জন্য তিনি আর ব্যারিষ্টারি বা আইন ব্যবসায়ের দিকে মন দিলেন না।

আর দিবারও তখন কোন প্রযোজন ছিল না, কারণ সংযত ও মিতাহারী মোহনদাস সহধর্ম্মিণী কস্তুরবাঈকেও নিজের জীবনধর্ম্মের যথার্থ সহযোগিনী করিয়া লইয়াছিলেন। পুত্রদেরও নিজ আদর্শের দ্বারা অনাড়ম্বর ও শান্ত শিক্ষার মধ্যে লালনপালন করিতে লাগিলেন। সংসারের ভাবনা তিনি ভুলিয়াই গেলেন, নিজের আদর্শের ভাবনাতে ডুবিয়া গেলেন।

আশ্রম-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমেই স্থান নির্ব্বাচন লইয়া এক বিশেষ সমস্যায় সৃষ্টি হইল। বিভিন্ন স্থানের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যখন তাঁহার এই সঙ্কল্পের কথা জানিলেন, তখন অনেকেই নিজ নিজ প্রদেশের মধ্যে তাঁহাকে আশ্রমের জন্য স্থান দিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বাংলা হইতেও তাঁহার নিকটে অনেক অনুরোধ আসিয়াছিল, দিল্লীর অনেক ধনী ব্যক্তি সেখানে আশ্রম-প্রতিষ্ঠার

জন্য স্থান দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু গান্ধীজী বিভিন্ন দেশের অনুরোধ সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত নিজদেশেই আশ্রম স্থাপনা করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

ইহার কারণ তিনি আত্মজীবনীতে অল্পকথায় জানাইয়া দিয়াছেন— "যখন আমি আমেদাবাদের ভিতর দিয়া যাইতেছিলাম, তখন অনেক মিত্র আমেদাবাদকেই নিরূপণ করিতে বলিলেন। আশ্রমের খরচা তাঁহারাই সংগ্রহ করিয়া দিবেন বলিলেন। বাড়ী খোঁজ করিয়া দেওয়ার ভারও তাঁহারাই লইতে চাহিলেন। আমেদাবাদের জন্য আমারও একটা আকর্ষণ ছিল। গুজরাটী বলিয়া গুজরাটী ভাষার সাহায্যেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সেবা করিতে পারিব—এইরূপ মনে করিতাম। আমেদাবাদ এককালে হাতের তাঁতে বোনা কাপড়ের কেন্দ্র ছিল বলিয়া এখানেই হাতে সুতা কাটা—এই গৃহশিল্পের পুনরুদ্ধারের কাজ সব চাইতে ভাল চলিতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয়। গুজরাটের প্রধান নগর বলিয়া হয়ত এইখানেই ধনাঢ্য লোক ধন দ্বারাও সাহায্য করিতে পারিবে—এই আশাও ছিল।"

নিজ প্রদেশে আশ্রম প্রতিষ্ঠার কারণ জানিলাম। আমেদাবাদের একজন ধনী ব্যারিষ্টার কোচরব নামক গ্রামে নিজের একটি বাড়ী গান্ধীজীর আশ্রম-প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাকে ভাড়া দিলেন। বাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া গান্ধীজী নিজের সঙ্গীদের শান্তিনিকেতন হইতে লইয়া আসিলেন। এণ্ডুজ, পিয়ারসন, মগনলাল গান্ধী, অনেকগুলি তামিল যুবক, সহধর্ম্মিণী কস্তুরবাঈ সকলেই কোচরবে স্থাপিত নূতন আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এইবার আশ্রমের নাম লইয়া আবার এক সমস্যা জাগিল। বিভিন্ন ব্যক্তি উহাকে নিজ নিজ ইচ্ছামত বিভিন্ন নামে পরিচিত করিতে চাহিলেন। কিন্তু এবারও গান্ধীজী নিজে নামের সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন। তিনি জানাইলেন, আশ্রমের নাম হইবে 'সত্যাগ্রহ আশ্রম'। এই নাম রাখার হেতুস্বরূপ তিনি বলিলেন, এই নামের দ্বারা সেবার ভাব ও সেবা করার পদ্ধতির

ভাব সহজেই মনে জাগিবে। নামের গুণেও আশ্রমবাসীগণ সত্যের সেবায় আগ্রহান্বিত হইবেন।

১৯১৫ সালের ২৫শে মে গান্ধীজী তাঁহার আশ্রম স্থাপন করিলেন,...এইবার সঙ্গীদের সহিত যুক্তি করিয়া আশ্রমের নিয়মাবলীও প্রস্তুত করিলেন। স্থির করিলেন, এখানে যাহারা থাকিবে, তাহাদের সত্যাগ্রহী হইতে হইবে। সত্যাগ্রহীর স্বভাব ও আচরণ অভ্যাস করিতে হইবে। সত্যবাদী, অকপট, আত্মাভিমান-শূন্য হইতে হইবে। মানুষের মধ্যে ভেদ নাই বিশ্বাস করিতে হইবে। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিয়া সকল মানুষের সহিত সরল মনে বাস করিতে হইবে। জাতি-বিচার ও জাতিভেদ দূর করিতে হইবে। আশ্রমের ও নিজের কাজ নিজ হাতে সম্পন্ন করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে গঠন-মূলক কাজ করিতে হইবে, কাজের দ্বারা মানুষের সেবা করিতে হইবে। সংযম অভ্যাস করিয়া সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতে হইবে।

আশ্রম তৈয়ারী হইল। এখন মনে প্রশ্ন জাগে, এই আশ্রম তিনি গঠন করিয়াছিলেন কি উদ্দেশ্যে? ইহার সঠিক উত্তর দিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তবে মনে হয় যে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ভিতর দিয়া তিনি একাধিক উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

আশ্রমের জীবন দ্বারা তিনি আশ্রমবাসীগণকে সংযমী ও স্বাবলম্বী হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন। সকলকে একসঙ্গে সকল কাজ সম্পাদন করিতে দিয়া, একসঙ্গে পানভোজন করিবার সুযোগদান করিয়া তিনি আশ্রমবাসীগণের মন হইতে মানুষের গড়া কৃত্রিম ভেদাভেদের সংস্কার ও আচার বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। আর আশ্রমবাসীগণের কার্য্য ও আচরণের দৃষ্টান্তে ভারতবাসী-গণকে সংযমী ও স্বাবলম্বী হইবার প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন। আশ্রমের মধ্যে জাতির পার্থক্য তুলিয়া দিয়া ভারতবাসীকে জাতিভেদের কৃত্রিম সংস্কার বর্জ্জন করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু মনে হয়, এই আশ্রম স্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সত্যাগ্রহের

একটি পরীক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করা—কতকগুলি খাঁটি সত্যাগ্রহী কর্ম্মী গড়িয়া তোলা—যাহারা প্রয়োজন হইলে নিজের সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্ম কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে, অথবা তাহাদের অভ্যাসের দ্বারা—আদর্শের দ্বারা ভারতে অসংখ্য সত্যাগ্রহীর সৃষ্টি করিবে···যে সত্যাগ্রহীর দল একদিন সত্যের অস্ত্রে অসীম শক্তিশালী ইংরাজ সরকারকে শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিবে।

মহাত্মার উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, আশ্রমের কর্ম্মীর দল নিজেদের আচরণের দ্বারা ভারতবাসীকে উৎসাহিত করিবে, আশান্বিত করিবে। অসৎ ও মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে বা কষ্ট বরণ করিতে সত্যের যোদ্ধাদের উৎসাহিত করিবে···ভারতের সত্য ও শাশ্বত স্বভাবের প্রকাশ করিবে—ভারতের জাতীয় ও স্বদেশীয় আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতিগুলিকে আবার পুনর্জীবিত করিবে।

আশ্রমের জীবন-ধারাকে নিজের আদর্শ অনুযায়ী সম্পূর্ণ করিবার জন্ম এইবার গান্ধীজী কাজে নামিলেন। আশ্রমের মধ্যে জাতিভেদ ও উচ্চনীচ শ্রেণীর পার্থক্য দূর করিবার জন্ম একটি গরীব অন্ত্যজ পরিবারকে আশ্রমে আশ্রয় দিলেন। ঐ পরিবারে তিনজন লোক ছিল, দুদাভাই, তাহার স্ত্রী দানীবহিন, আর উহাদের ছোট মেয়ে লক্ষ্মী। উহারা আশ্রমের নিয়মগুলি পালন করিয়া অন্যান্য আশ্রম-বাসীগণের সহিত একসঙ্গে বাস করিতে লাগিল।

কিন্তু সত্যের পথ বড়ই বন্ধুর···বড়ই অসমতল। সত্যসত্যই একদল অস্পৃশ্য আশ্রমে গৃহীত হইল দেখিয়া আশ্রমের ভৃত্যগণ পর্য্যন্ত বিরক্ত হইল, অস্পৃশ্য পরিবারটির সহিত একসঙ্গে কাজ করিতে ঘৃণা প্রকাশ করিল, এমন কি আশ্রম-বাসীগণের ভিতর হইতেও কেহ কেহ অস্পৃশ্যদিগের সহিত এমনধারা অন্তরঙ্গতা বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে করিল, শেষ পর্য্যন্ত এই অন্ত্যজ পরিবারটির সহিত মেলামেশা করার শিহরণজনক কাহিনী আশপাশের গ্রামে এবং সহরে ছড়াইয়া পড়িল।

আশ্রমের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষকগণ বিরক্ত হইলেন, অসন্তুষ্ট হইলেন, আশ্রমের সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন। সত্যের পূজারী ভীত হইলেন না। সাধ্যমত ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া তিনি আশ্রমের কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু একদিন আশ্রমের ব্যবস্থাপক 'শ্রীযুক্ত মগনলাল গান্ধী' গান্ধীজীকে জানাইলেন—'আগামী মাসে আশ্রম চালাইবার খরচা আমাদের নিকট নাই।'

গান্ধীজী শুনিলেন, হাসিমুখে উত্তর দিলেন, 'আশ্রমকে রাখিতেই হইবে, এখানে খরচা না পাইলে, আমাদের অন্ত্যজ পল্লীর মধ্যে উঠিয়া যাইতে হইবে।'

মগনলাল বলিলেন—'কিন্তু তাহা হইলে এইসব অভিজাত বংশীয় ও উচ্চজাতের মধ্যে ছোটবড়র ভেদাভেদ দূর করিবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবেন কি উপায়ে ?'

গান্ধীজী জানাইলেন, 'আমি ত এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহা যদি অসত্য হয়, ইহাতে যদি ঈশ্বরের সমর্থন না থাকে, তবে আমাদের অবশ্যই এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে।

মগনলাল দুঃখের সহিত বলিলেন, 'কিন্তু আমরা ত জানি ইহাই চরম সত্য, মানুষের ভেদের পরিবর্ত্তে মানুষের সাম্যই ঈশ্বরের রাজ্যে একমাত্র মঙ্গলজনক বিধান।' গান্ধীজী বলিলেন, 'তাহা হইলে ঈশ্বরে শেষ অবধি বিশ্বাস রাখিতে হইবে। ঐ প্রচেষ্টা সত্য হইলে ঈশ্বর নিশ্চয় অর্থের অভাবে ইহাকে নষ্ট হইতে দিবেন না।'

গান্ধীজীর মনে নির্ভীকতা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা! গান্ধীজীর কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা মগনলালের হৃদয়েও আশা ও বিশ্বাসের আলো জ্বালিল।

দুই একদিন পরে আশ্চর্য্য ও অলৌকিক কাহিনীর মত একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল।

একদিন সকালে একটি বালক সংবাদ দিল, আশ্রমের বাহিরে একজন শেঠ গান্ধীজীকে খুঁজিতেছেন। গান্ধীজী বাহিরে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শেঠ বলিলেন, 'আমি আপনার আশ্রমে কিছু সাহায্য করিতে ইচ্ছা করি, আপনি কি লইবেন ? গান্ধীজী নিজের সত্যকে স্মরণ করিলেন...... ঈশ্বরকে

স্মরণ করিলেন। বলিলেন, 'আপনার সাহায্য আমি অবশ্যই গ্রহণ করিব, কারণ এখন আমি পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছি।'

শেঠজী বলিলেন, 'কালই আমি যথাসাধ্য পাঠাইয়া দিব।' শেঠজী চলিয়া গেলেন।

পরের দিন ঠিক সময়ে আবার আসিলেন। গান্ধীজীর হাতে তের হাজার টাকার নোট দিয়া নমস্কার জানাইয়া চলিয়া গেলেন।

পরীক্ষায় গান্ধীজী ঈশ্বরের সাহায্য পাইলেন……নবীন উৎসাহে আশ্রমের কাজে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার কথা বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িল। যাঁহারা আশ্রমের কার্য্যে ও আচরণে বিশ্বাস করেন নাই, তাঁহাদেরও অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তি কেমন যেন শিথিল হইয়া গেল। গান্ধীজীর এই ম্লেচ্ছ কাণ্ডকারখানাকে সাহায্য করিতে একজন গোঁড়া হিন্দুই শেষ পর্য্যন্ত এত টাকা দিল, ইহাতে তাঁহারা কেমন যেন বিচলিত হইয়া গেলেন, আশ্রমের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারে বিরত হইলেন।

ঘরে ও বাহিরে বাধাহীন হইয়া সত্যসন্ধ গান্ধীজী সত্যের পরীক্ষায় দৃঢ় বিশ্বাসে অগ্রসর হইলেন।

আশ্রম স্থায়িত্ব লাভ করিল, কিন্তু আর একটি ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া আশ্রম কোচরব হইতে অন্যত্র স্থানান্তরিত হইল। কোচরবের গ্রামের দরিদ্র বস্তিগুলির মধ্যে 'মড়ক' দেখা দিয়াছিল। আশ্রমের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা সত্ত্বেও আশপাশের অশিক্ষিত ও অনিচ্ছুক গ্রামবাসীদের অপরিচ্ছন্নতার জন্য শেষ পর্য্যন্ত আশ্রমটিরও বিপদ হইতে পারে বুঝা গেল। অল্পদিনে গ্রামবাসীদের শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব বিবেচনা করিয়া আশ্রমটি কোচরব হইতে অন্যস্থানে লইবার সঙ্কল্প করা হইয়াছিল।

এইবার গান্ধীজী ইচ্ছা করিলেন, আশ্রমটিকে ফাঁকা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। গ্রাম বা সহরের জনতা হইতে বেশ খানিকটা দূরে প্রকৃতির শান্ত

নির্জ্জনতার মধ্যে সত্যের আলোকদানকারী এই সত্যাগ্রহ আশ্রমটিকে স্থাপন করিবেন। সন্ধান করিতে করিতে ইচ্ছামত স্থানও অবিলম্বে পাওয়া গেল। কোচরব গ্রামের উত্তরে তিন-চার মাইল দূরে সবরবতী নামক একটি গ্রামে একটি প্রকাণ্ড প্রান্তরের মধ্যে আশ্রমের জমি কেনা হইল। অল্পদিনের মধ্যেই আশ্রমের গৃহাদি নির্ম্মিত হইল। নদীর নির্জ্জন তীরে আশ্রমটি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ভোগ করিতে লাগিল। আশ্রমবাসীগণ নূতন আশ্রমে আসিয়া নূতন উদ্যমে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

আশ্রমের কর্ত্তব্য ও প্রচেষ্টার বিষয় আবার আমরা প্রসঙ্গ অনুসারে বর্ণনা করিব। এখন মহামানবের জীবন-নদীর গতির মুখে আমাদের ফিরিয়া আসিতে হইবে।

সাঁইত্রিশ

এগ্রিমেণ্ট্ প্রথা উচ্ছেদ

আশ্রম স্থাপনা ইত্যাদি কার্য্যের মধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও গান্ধীজী কুখ্যাত এগ্রিমেণ্ট্ প্রথার প্রতি মন দিলেন।

ইহা এক ঘৃণ্য প্রথা ছিল। ভারতের জাতীয় অস্তিত্বের উপর ইংরাজ বণিকগণের ইহা এক অপমানজনক দুর্ব্ব্যবহার ছিল। ইংরাজ বণিকগোষ্ঠী আফ্রিকা, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মালয় প্রভৃতি স্থানে বিরাট বিরাট ব্যবসায়-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ক্ষেত্র হইতে কাঁচা মাল উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যবসায় পরিচালনার জন্য মালবহনকারী শ্রমিকের প্রয়োজন হইত। ভারত জনবহুল, কিন্তু ইংরাজ শাসনে দুর্দ্দশাগ্রস্ত শোষিত ও দরিদ্র। তাঁহারা স্থির করিলেন দরিদ্র ও বেকার ভারতবাসীগণের মধ্যে অন্নপ্রাপ্তির আশা জাগাইয়া তাহাদিগকে কাজের জন্য বিদেশে লইযা যাইবেন। তাঁহারা ভারতবাসীর সম্মুখে বিদেশে কাজের ও অর্থের প্রাচুর্য্যের বিষয় প্রচার করিতে লাগিলেন। ভারতবাসীগণ—বিশেষতঃ মাদ্রাজ প্রদেশের দরিদ্র অধিবাসীগণ দলে দলে বিদেশে গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের দুঃখ দূর হইল না। প্রচার অনুযায়ী তাঁহারা সুখ ও আহার ত পাইলেনই না, বরং কোনরকমে আধপেটা খাইয়া কুঁড়ের মধ্যে বাস করিযা পশুর মত জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। পরিশ্রমে স্বাস্থ্য নষ্ট হইল, কাজের দীনতায জাতির সম্মান নষ্ট হইল। তাহা ছাড়া বিদেশী ব্যবসায়ী কার্য্য উদ্ধার করিযা নিজেদের স্বার্থপরতার পরিচয় প্রদান করিল। তাঁহারা দেখিলেন দলে দলে ভারতবাসী আসিয়া নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। তাঁহারা আতঙ্কিত হইলেন। যাহাতে ভারতীযগণ কার্য্য করিতে আসিয়া শেষপর্য্যন্ত সংখ্যাধিক্যের জোরে অধিকার দাবী না করে, এইজন্য তাঁহারা বিশেষ রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা করিলেন।

কুচক্রী ইংরাজ ব্যবসায়ীগণ তদানীন্তন ভারত-সরকারের সহিত এক চুক্তি

করিল। চুক্তিতে স্থির হইল, নির্দ্দিষ্ট বৎসরের জন্য কাজ করিবে সহি করিয়া ভারতীয় মজুর আফ্রিকায় পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশে যাইবে। চুক্তির সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলেই আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসিবে। ইহাই কুখ্যাত এগ্রিমেণ্ট্ প্রথা—চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক-সংগ্রহ নীতি।

ভারতীয়গণ কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিবার পর বিদেশে তাঁহাদের দুর্দ্দশা, সেখানকার অধিবাসীগণ কর্তৃক তাঁহাদের উপর অপমান ও অত্যাচার ইত্যাদি বিষয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্যবসায়ীগণের চালাকী ও শোষণের কথা বিদেশস্থিত শিক্ষিত ভারতীয়গণের মুখ হইতে ক্রমে ক্রমে ভারতের সকল লোকই জানিতে পারিলেন। নিজেদের জাতীয় সত্তার অপমানে ও লাঞ্ছনায় ভারতবাসীগণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন, তাঁহারা আলোচনা ও আন্দোলন আরম্ভ করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে আফ্রিকার ভারতীয় শ্রমিকদের উপর অত্যাচার ও অনাচারের বেগ ১৯১৪ সালে গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় রহিত হইয়াছিল। ইহা আমরা আফ্রিকার সত্যাগ্রহ-বিবরণে জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু অন্যান্য দেশে তখনো ইহা পূরাদমে চলিতেছিল। আত্মমর্য্যাদা-সম্পন্ন ভারতবাসী, শিক্ষিত ভারতবাসী এই অত্যাচার ও প্রতারণার পথ বন্ধ করিতে চাহিলেন।

কেহ কেহ গান্ধীজীর সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিলেন। এই কুপ্রথা সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। আফ্রিকায় নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা গান্ধীজী এই অপমান যে কত মর্ম্মান্তিক তাহা জানিতেন।

গান্ধীজী চিন্তা করিলেন। স্থির করিলেন, এ বিষয়ে প্রথমে ভারত সরকারকে অনুরোধ করিবেন। পরে দেশবাসীর মতামত বুঝিয়া কার্য্য করিবেন। নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভাইস্রয় লর্ড চেমস্ফোর্ডকে পত্র দিলেন। ভাইসরয় তাঁহাকে দেখা করিতে জানাইলেন। ভাইস্রয়ের সহিত দেখা করিয়া এই কুপ্রথার ক্ষতিজনক পরিণাম সম্বন্ধে তিনি তাঁহার সহিত

আলোচনা করিলেন। ভাইস্‌রয় তাঁহাকে কোন প্রতিশ্রুতি দিলেন না, কেবলমাত্র মৌখিক সহানুভূতি জানাইয়া বিদায় দিলেন। গান্ধীজী হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। দেশের সামর্থ্যের দিকে মন দিলেন। দেশের মধ্যে এ সম্বন্ধে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল। গান্ধীজী বুঝিলেন, দেশ এই প্রথার প্রতিকার চায়। গান্ধীজী দেশের মনোবল জাগরিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন, দৈনিক পত্রিকায় এই প্রকার অন্যায়গুলির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন। আরো অনেক নেতা তাঁহার সহিত এই প্রতিবাদে যোগদান করিলেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার বিশিষ্ট ভারতীয সদস্যগণ এই প্রথা উচ্ছেদ করিবার জন্য আইন পাশ করাইতে চাহিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে ভাইস্‌রয় অনুমতি দিলেন না।

গান্ধীজী বুঝিলেন, সরকারের শুভ-বুদ্ধির উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, বরং দেশবাসীর দৃঢ় ইচ্ছাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। গান্ধীজী ভারতের বিভিন্ন স্থানে সভাসমিতি করিবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রথম সভার অধিবেশন বোম্বাই সহরে হইল। সভায় বহু আলোচনার পর স্থির হইল, ভাইস্‌রয়ের নিকট এই বিষয়ে এক ডেপুটেশন পাঠাইতে হইবে। ডেপুটেশনে ভাইসরয়কে জানাইয়া দেওয়া হইবে, যদি সরকার ১৯১৫ সালের ৩১শে জুলাই-এর মধ্যে ভারতের পক্ষে অবমাননাকর ঐ প্রথা উচ্ছেদ না করেন, তাহা হইলে দেশবাসী উহার বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

এবার ভাইস্‌রয় ডেপুটেশনের অনুরোধ সাগ্রহে শুনিলেন। তাঁহাদের প্রস্তাব বিশেষভাবে বিবেচনা করিবেন জানাইলেন।

গান্ধীজী কিন্তু ডেপুটেশন পাঠাইয়া চুপ করিয়া রহিলেন না। সমগ্র ভারতময় পরিভ্রমণ করিয়া এই বিষয়ে জনতাকে সজাগ করিয়া তুলিলেন। করাচী এবং কলিকাতা সহরেও বিরাট সভাসমিতির অধিবেশন হইল, লোকে উৎসাহ উদ্দীপনায় মাতিয়া উঠিল।

অবশেষে যেন সরকারের চৈতন্য হইল। তাঁহারা ঘোষণা করিলেন, 'এগ্রিমেণ্ট্ প্রথা' উঠাইয়া দেওয়া হইল।

হাজার হাজার দরিদ্র ভারতীয় শ্রমিক বিদেশী ধণিকের অত্যাচারের কবল হইতে উদ্ধার পাইল……বিদেশে ভারতীয় জাতির আত্মা অন্ততঃ একটি লাঞ্ছনার দায় হইতেও মুক্তি পাইল।

ভারতের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হইলে গান্ধীজী সত্যাগ্রহ করিবেন, এ বাসনা তাঁহার মনে ছিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তিনি নিজের শক্তিকে সত্যাগ্রহের জন্য যোগ্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, আর মুক্তির উপায় স্বরূপে সত্যাগ্রহের সাহায্য গ্রহণ করিতে দেশবাসী কতখানি প্রস্তুত ও উপযুক্ত তাহাও পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন।

ভারত ভ্রমণ করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন—ভারতের আত্মা মুক্তি চায়। কিন্তু তিনি ভাবিতেছিলেন যে, ভারত এই মুক্তি কি উপায়ে অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করে। অমিতশক্তিশালী বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রবল প্রযোগে মুক্তি-সংগ্রাম ঘোষণা করাকে তিনি অবজ্ঞা করিতেন না। কিন্তু মনে জানিতেন, উহা বহু সময়-সাপেক্ষ। আর অবজ্ঞা না করিলেও তিনি উহাকে সমর্থন করিতেন না। কারণ পশুশক্তির প্রয়োগে পশুশক্তিকে বিনাশ করা তাঁহার মনঃপূত ছিল না। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল, পশুশক্তিকে আত্মার নৈতিক শক্তির দ্বারা নিশ্চিতভাবে ও অল্পসময়ে পরাজিত করিতে পারা যায়। শত্রুকে বাহ্যিক আঘাত না করিয়া, নিজের অন্তরের একাগ্রতাযুক্ত দৃঢ় ইচ্ছার আঘাত দ্বারা দুর্ব্বল করা যায়। শত্রুকে অস্ত্রাঘাত না করিয়া নিজ ন্যায্য দাবীর জন্য অন্তরের সত্য ও ন্যায়ের আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া ভারতের অধিকারকে অর্জ্জন করিবার জন্য তাঁহার অন্তর এই সময় হইতে প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তখনও তাঁহার বিবেক আলোচনা অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্তের সমস্যায় দোল খাইতেছিল। তখনও তাঁহার মনে সন্দেহ হইতেছিল—দেশবাসী এই সত্যের অস্ত্রে সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবে কি না?

অবশ্য তাঁহার এ সন্দেহ ক্রমশঃ বিদূরিত হইয়াছিল। দেশবাসী যে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে শিখিতেছে—এই বোধ তাঁহার মনে একদিন আশার আলো জাগাইযাছিল। আর প্রয়োজন হইলে তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিবেন, এই ভরসা এবং বিশ্বাসও তাঁহার মনে জাগিয়াছিল।

মোট কথা, এগ্রিমেণ্ট্ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে সত্যাগ্রহের কোন স্পর্শ না থাকিলেও, ইহাকে ভারতের মাটিতে সত্যাগ্রহের ভূমিকা বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়।

আটত্রিশ

চম্পারণের নীলের বিষ

গান্ধীজী ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের ও কর্ম্মীগণের পরিচয়ের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ সাধারণ ভারতবাসীর নিকটেও পরিচিত হইয়া উঠিলেন। এগ্রিমেণ্ট্ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনই তাঁহাকে বিশেষভাবে জনসাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে স্থাপন করিল। সাধারণ ভারতবাসী তাঁহার প্রচেষ্টার নূতনত্বে ও বিশেষত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নেতার সম্মান প্রদর্শন করিল।

এখানে তাঁহার পরিকল্পনার নূতনত্ব ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে অল্প আলোচনা করিব। একথা সত্য যে গান্ধীজীর নেতৃত্ব-লাভের আগে ভারতে জাগরণের একটা সাড়া পড়িয়াছিল, ভারতবাসী আপন অধিকার সম্বন্ধে সজাগ ও সতর্ক হইয়াছিল। শাসন-বিষয়ে অধিকার-লাভের জন্য গোখলে, সুরেন্দ্রনাথ, তিলক প্রভৃতি নেতৃ-বৃন্দ আন্দোলনও করিয়াছিলেন, ভারতবাসীগণের মধ্যে ব্রিটিশ-শাসনের প্রতি আস্থার ভাবও কমিয়া আসিতেছিল। আত্মনির্ভরশীল হইবার জন্য প্রদেশে প্রদেশে একটা আলোড়নও মধ্যে মধ্যে জাগিতেছিল (বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন ইত্যাদি)। কিন্তু নেতা-গণের আন্দোলনের ধারা বৈপ্লবিক-ভঙ্গি বর্জ্জিত ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানের বদলে আবেদন-নিবেদন ও প্রার্থনার ভাবটাই তখন বেশী পরিমাণে ছিল। অধিকার যেন একটা চাওয়ার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং প্রার্থনা পূর্ণ না হইলে নেতাগণের মান ও অভিমান জাগ্রত হইয়া বক্তৃতামঞ্চে তুবড়ীর সহস্র ধারার মধ্যে ফাটিয়া পড়িত। জনসাধারণের অন্তর কিন্তু নেতাগণের কার্য্যকলাপে সন্তোষ লাভ করিতেছিল না, সাধারণ ভারতীয়গণ অধিকার লাভের জন্য প্রার্থনা এবং অনুনয়ের পালা শেষ করিয়া নূতন ও সক্রিয় কর্ম্মপন্থার আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। কিন্তু নূতনতর দৃষ্টিভঙ্গিযুক্ত পরিচালকের অভাবে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা হতাশায় পরিণত হইতে চলিয়াছিল। ঠিক এমন সময় গান্ধীজী তাঁহার নূতন দৃষ্টিভঙ্গি

লইয়া ভারতের ভাগ্যাকাশে উদয় হইলেন, প্রয়োগ করিতে চাহিলেন তাঁহার বিনীত অথচ চরম কৌশল। সরকারকে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য, দাবীর পূরণের জন্য, মামুলী নরমপন্থীদের মত প্রথমে অনুরোধ করিব, কিন্তু সে অনুরোধ যখন প্রত্যাখ্যাত হইবে, তখন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও সঙ্কল্প লইয়া সরকারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইব, একটা নির্দ্দিষ্ট ও চরম দাবী করিয়া সক্রিয় সংগ্রামক্ষেত্রে (অবশ্য অহিংসা-সংগ্রাম) অবতীর্ণ হইব, সরকারকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিব।

নরমপন্থী নেতাগণের একঘেয়ে আবেদন-নিবেদনের পালার মধ্যে ক্লান্ত ও হতাশ জনমন ঠিক যেন এইরকম একটা চরম পন্থাই কামনা করিতেছিল। তাই তাহারা গান্ধীজীকেই নেতারূপে বরণ করিল। অল্পদিনের মধ্যেই গান্ধীজীর জয়ধ্বনিতে ভারতের আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিল।

এখন আমরা গান্ধীজীর জীবনের ঘটনাগুলির বর্ণনার ভিতর দিয়া তাঁহার অবিসম্বাদিত নেতৃত্বলাভের এই ইতিহাস রচনা করিব।

গান্ধীজী এগ্রিমেণ্ট্ প্রথার উচ্ছেদের মধ্যেও আশ্রমের কার্য্যে লিপ্ত রহিলেন। আশ্রমবাসীগণকে যেরূপ সংযমী ও আত্মনির্ভরশীল হইতে ব্যবস্থা করিলেন, নিজেও সেইরূপ ক্রমশঃ অধিকতর সংযম ও আত্মনির্ভরশীলতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত কার্য্যের ভিতর দিয়া তাঁহার মনে অভিনব ধারণা ও আদর্শের উদ্ভব হইতে লাগিল। তিনি চিন্তা অনুশীলনী ও বিবেচনার দ্বারা ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনে সত্যাগ্রহ অস্ত্রের প্রয়োগ এবং ঐ অস্ত্রের সহিত অহিংসার যোগাযোগের বিষয় নির্দ্ধারিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে সত্যাগ্রহ ও অহিংসাকে এক আদর্শে যুক্ত করিলেন এবং সময় ও সুযোগ বুঝিয়া উহাকে প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন।

১৯১৭ সালে লক্ষ্ণৌ সহরে ভারতের জাতীয় মহাসভার অধিবেশন বসিল। গান্ধীজীও তখন একজন পরিচিত নেতা হইয়া উঠিয়াছেন। ফলে তিনি

আহ্বান পাইয়া ঐ অধিবেশনে গুজরাটের একজন প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইলেন।

গান্ধীজীর আফ্রিকার সংগ্রামের কথা সাধারণ শিক্ষিত লোকে জানিয়াছিল, কিন্তু সাধারণ অশিক্ষিত ও গ্রামবাসীগণ উহা জানিবার অবসর পায় নাই। তবে 'এগ্রিমেন্ট্ প্রথা' লইয়া নূতন আন্দোলনের আয়োজনের পর হইতে অনেক গ্রাম্য ও অশিক্ষিত লোকও তাঁহার কথা জানিতে পারিল এবং সেই জানার ভিতর দিয়াই কৌতূহলবশে আরো জানিবার আগ্রহ প্রকাশের ফলস্বরূপ তাঁহার আফ্রিকার কীর্ত্তির কথাও শুনিল। শুনিবার পর হইতে নিজেদের চিরপ্রচলিত দুঃখ-দুর্দ্দশার বিরুদ্ধে গান্ধীজীর সাহায্য ও সহানুভূতির প্রত্যাশা করিতে লাগিল।

বিহার প্রদেশের চম্পারণ নামক গ্রামের রাজকুমার শুক্ল নামে একজন অশিক্ষিত গ্রামবাসী ক্রমশঃ গান্ধীজীর কার্য্যকলাপে মুগ্ধ ও আশান্বিত হইয়া উঠিযাছিলেন। তিনি তাই উদ্দেশ্য লইযা লক্ষ্ণৌ সহরে আসিলেন, লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় গান্ধীজীর সহিত দেখা করিলেন, দেখা করিয়া গান্ধীজীকে নিজের গ্রাম ও আশপাশের গ্রামগুলির একটি বহুদিন প্রচলিত দুঃখজনক প্রথার বিরুদ্ধে নিবেদন করিলেন এবং ইহার প্রতিকারের উপায় জানিতে চাহিলেন।

এই প্রথাটি চম্পারণ ও তাহার আশপাশের অনেকগুলি গ্রামের নীলচাষের প্রথা। ঐ সকল স্থানের জমিদারগণ বেশী খাজনার লোভে তাঁহাদের জমি নীলকর ইংরাজ সাহেবদের নিকট বিলি করিয়াছিলেন। ফলে ইংরাজ সাহেবগণই ঐ সকল জমির প্রভু হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা ঐ জমিতে লাভ-জনক নীলের চাষ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গ্রামবাসীগণকে আদেশ দিয়াছিলেন—প্রত্যেকে নিজ চাষের জমির প্রতিবিঘার মধ্যে অন্ততঃ তিনকাঠা জমি নীলচাষের জন্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিবে এবং উহাতে আর কিছু ফসল না বুনিয়া একমাত্র নীলের চাষই করিবে। সাহেব জমিদারগণ এই সর্ত্তের করাড়েই

চাষীগণকে জমি বিলি করিয়াছিলেন। কাজেই এই সর্ত্ত পালন না করিয়া আইনতঃ গ্রামবাসীগণের অন্য উপায়ও ছিল না। কিন্তু ইহাতে দরিদ্র গ্রামবাসী-গণের দারিদ্র্যের জ্বালা আরও বাড়িয়া গেল। নীলচাষে তাহাদের কোন সুবিধাই হইত না, অথচ নীলচাষ বন্ধ করিবার অধিকার ও ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। খাদ্যশস্য চাষ না করিয়া সাহেব জমিদারগণের ভয়ে তাহাদিগকে নীলের চাষ করিতে হইত। ইহাতে সময় ও পরিশ্রম নষ্ট হইত, অভাব ও দুঃখের বোঝা আরো বাড়িয়া উঠিত, ঘরে ঘরে দারিদ্র্যের হাহাকার জাগিত। প্রতিবিধানের উপায় না পাইয়া দুর্ব্বল অশিক্ষিত গ্রামবাসী হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িত। আমাদের বাংলায় নীলচাষের ইতিহাসও এইরূপ বা ইহা অপেক্ষা আরো বেশী করুণ ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ চম্পারণের পূর্ব্বেই এই চাষ বাংলায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। চম্পারণের অধিবাসী রাজকুমার শুক্লও এইরূপ একজন নিপীড়িত নীলচাষী। কিন্তু নিপীড়িত হইলেও পীড়নের আধিক্যে তিনি চরম মতাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ঐ সময়ে বিধাতার ইচ্ছাবলেই হযত গান্ধীজীর নাম ও কার্য্যকলাপ শুনিয়াছিলেন। তিনি তাই অনেক আশা লইয়া গান্ধীজীর নিকট আবেদন ও দুঃখ জানাইতে লক্ষ্নৌ আসিলেন।

গান্ধীজী তাঁহার কথা মন দিয়া শুনিলেন,……নূতন একটা অভিজ্ঞতা লাভ করিযা দুঃখ পাইলেন। রাজকুমার ও তাঁহার সঙ্গী এক উকিলের মুখ হইতে চম্পারণ প্রভৃতি গ্রামগুলির নীলচাষ ও চাষীগণের দুর্দ্দশা একে একে জানিয়া লইলেন। তিনি এ বিষয়ে অন্যান্য কয়েকটি সাধারণ নেতার সহিত আলোচনা করিলেন। পরে এই দুর্দ্দশার সম্বন্ধে একটি প্রস্তাবও জাতীয় মহাসভার সাধারণ অধিবেশনে উত্থাপন করিলেন। কিন্তু বুঝিলেন নেতাগণ ঐ বিষয়ে প্রস্তাব পাশ করাইয়াই দায় হইতে খালাস হইলেন, আর বিশেষ কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা করিতে, আলোচনা ও সময় নষ্ট করিতে রাজী হইলেন না বা আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। গান্ধীজী বুঝিলেন ইহার সহিত গ্রামবাসীগণের নিজেদের স্বার্থ জড়িত। অতএব মহাসভা সাড়া না দিলেও গ্রামবাসীগণকে

স্বাবলম্বী হইতে হইবে, নিজেদের পায়ের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। গান্ধীজী প্রতিকারের চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজকুমারকে সময়মত আবার তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিলেন।

ইতিমধ্যে গান্ধীজী কলিকাতায় আসিলেন। কিন্তু চিন্তা করিতে করিতে তিনি যেন অকস্মাৎ একটা নূতন পথের সন্ধান পাইলেন,—তাইত, এ বিষয়ে সত্যাগ্রহ করিলে হয়ত ভাল ফল পাইব!

গান্ধীজীর হৃদয় আশায় উদ্বেল হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যে রাজকুমার আবার কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। গান্ধীজী বুঝিলেন এই লোকটি এবং গ্রামবাসীরাও প্রতিকারের জন্য সত্যই আগ্রহান্বিত। তবুও তিনি রাজকুমারকে বলিলেন, 'প্রয়োজন হইলে সরকারের বিরুদ্ধে যাইতে হইবে ......হয়ত জেলে যাইতে হইবে। পারিবে ত?'

নাছোড়বান্দা রাজকুমার জানাইলেন, এ দুর্দ্দশা ও অত্যাচার ভোগ করা অপেক্ষা জেলও তাঁহারা কামনা করেন, তবু ইহার নির্দ্দিষ্ট প্রতিকার চান।'

গান্ধীজী আশ্বস্ত হইলেন। ভারতের মাটিতে তাঁহার এই প্রথম সংগ্রামে যোদ্ধার দল পাইবেন বুঝিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি রাজকুমারকে ভরসা দিলেন যে এই নীলচাষের প্রতিবিধানের জন্য তিনি তাঁহাদের সাহায্য করিবেন।

কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, এ বিষয়ে আরো অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, গ্রাম ও গ্রামবাসীগণের অবস্থা প্রত্যক্ষ দর্শন করা প্রয়োজন, গ্রামবাসীগণের ইচ্ছা ও মনোবল জানা আরো বিশেষ প্রয়োজন। এইসব প্রয়োজনের তাগিদেই তিনি রাজকুমারের সহিত চম্পারণ যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি কলিকাতা হইতে বিহার গমন করিলেন।...

বন্দোবস্ত অনুসারে পাটনা সহরে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখন পাটনায় ছিলেন না, কিন্তু গান্ধীজী স্থানীয় অন্যান্য নেতাগণের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিলেন, আলোচনার শেষে

আশার আলো দেখিতে পাইলেন। পাটনা হইতে আরও দুই-একজন সঙ্গী লইয়া চম্পারণে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

এই সময়ে তাঁহার জীবনের কয়েকজন প্রিয় ও দেশবরেণ্য সহকর্ম্মীর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং চম্পারণের কাজের ভিতর দিয়া সেই প্রথম সাক্ষাৎ শেষে পরম হৃদ্যতায় পরিণত হয়। পাটনার স্বনামধন্য নেতা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই চম্পারণ সত্যাগ্রহের সময়েই প্রথম গান্ধীজীর সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে মিলিত হন এবং চম্পারণে গান্ধীজীর অনুগামী ও সহকারীরূপে কাজ করেন। এই সময়ে আচার্য্য কৃপালনীও গান্ধীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহার দলে যোগদান করিয়া ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে অবতীর্ণ হন। এই সময়ে অথবা ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার জীবনের ও আদর্শের অন্যতম সহকর্ম্মী সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলও তাঁহার স্নেহ ও প্রীতিলাভ করিয়া ধন্য হন। চম্পারণের ক্ষীণ কর্ম্মস্রোত হইতে গান্ধীজী যেদিন ভারতের মুক্তির জন্য বিপদসঙ্কুল কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, সেদিনও তাঁহার এইসব সহকর্ম্মী ও ভক্ত বিশ্বাসীর দল তাঁহার সহিত অকপট-ভাবে দেশের ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন……স্বাধীনতা লাভের পর যেদিন ভারতের ও বিশ্বের কল্যাণের আশায় অস্পৃশ্যতা ও সাম্প্রাদায়িকতার উন্মত্ততা দূর করিবার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেদিনও তাঁহার এই সব যোগ্য অনুগামীর দল তাঁহার আরব্ধ অথচ অসমাপ্ত কাজ সার্থক ও সম্পূর্ণ করিবার জন্য দৃঢ়চিত্তে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গান্ধীজীর জীবনের ঘটনা-স্রোতের সহিত তাঁহার এই সকল সঙ্গী ও ভক্তের জীবনগুলিও অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত।

এইবার গান্ধীজী তাঁহার নিজস্ব পন্থায় চম্পারণে কার্য্য করিতে উদ্যত হইলেন। চাষীদের হইয়া চরম কিছু করিবার পূর্ব্বে তিনি স্থানীয় সরকারকে ও নীলকর সাহেবদের চাষীদের দুঃখ, অভিযোগ ও দুঃখের প্রতিকারের বিষয় অবগত করাইবার জন্য পত্র লিখিলেন। তিনি স্থানীয় কমিশনার, বিভাগীয়

কলেক্টর জমিদার সাহেবগণের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া পত্র দিলেন।

সাহেবগণ ত তাঁহার আগমন ও উদ্দেশ্যের কথা জানিতে পারিয়া ভয়ানক চটিয়া গেলেন। তাঁহারা কড়া জবাব দিয়া জানাইলেন, গান্ধীজী একজন অচেনা বিদেশী, স্থানীয় চাষীদের মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে তাঁহার দরদ দেখাইবার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি যদি নিজের ভাল চান, তাহা হইলে যেন অবিলম্বে চম্পারণ জেলা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তাঁহাদের উত্তর পাইয়া গান্ধীজী একটু হাসিলেন। সঙ্গী ও সহকর্ম্মীদের সহিত আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন, কাজ যদি করিতেই হয়, চাষীদের দুঃখমোচনের জন্য যদি শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রামই করিতে হয়, তাহা হইলে চাষীদের ভিতরে থাকিয়াই তাহা করা ভাল। ইহাতে চাষীরা তাহাদের দুঃখ সম্বন্ধে সচেতন হইবে, এবং হয়ত প্রেরণা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া নিজেরাই নিজেদের দুঃখমোচনের জন্য চেষ্টা করিবে। সেইজন্য সকলে সঙ্কল্প করিলেন, চম্পারণের মতিহারী গ্রাম এবং রাজকুমার শুক্লের বাসভূমি বেতিয়া গ্রামে আগে যাইতে হইবে। তাঁহারা সঙ্কল্প অনুযায়ী গ্রামের দিকে যাত্রা করিলেন।

বিভাগীয় কমিশনার গান্ধীজীর পত্রের উত্তর দেন নাই, কিন্তু তাঁহার গতি-বিধির সমস্ত সংবাদ ঠিকমত সংগ্রহ করিতেছিলেন। গান্ধীজী গ্রামের ভিতর যাইতেছেন শুনিয়া তিনি তাঁহাকে থানায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। গান্ধীজী এই আহ্বানের অর্থ পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু কমিশনার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবেন বুঝিতে পারিয়াও তাঁহার কাছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। গান্ধীজী জানিতেন সত্যাগ্রহীর পক্ষে সকল সময়ে কষ্ট ও দণ্ডকে বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত, আর চাষীদের এই কাজে তিনি যখন নেতৃত্ব ও দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার গ্রেপ্তার হইয়া এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম আদর্শ স্থাপন করা উচিত। গান্ধীজী সঙ্গীদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া থানায় গমন করিলেন। কমিশনার তাঁহাকে প্রদেশের শাসনকর্ত্তার আদেশনামা দেখাইয়া আটক করিলেন।

তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়া যে কাজ করিতে চাহিয়াছিলেন, এইবার তাঁহার গ্রেপ্তারে সেই কাজ অনেকটা আগাইয়া গেল। তাঁহার আসার সংবাদ গ্রামবাসীরা শুনিয়া আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এবার তাঁহার গ্রেপ্তারের দুঃসংবাদ শুনিয়া তাহারা দুঃখিত ও বিচলিত হইয়া উঠিল। বিচারের দিন দলে দলে গ্রামবাসী আসিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত ঘিরিয়া ফেলিল। কিন্তু তাঁহার সঙ্গী ও সহকর্ম্মীদের প্রচেষ্টা ও প্রচারের জন্য তাহারা উত্তেজনা ও প্রতিবাদ প্রকাশ না করিয়া অহিংসভাবে বিচার ফলের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। বিচারের দিন গান্ধীজী তাঁহার গ্রামে আসার সম্বন্ধে আদালতে যে জবাব দিলেন, তাহা যেমন অভিনব, তেমনি সত্যাগ্রহ ও কর্ম্মপন্থার দিক দিয়াও অভ্রান্ত মতবাদ যুক্ত। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটকে নিজ জবানবন্দীতে জানাইলেন—'সরকার আমাকে ১৪৪ ধারার অভিযোগ অনুসারে (বিনা অনুমতিতে লোক জমায়েৎ—অশান্তি সৃষ্টি করা ইত্যাদি) গ্রেপ্তার করিযাছেন। দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে প্রদত্ত হুকুম অমান্য করার ন্যায় গুরুতর কার্য্য আমি কেন করিয়াছি সে বিষয়ে আদালতকে সংক্ষেপে কিছু জানাইতে ইচ্ছা করি। আমার মতে বস্তুতঃ ইহা আইন-অমান্যের প্রশ্ন নয, ইহা স্থানীয় সরকারের সহিত আমার মতভেদের প্রশ্ন। এই প্রদেশে জনসেবা ও দেশসেবা করার জন্য প্রবেশ করিযাছি। রায়তের সহিত নীলকরের ন্যায়ানুমোদিত ব্যবহার নাই, এই জন্য রায়তদিগকে সাহায্য করার নিমিত্ত আমাকে খুব আগ্রহ সহকারে কেহ কেহ ডাকিয়াছে বলিয়া আমাকে আসিতে হইযাছে। সমস্ত বিষয়টা ভাল করিয়া না জানিয়া আমি তাহাদিগকে কেমন করিয়া সাহায্য করিব? সেই জন্য আমি এই বিষয় বুঝিতে—সম্ভব হইলে সরকার ও নীলকরের সাহায্যেই বুঝিতে—আসিয়াছি। আমার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। আমার আসার জন্য লোকের মধ্যে শান্তি ভঙ্গ হইবে, খুনাখুনি হইবে একথা আমি স্বীকার করি না। এই বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা খুব খাঁটি—ইহা আমি দাবী করিতেছি। কিন্তু সরকারের বিচার এই বিষয়ে আমার বিপরীত। তাঁহাদের

অসুবিধা আমি বুঝিতেছি। আমি ইহাও স্বীকার করি—তাঁহারা যে প্রকার অবস্থার সংবাদ পান, তাহারই উপর তাঁহাদের বিশ্বাস রাখিতে হয়। আইন-অমান্যকারী প্রজা হিসাবে আমার উপর যে হুকুম হইয়াছে, উহা মান্য করাই স্বাভাবিক হইত। কিন্তু তাহা করিলে, আমি যাহাদের জন্য এখানে আসিয়াছি তাহাদিগকে আঘাত করা হয় বলিয়া আমার ধারণা। আমার মনে হয় যে, তাহাদের সেবা আমি আজ তাহাদের মধ্যে থাকিয়াই করিতে পারি। সেই জন্য স্বেচ্ছায় চম্পারণ ছাড়িতে পারি না। এই ধর্ম্ম-সঙ্কটে আমাকে চম্পারণ হইতে সরাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের উপর না ফেলিয়া পারি না। আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে উপরি উক্ত পথ গ্রহণ করায় যে দৃষ্টান্ত লোককে দেখানো হয়, তাহার দায়িত্ব আমি খুব বুঝিতেছি। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার মত অবস্থায় পতিত আত্মসম্মানশীল মানুষের পক্ষে এই হুকুম অমান্য করা এবং এজন্য যাহা সাজা হয় তাহা গ্রহণ করা ব্যতীত অন্য কোনও সম্মানজনক পথ নাই। আমাকে কম করিয়া সাজা দেওয়া হোক্, এই জন্য এই উক্তি আমি করিতেছি না। আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তৃত্বের অস্বীকার করাই আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু আমার অন্তরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিয়ন্তার যে নিয়ম আমি স্বীকার করি, তাঁহার প্রতি আমার অন্তরাত্মার আহ্বান স্বীকার করাই আমার এই আদেশ অমান্যের উদ্দেশ্য বলিয়া আমি জানাইতেছি।"

তাঁহার এই অভিনব উত্তর শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট কি রায় দিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। তাহা ছাড়া আশ-পাশের গ্রামগুলির জাগরণেও কর্ত্তৃপক্ষ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার মুলতুবী রাখিয়া এ বিষয়ে বিহার সরকারকে ও গভর্ণরকে পত্র দিলেন। নিজের উদ্দেশ্য কর্ম্মপন্থা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা জানাইয়া গান্ধীজী নিজেও স্বয়ং ভাইস্‌রয়কে একখানি পত্র দিয়া সব জানাইলেন।

ফলে সরকারের ছোট বড় বিভাগগুলির ভিতর একটা দ্রুত অনুসন্ধান

চলিল। আর ঐ অনুসন্ধানের পরিণামস্বরূপ স্থানীয় শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ গান্ধীজীর বিরুদ্ধে যে আইনভঙ্গের মামলা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা তুলিয়া লইলেন। তাঁহারা জানাইলেন, গান্ধীজী যদি কোন প্রকার অভিপ্রায় না লইয়া গ্রামে যাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা আর তাঁহার গতিরোধ করিয়া বিধিনিষেধ আরোপ করিবেন না।

গান্ধীজী মুক্ত হইলেন। ভারতে তাঁহার প্রথম ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ জয়লাভ করিল। তিনি সরকারের অন্যায় বিধির প্রতিকার করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে সরকারকে সর্ব্বপ্রথম সবিশেষ অবগত করাইযাছিলেন। সরকার শাস্তির ভয় দেখাইলেন, গান্ধীজী নির্ভীকভাবে অথচ বিনীতভাবে সরকারের আদেশকে অমান্য করিতে উদ্যত হইলেন। সরকার পরাজিত হইলেন।

এ এক অভূতপূর্ব্ব ও অসাধারণ যুদ্ধ-কৌশল। এ কৌশলে গান্ধীজী প্রথমেই সাফল্য অর্জ্জন করিলেন। অহিংস সত্যাগ্রহ বিষযে তাঁহার বিশ্বাস বাড়িল এবং সমগ্র দেশবাসীরও অহিংসায ও সত্যাগ্রহে বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। তাঁহার চম্পারণের কীর্ত্তি ভারতের সকল দেশের কাগজে কাগজে আলোচিত হইতে লাগিল। গান্ধীজীর নাম সম্পাদকীয প্রবন্ধের শিরোনামা হইযা উঠিল।

এই স্থানীয় বিষয লইয়া গান্ধীজী কিন্তু এত হৈ-চৈ পছন্দ করিলেন না। তিনি তাই পত্রিকাগুলিকে এ বিষযে প্রচার করিতে নিষেধ করিয়া পত্র লিখিলেন, পত্রিকা মারফৎ সাধারণকে জানাইলেন যে, এ বিষযে হৈ-চৈ করিলে চম্পারণের গ্রামবাসীগণের পক্ষে ক্ষতি হইবে।

এইবার তিনি চাষীদের জন্য প্রকৃত কাজে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি তাঁহার সঙ্গী ও প্রদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের লইয়া চাষীদের দুঃখ-দুর্দ্দশা ও অভাব-অভিযোগ বিষয়ে সঠিক সংবাদ লইবার জন্য একটি বেসরকারী তদন্ত-সমিতি গঠন করিলেন। গ্রামগুলির মধ্যে এই সমিতির সামনে সাক্ষ্য দিতে চাষীদের নিকট আবেদন প্রচার করিলেন। চাষীভাইগণ উৎসাহিত হইয়া উঠিল। গান্ধীজীর কার্য্য দেখিয়া তাহারা সরকারের শাস্তিকে অগ্রাহ্য করিতে শিক্ষা

করিল। তাহারা এবার দলে দলে আসিয়া সমিতির নিকট নীলকর সাহেবদের অনাচার ও অত্যাচারের বিষয়ে অনেক দুঃখের কাহিনী জানাইতে লাগিল।

চাষীদের এই জাগরণ, সাহস ও একতা দেখিয়া প্রাদেশিক সরকারও চিন্তিত হইয়া উঠিলেন, প্রাদেশিক গভর্ণর ভারত সরকারের সহিত মতামতের আদান-প্রদান করিতে লাগিলেন। অবশেষে গভর্ণর স্বয়ং গান্ধীজীকে এক পত্র দ্বারা জানাইলেন, চম্পারণের চাষী ও নীলকর সাহেবদের বিষয়ে প্রাদেশিক সরকার একটি সরকারী তদন্ত-সমিতি গঠন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। গভর্ণর আশা করেন যে গান্ধীজী এই সমিতির একজন সভ্য হইযা এই তদন্তকার্য্যে সরকারকে সাহায্য করিবেন।

পত্র পাইয়া গান্ধীজী তাঁহার সঙ্গীদের সহিত আলোচনা করিলেন এবং সরকারকে জানাইলেন, তিনি অন্যাযের প্রতিকারের জন্য সব সময়েই সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছেন, কারণ নিজ অন্যায়ের প্রতি সরকারের শুভবুদ্ধি জাগিলে প্রজাপুঞ্জকে আর কোন অপ্রিয় ও বেদনাদাযক প্রতিকারের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না। তিনি সরকারকে উহার সঙ্কল্পের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

সরকারী সমিতির তদন্তেও কিন্তু বেসরকারী সমিতির সিদ্ধান্তগুলিই প্রমাণিত হইল। নীলকর জমিদারগণ কিরূপ অমানুষিকভাবে চাষীদের উপর অত্যাচার করেন, তাহা সাক্ষীদের সাক্ষ্যে বারবার প্রকাশিত হইয়া পড়িল। চাষীদিগের প্রতি অত্যাচারের অমানুষিক কাহিনী শুনিযা সমিতির সভ্যগণ পর্য্যন্ত দুঃখিত হইলেন। সমিতি চাষীদের পক্ষে তদন্তফল প্রকাশ করিলেন।

অতঃপর বিহার সরকার একটি উদারতার কার্য্য করিলেন। সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চাষীদের বাধ্যতামূলক 'তিনকাঠা' নীল চাষের দায় হইতে মুক্তি দিলেন। চম্পারণের দরিদ্র গ্রামবাসীগণ নীলের বিষ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

ত্রেতাযুগের কাহিনী……

সমুদ্র হইতে বিষ উঠিয়া সৃষ্টি ধ্বংস করিতে উদ্যত হইল……

বিষে জর্জ্জরিত দেবতার দল প্রাণ ও সৃষ্টিরক্ষার জন্য দেবাদিদেব মহাদেবের শরণ গ্রহণ করিলেন······

আশুতোষ হাসিমুখে সেই বিষ পান করিলেন······

অসহায় দেবতাগণকে রক্ষা করিলেন······

বিষ কণ্ঠে ধারণ করিলেন······

নীলকণ্ঠ হইলেন।

এই যুগের ইতিহাস······

চম্পারণের নীলের বিষ নিরীহ অসংখ্য গ্রামবাসীদের ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছিল······

নীলের অত্যাচারে জর্জ্জরিত গ্রামবাসী ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্যাগ্রহীর শরণ গ্রহণ করিলেন······

সত্যাগ্রহী গান্ধীজী নির্ব্বিকার চিত্তে সেই নীলের বিষ পান করিলেন······

অসহায় গ্রামবাসীগণকে রক্ষা করিলেন······

নীলের বিষ নিজে গ্রহণ করিলেন······

তিনি জয়ী হইলেন।

কিন্তু সরকার তাঁহার উপরে নির্ব্বিকার ও উদার ব্যবহার করিলেও, একমাত্র তিনিই জানিতে পারিলেন, সরকার এই ব্যাপারে তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন,······তাঁর শত্রু হইয়া উঠিলেন।

সত্যাগ্রহী গান্ধীজী সমস্ত বুঝিলেন,···কিন্তু নিজ অন্তরের সত্যকে স্মরণ করিয়া নির্ভয় অন্তরে প্রশান্ত হাসি হাসিলেন!

এইবার চম্পারণের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের বিষয় বাদ দিয়া উহার আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে এখানে কিছু বলা প্রযোজন। চম্পারণে কাজ করিতে যাইয়া গান্ধীজী বুঁঝিলেন, ভারতের দুর্দ্দশার মূল কারণ কোথায়। তিনি দেখিলেন, প্রায় সকল গ্রামবাসীই অশিক্ষিত, অপরিচ্ছন্ন এবং কুসংস্কারের অগাধ পঙ্কে নিমজ্জিত। গ্রামবাসীরা নিজেদের ত্রুটিতে নিজেরাই কষ্ট পায়,

আবার বোধশক্তি ও উচ্চতর চিত্তবৃত্তির অভাবে নিজেদের দুঃখ, বেদনা ও অত্যাচার বুঝিতে পারে না, এমন কি বুঝিতে চায়ও না'। দুঃখ ও অভাবকে, অত্যাচার ও উৎপীড়নকে নিজেদের বিধিলিপি বলিয়া হতাশ হৃদয়ে গ্রহণ করে।

চম্পারণে এই মূর্খতা ও অজ্ঞতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ গান্ধীজী পাইলেন। সেখানকার যুবকদল কাজ না করিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া সময় নষ্ট করে, স্ত্রীলোকেরা চারিটি কি ছয়টি পয়সায় সারাদিন নীলক্ষেতে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে। এই হীনতাকে তাহারা তাহাদের ভাগ্যলিপি বলিয়া অসঙ্কোচে স্বীকার করিয়া লয়। গান্ধীজী বুঝিলেন, গ্রামবাসীর এই অশিক্ষা, কুসংস্কার ও অপরিচ্ছন্নতা দূর করিতে না পারিলে তাহাদের ন্যায্য ও সত্য অধিকার বিষয়ে তাহারা কোনদিনই যথার্থ দাবী করিবার যোগ্য হইতে পারিবে না। অন্যায় কি, অন্যায়ের প্রতিকার কি, তাহাদের প্রাপ্য ও অধিকার কি, শিক্ষা ও সংস্কারের অভাবে ইহার কোনটিই তাহারা বুঝিতে পারিবে না।

গান্ধীজী তাই নীলের সত্যাগ্রহের সঙ্গে গ্রামবাসীগণের মানসিক উন্নতি বিষয়েও বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি তাঁহার কর্ম্মীগণের সহিত এই বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিলেন, তাঁহার আমেদাবাদের আশ্রম হইতে নারী কর্ম্মীদের চম্পারণে লইয়া আসিলেন। সেবায় ও পালনে মেয়েরাই বেশী দক্ষ এই বিবেচনায় মেয়েদের উপরেই শিক্ষা ও সেবার ভার বেশী করিয়া অর্পণ করা হইল। মেয়ের দল গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, সাধারণ বালক-বালিকা ও গ্রাম্য রমণীদের অজ্ঞতা দূর করিবার কাজে তাঁহারা আত্মনিয়োগ করিলেন। দলে দুই-এক জন চিকিৎসকও ছিলেন, তাঁহারা গ্রামবাসীগণের নোংরামি, ঘা-পাঁচড়া ইত্যাদি বিষয়ে অনেক উপদেশ ও সাবধান বাণী শুনাইলেন, প্রয়োজন হইলে অধিবাসীগণের রোগে সেবা ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। পুরুষ কর্ম্মীদেরও অনেকে এ-গ্রামে ও-গ্রামে ছড়াইয়া পড়িলেন। দিনে হৌক আর রাত্রে হৌক, সুবিধা মত বয়স্ক লোকেদের শিক্ষা দিতে লাগিলেন। প্রাথমিক শিক্ষার ভিতর দিয়া আচার-ব্যবহার, রীতি-

নীতি, ন্যায়-অন্যায় স্বাস্থ্যরক্ষা এইসব বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই প্রচেষ্টার ফলে কিছুদিনের মধ্যে বেশ একটা স্পষ্ট পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেল। গ্রামবাসীগণের মধ্যে একটা যেন অনুশোচনা ও আত্মচেতনার ভাব জাগিতে লাগিল। গ্রামোন্নয়নের কাজের এই সাফল্যেও গান্ধীজী আশান্বিত হইয়া উঠিলেন। ইহা অপেক্ষা আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁহার এই পরীক্ষিত প্রণালীকে প্রয়োগ করিয়া দেশবাসীকে সজাগ ও সচেতন করিতে উৎসাহিত হইলেন। আমরা দেখিয়াছি, গান্ধীজী ভারতের গ্রাম ও গ্রামবাসীগণের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য কত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, কত অভিনব ও বাস্তব পন্থা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার চেষ্টা দ্বারা আমাদের জানাইয়া গিয়াছেন,—ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামের অধিবাসীগুলির স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও চরিত্রবলেই ভারতের লুপ্ত শক্তি আবার তাহার গৌরবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবে।

ঊনচল্লিশ

শোষিত শ্রমিকের জাগরণ

চম্পারণের চাষীদের নীলের বিষ হইতে উদ্ধার করিয়া গান্ধীজী বিশ্রাম পাইলেন না, অথবা সবরবতীর সত্যাগ্রহ আশ্রমে যাইয়া আশ্রমের কাজেও একান্তভাবে মন দিবার সময় পাইলেন না।

নূতন দুইটি সমস্যা আসিয়া তাঁহার সামনে উপস্থিত হইল। একটি আমেদাবাদে শ্রমিক অসন্তোষ, আর একটি গুজরাট প্রদেশের খেড়া জেলার খাজনা বন্ধ আন্দোলন।

১৯১৮ সালে কোন কর্ম্মীর মারফৎ গান্ধীজী আমেদাবাদ সহরের দরিদ্র শ্রমিকদের উপর মিলমালিকদের অন্যায় ও অবিচারের এক করুণ ইতিহাস শুনিতে পাইলেন। মিলমালিকগণ মজুরদের যে পরিমাণে পরিশ্রম করাইতেন, সেই হারে তাহাদিগকে পারিশ্রমিক দিতেন না। অল্পবেতনে শ্রমিকদের জীবনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য 'খাওয়া-পরা' পর্য্যন্ত সবদিন জুটিত না। শ্রমিকরা মালিকদের জন্য রক্ত জল করিয়া খাটিবে, আর শ্রমিকদের আধপেটা খাওয়াইয়া ধনী ব্যবসায়ীগণ টাকা ব্যাঙ্কে জমাইবে, ইহা গান্ধীজীর চিন্তায় অন্যায় ও অসত্য বলিয়া মনে হইল। তিনি এই অসত্যকে দূর করিতে চেষ্টা করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। আমেদাবাদের মিলমালিক ও শ্রমিকদের সম্পূর্ণ বিবরণ জানিবার জন্য আমেদাবাদে তিনি গেলেন। শ্রমিকদের দুঃখদুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিলেন, বেতন ন্যায্যভাবে বৃদ্ধি হইলে তাহাদের দুঃখের খানিকটা লাঘব হইতে পারে তাহা বুঝিলেন। এইবার মালিকদের সহিত দেখা করিলেন। মালিকদের কেহ কেহ গান্ধীজীকে জানিতেন, কেহ কেহ গান্ধীজীকে ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধাও করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য বিপন্ন দেখিয়া সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা মিষ্ট কথা বলিয়া আর শ্রমিকদের প্রতি বাহ্যিক সহানুভূতি দেখাইয়া গান্ধীজীকে জানাইলেন—'আমাদের ও আমাদের

মজুরদের মধ্যে বাপ-বেটা সম্বন্ধ,…তাহার মধ্যে অন্য কেহ আসিয়া পড়িলে আমরা কেমন করিয়া সহ্য করিব—ইহার মধ্যে আবার অন্যলোকের সালিশী হইবে কেন ?'

গান্ধীজীও হাসিয়া জানাইলেন, 'আপনাদের কথা মিষ্ট' কিন্তু উহা মিথ্যায় পরিপূর্ণ, বাস্তবে আপনারা শ্রমিকদের মঙ্গল চাহেন না, মুখে পিতা-পুত্রের উদাহরণ দিতেছেন। বেশ, তাহা হইলে উহাদের কষ্টের লাঘবের জন্য উহাদের দাবী পূর্ণ করুন, উহাদের বেতন বৃদ্ধি করুন।

মিল মালিকেরা ক্রুদ্ধ হইলেন, বাঁকিয়া বসিলেন। গান্ধীজীর মধ্যস্থতায় সকল প্রকার সম্ভবপর আপোষেই অসম্মত হইলেন।

গান্ধীজী তাঁহার কর্তব্য চিন্তা করিলেন। এই বিষয়ে শ্রমিকদের আত্ম-নির্ভরশীল হওয়া উচিত বিবেচনা করিলেন, সত্যের জন্য সংগ্রাম করা উচিত স্থির করিলেন। তিনি শ্রমিক ও শ্রমিক নেতাদের মিলিত সভায় যাইয়া নিজ সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন—'আপনাদের ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য আপনাদের হরতাল করিতে হইবে।'

শ্রমিকগণ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

হরতালের কার্য্যক্রম তিনি শ্রমিকদের বিশেষভাবে আলোচনা দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন। সত্যাগ্রহের ব্যাখ্যা সবাই বুঝিবে না, সত্যাগ্রহের প্রণালী তিনি জানাইয়া দিলেন। সবাই মিলিযা হরতাল করিবার সর্ত্ত স্থির করিলেন

১। মালিকগণ আপোষে সম্মত না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ মিলের কাজে যোগদান করিবেন না।

২। কেহ এই হরতালের সময কোনরকমে শান্তিভঙ্গ করিবেন না।

৩। যে ব্যক্তি কাজে যাইতে চায় তাহার উপর জোর করিবে না।

৪। মজুরেরা ভিক্ষান্ন খাইবে না।

৫। হরতাল যতই দীর্ঘ হউক না কেন, তবু দৃঢ় থাকিবে। যদি পয়সা ফুরাইয়া যায় তবে শুধুমাত্র খাওয়া যাহাতে চলে এমন মজুরী করিবে।

গান্ধীজী এই হরতালকে অহিংসা ও সংযমের পবিত্র বন্ধনের দ্বারা বদ্ধ করিলেন। তিনি বারবার পরীক্ষা দ্বারা বুঝাইয়াছিলেন যে সত্যাগ্রহ ও অহিংসার মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। সত্যাগ্রহ ও অহিংসাকে তিনি আফ্রিকার ক্ষেত্রে যুক্তভাবে প্রয়োগ করিযাছিলেন, ভারতের ক্ষেত্রেও উহা সেইরূপেই প্রযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তবে ভারতের মাটিতে সত্যাগ্রহের সহিত অহিংসার প্রয়োগ সম্ভব ও সাফল্যমণ্ডিত হইবে কিনা, এই বিষযে পরীক্ষা করিবার জন্য যেন তিনি স্থানীয সীমাবদ্ধ সমস্যাগুলির মধ্যে ইহার ফলাফল দেখিতে লাগিলেন। তাই তিনি অশিক্ষিত ও হঠকারী মজুরদিগকে প্রথমেই সর্ত্ত দ্বারা বাঁধিলেন, শান্তি ভঙ্গ করিতে অর্থাৎ হঠকারিতার দ্বারা বলপ্রযোগ করিতে নিষেধ করিলেন। কাহারও অন্যায ও সহযোগিতার অভাব দেখিয়া ঝগড়া করিতে নিষেধ করিলেন।

সত্যাগ্রহ নীচের আচরণ নহে, উন্নত আদর্শপূতঃ শক্তিমানের পবিত্র কর্ম্ম-সাধনা·· আত্মার ও নীতির বলে বলীযান বীরের মহান সংগ্রাম!·· তাই তিনি শ্রমিকদের ভিক্ষা করিতে বা অভাবের জন্য পরের কাছে হাত পাতিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু প্রয়োজন হইলে পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে উপদেশ দিলেন। গান্ধীজীর অহিংসামূলক হরতাল রীতিমতভাবে চলিতে লাগিল।

শ্রমিকদের মানসিক শক্তিকে উৎসাহিত করিবার জন্য তিনি প্রত্যহই ফাঁকা জায়গায় শ্রমিকগণের সাধারণ সভা করিতে লাগিলেন। দলে দলে শ্রমিকগণ সেই সভায় হাজির হইতে লাগিল। গান্ধীজী প্রত্যহ তাহাদের সর্ত্তের ও প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন। শ্রমিকগণও নিজ প্রতিজ্ঞায় ও উদ্দেশ্যে অটল থাকিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প-বাণী উচ্চারণ করিত। পতাকা লইয়া তাহারা সহর প্রদক্ষিণ করিত।

একুশ দিন পর্য্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালিত হইল। শ্রমিকদের এই একতা, সঙ্ঘবদ্ধতা ও দৃঢ়তা দেখিয়া মিল মালিকগণও চিন্তান্বিত হইলেন।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দরিদ্র ও বুভুক্ষু শ্রমিকগণ নিজেদের জেদ ও সঙ্কল্প রক্ষা করিতে পারিল না, ক্ষুধার জ্বালায় তাহারা ভাঙ্গিয়া পড়িল।

দলের মধ্যে কেহ কেহ কাজে যোগ দিতে চাহিল, কিন্তু যাহারা যোগ দিতে চাহিল না, তাহারা সর্ত্ত লঙ্ঘন করিয়া যোগদানকারীদের বলপ্রযোগে বাধা দিতে উদ্যত হইল। শ্রমিকদের মনোবল কমিয়া আসিতে লাগিল, তাহাদের মনে হিংসার পাপ উঁকিঝুঁকি দিতে লাগিল।

গান্ধীজী তাঁহার চেষ্টার ব্যর্থতা দেখিয়া অনুতপ্ত হইলেন। বিচার করিয়া বুঝিলেন, অজ্ঞ দরিদ্র শ্রমিকগণ সত্যাগ্রহ ও অহিংসার উপযোগী হইতে পারে নাই বলিয়াই হরতাল ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। সেইজন্য তাহাদের যোগ্য না করিয়াই সংগ্রামের মধ্যে টানিয়া আনা তাঁহার পক্ষে একটা মস্তবড় ত্রুটি বলিয়া মনে করিলেন······কিন্তু নিজের ত্রুটিকে তিনি কি অবহেলা করিবেন?······কখনো নহে! তাঁহার ত্রুটির জন্য তাঁহার ভুলের জন্য শ্রমিকগণ ফলভোগ করিতে পারে না—এই ত্রুটির শাস্তি তিনি নিজেই গ্রহণ করিবেন। এই ত্রুটি তিনি নিজ আচরণের দ্বারা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিবেন।

তিনি সঙ্কল্প করিলেন, তিনি শ্রমিকগণের জন্য প্রাযোপবেশন করিবেন,··· যতদিন না মালিকগণ শ্রমিকগণের অভাব-অভিযোগ বিষয়ে মীমাংসা করেন, ততদিন তিনি খাদ্য গ্রহণ করিবেন না সঙ্কল্প করিলেন।

গান্ধীজী প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিলেন।

গান্ধীজীর আচরণে দুর্ব্বল মজুরদের মনে কেমন যেন একটা চমক লাগিল। তাহাদের মানসিক শক্তি ফিরিয়া আসিতে লাগিল, একটা অনুতাপ জাগিতে লাগিল। মজুরগণ আবার দৃঢ়তা লাভ করিল, কেহ কেহ গান্ধীজীর সহিত উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। নিস্তেজ হরতালের উৎসাহ-বহ্নি আবার দীপ্ততেজে জ্বলিয়া উঠিল। সহরে একটা আন্দোলন জাগিয়া

উঠিল। মালিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বিচলিত হইয়া পড়িলেন, গান্ধীজীর অবস্থা স্মরণ করিয়া ভীত ও লজ্জিত হইলেন।

কিন্তু গান্ধীজী নিজ অন্তরের দ্বারা মালিকগণের অন্তর যেন বুঝিতে পারিলেন। কার্য্যের দ্বারা উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে অক্ষম হইয়া উপবাসের দ্বারা ভয় দেখাইয়া উহা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করা অন্যায় ও পাপ, ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন এবং পত্র লিখিয়া মালিকগণের কাছেও এই দোষ স্বীকার করিলেন। তিনি লিখিলেন, 'আমার উপবাস-বশতঃ আপনাদিগকে আপনাদের পথ এতটুকুও ছাড়িতে হইবে না। আমি ভয় দেখাইতেছি না, ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি।'

গান্ধীজীর এই আত্ম-দোষ স্বীকারের দৃষ্টান্তে মালিকগণ আরো বিচলিত হইলেন। ভুল করিয়া এমন অকপট ভঙ্গিতে ভুল যিনি স্বীকার করিতে পারেন, তিনি কখনও কাহারও অন্যায় ও অমঙ্গল কামনা করিতে পারেন না। গান্ধীজীর ভুল-স্বীকার মালিকগণকে তাঁহাদের ভুল-স্বীকার করাইতে প্রেরণা দিল। তাঁহারা তাঁহাদের অন্যায় জেদ পরিত্যাগ করিলেন,······ অনমনীয় ভাব বর্জ্জন করিলেন, নিজেরা স্বেচ্ছায় শ্রমিকগণের বিষযে একটা আপোষ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, গান্ধীজীকে প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করিতে অনুরোধ করিলেন।

হারিয়াও গান্ধীজী জয়লাভ করিলেন, শ্রমিকদের বেতন বিষযে একটা সম্মানজনক বন্দোবস্ত হইল। হরতালের বিষয় শেষ হইলেও এখানে আমরা গান্ধীজীর বিষয়ে আরও একটু বলিব। বিষয়টি গান্ধীজীর আত্মদোষ স্বীকারের অভিনবত্ব। এই আত্মদোষ স্বীকার, এই ভুলকে হৃদয়ঙ্গম করা গান্ধী-চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। জীবনে তিনি যাহাকে সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহাকে দৃঢ়ভাবে ও নির্ভীকভাবে লোকের প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করিয়া, লোকের নিন্দা ও সমালোচনাতে বিচলিত না হইয়া অনুসরণ করিয়াছেন। যখনই নিজের কর্ম্ম, আদর্শ বা

পন্থা ভুল বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, তখনই তিনি সেই ভুলকে অকপটে স্বীকার করিয়াছেন, নিজের ভুলকে সকলের নিকট খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। মহাত্মা রোঁমা রোলাঁ তাঁহার স্বভাব বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'আমি ভুল করিয়াছি, এ কথা স্বীকার করিতে তিনি যেন সদাসর্ব্বদা প্রস্তুত!'

তাঁহার এই ভুল-স্বীকারের আদর্শ আমরা তাঁহার জীবনের মধ্যে বহুবার দেখিয়াছি।

এইবার গুজরাটের খেড়া জেলার ঘটনার কথা বলিব।

গুজরাট প্রদেশে চাষীদের জন্য স্থানীয় সরকার আইন করিয়াছিলেন যে, যে-বৎসর জমিতে চার আনা বা চার আনার কম ফসল উৎপন্ন হইবে, সেই বৎসর দরিদ্র চাষীদের দেয় খাজনা মাপ করা হইবে। ১৯১৮ সালে খেড়া প্রভৃতি কতকগুলি গ্রামে ফসল ভাল হইল না······চার আনা পরিমাণ শস্যও উৎপন্ন হইল না। চাষীদের অন্নাভাবের দরুণ অর্থাভাবও হইল। তাহারা স্থানীয় কর্ম্মচারীদের নিকট খাজনা মাফের জন্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু তাহাদের প্রার্থনা নামঞ্জুর হইল। বরং কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃপক্ষকে সংবাদ দিলেন, উহাদের ফসল চার আনার অনেক বেশী হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ সংবাদ অনুসারে কর্ম্মচারীগণকে খাজনা-সংগ্রহ বিষয়ে কঠোর হইতে আদেশ করিলেন।

চাষীরা অসহায় হইয়া পড়িল। তাহারা কি করিবে স্থির করিতে পারিল না। এমন সময় গান্ধীজী এই অন্যায় ও অত্যাচারের সংবাদ পাইলেন। চাষীদের এই দুর্দ্দশায় তাঁহার অন্তর বিচলিত হইল। তিনি সদলবলে খেড়ায় আসিলেন। চাষীদের সহিত দেখা করিলেন, তাহাদের ফসলের অবস্থা দেখিলেন, তাহাদের সহিত পারিপার্শ্বিক বিষয়ে আলোচনা করিলেন। বুঝিলেন, খাজনা হইতে রেহাই না পাইলে চাষীদের অভাবের উপর আরও অভাবের বোঝা নামিবে, তাহাদের কষ্টের সীমা থাকিবে না।

গান্ধীজী এইবার চরম প্রতিকারের বিষয় চিন্তা করিলেন। তিনি সহকর্ম্মীদের সহিত বিশেষ আলোচনার পর স্থির করিলেন, চাষীদের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিতে হইবে, খাজনা দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে। এই বিষয়ে তিনি চাষীদের মোড়লদিগের মতামত জানিতে চাহিলেন। মোড়লদের নিকট হইতে আশপাশের সমস্ত চাষী তাহাদের প্রতি গান্ধীজীর এই সহানুভূতির কথা জানিতে পারিল। তাহারা উৎসাহিত হইল, আশান্বিত হইল, সত্যাগ্রহ করিতে উৎসাহের সহিত সম্মতি দিল।

কিন্তু গান্ধীজীর অন্তরে চম্পারণ ও আমেদাবাদের স্মৃতি জাগিল। সত্যাগ্রহ সংগ্রাম স্বুরু করিবার আগে চাষীদিগের মধ্যে অহিংসা ও সত্যনিষ্ঠা জাগাইয়া তুলিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার সঙ্কল্প চাষীগণ হৃদয়ঙ্গম করিল। তাহারা বুঝিল, সত্য অধিকার লাভ করিতে হইলে সত্য অনুসরণের সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে, সত্যের জন্য বিনয়ের সহিত কষ্ট বরণ করিবার, অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিবার মনোবল সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রত্যেকটি গ্রামবাসী চাষী আসিয়া গান্ধীজীর কাছে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিল—"আমাদের গ্রামের ফসল চার আনার বেশী হয় নাই, ইহা আমরা জানি। এই কারণে খাজনা আদায় আগামী বৎসর পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখার জন্য আমরা সরকারের নিকট দরখাস্ত করিয়াও আদায় বন্ধ করাইতে পারি নাই। সেইজন্য আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি এই যে, বৎসরের পূরা বাকি খাজনা, অথবা আমাদের মধ্যে যাহার খাজনা আংশিক বাকী আছে, সেই আংশিক খাজনা, আমরা দিব না। এই খাজনা আদায় করার জন্য সরকার আইন অনুসারে যাহা করিতে চাহেন তাহা করিতে দিব এবং তাহার জন্য দুঃখ সহ্য করিব। আমাদের জমি যদি বাজেয়াপ্ত করা হয়, তবে তাহা করিতে দিব। তবু আমরা হাতে তুলিয়া সরকারকে খাজনা দিয়া আমাদের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হইতে দিব না। যদি সরকার আগামী কিস্তি আদায় সমস্ত জেলায় মুলতুবী রাখেন, তবে আমাদের মধ্যে যাহার

শক্তি আছে তাহারা পূরা বা আংশিক বাকী খাজনা জমা দিতে প্রস্তুত আছে।”

সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইল। চাষীরা খাজনা দেওয়া একেবারে বন্ধ করিল। যে অসমর্থ সে ত দিলই না, যে সমর্থ সেও দিল না। রাজকর্ম্মচারীগণও জুলুম করিতে লাগিল, স্থানে স্থানে অত্যাচার আরম্ভ করিল। চাষীভাইগণের মনোবলকে দৃঢ় করিবার জন্য গান্ধীজী ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া অহিংসা ও সত্যাগ্রহ বিষয়ে প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানাইলেন, কর্ম্মচারী চোখ রাঙ্গাইলে ভীত হইবে না, উদ্ধত হইবে না। বিনয়ের সহিত, অন্তরের দৃঢ়তার সহিত কর্ম্মচারীর দাবীকে অস্বীকার করিবে। যদি তাহারা প্রহার করে, তবে নিজ সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকিয়া হাসিমুখে সেই প্রহার সহ্য করিবে। যদি গ্রেপ্তার করে, তাহা হইলে শান্ত মনে তাহাদের ইচ্ছামত স্থানে গমন করিবে। কিন্তু সব সময়ে নিজ সঙ্কল্পে আস্থাবান থাকিবে।

সত্যাগ্রহী চাষীদের পাণ্ডারা গ্রেপ্তার হইল। চাষীদের মধ্যে কিন্তু একটা যেন নূতন উৎসাহ জাগিল, একটা নূতন শক্তির প্রেরণা জাগিল। তাহারা দ্বিগুণ শক্তিতে সত্যাগ্রহের সঙ্কল্পে মাতিয়া উঠিল। কর্ম্মচারীগণ কাহাকেও গ্রেপ্তার করিয়া বিচারালয়ে লইয়া গেলে, বিচারালয় লোকে-লোকারণ্য হইয়া যাইত, সত্যাগ্রহীদের নির্ভীকতা দেখিয়া অধিক সংখ্যক লোক সত্যাগ্রহ করিতে আগাইয়া আসিল।

মধ্যে মধ্যে যে কাহারও কাহারও মনে দুর্ব্বলতা জাগিত না, তাহা নহে। সবাই একসঙ্গে সমান জেদী হইতে পারে না। তাই কেহ কেহ অত্যাচার বা উৎপীড়নের ভয়ে ঘরের জিনিসপত্র বাড়ীর সামনে সাজাইয়া রাখিত, যাহাতে কর্ম্মচারীগণ আসিয়াই উহা নীলাম ডাকিতে পারে। কেহ কেহ আবার লুকাইয়া খাজনা দিবার বন্দোবস্ত করিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রকৃত বীরদেরই জয়লাভ হইল। লোকের দুর্ব্বলতাকে দূর করিবার

জন্য গান্ধীজীর পরামর্শে বীর সত্যাগ্রহীগণ এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিলেন। খাজনা না দেওয়ার জন্য সরকার চাষীদের যে-সব জমির ফসল বাজেয়াপ্ত করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন সত্যাগ্রহীরা সরকারের আদেশকে উপেক্ষা করিয়া ঐসব বাজেয়াপ্ত ফসল জমি হইতে প্রকাশ্যে কাটিয়া আনিতে লাগিলেন। একবার একদল সত্যাগ্রহী এইরূপ একটি জমি হইতে পেঁয়াজ তুলিয়া লইয়া আসিল। সরকার সত্যাগ্রহীর দলকে গ্রেপ্তার করিলেন। ইহাতে লোকের মধ্যে উত্তেজনার সাড়া পড়িয়া গেল, দুর্ব্বল ও ভীরুদের মনেও আবার যেন সাহস ফিরিয়া আসিল। সত্যাগ্রহের মন্দীভূত স্রোত আবার নূতন বেগে প্রবাহিত হইল।

সরকার ইতিমধ্যে চাষীদের দৃঢ়তার ও কষ্ট সহ্য করিবার দৃষ্টান্ত দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

দরিদ্র ও অসমর্থ চাষীদের বিষয়ে সরকারের মনেরও যেন একটা পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। সরকার অবশেষে ঘোষণা করিলেন—'অবস্থাপন্ন পাতিদারদের (মোড়ল) খাজনা দিতে হইবে, কিন্তু দরিদ্র চাষীদের খাজনা মাফ করা হইল।'

সরকার জেলার কালেক্টরের মারফৎ তাঁহাদের ইচ্ছা গান্ধীজীকেও জানাইলেন।

গান্ধীজী সঙ্গীদের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিলেন। সরকার চাষীদের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন ও বুঝিতে পারিয়াছেন জানিয়া তিনি সরকারের ঐ ঘোষণা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক না হইলেও উহা স্বীকার করিয়া লইলেন। তিনি সত্যাগ্রহ বন্ধ করিলেন। সেই বৎসরের মত চাষীরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

এই খেড়া সত্যাগ্রহের কথা ভারতবর্ষময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। গান্ধীজীর এই নূতন সংগ্রাম ও সংগ্রামের সাফল্য দেখিয়া ভারতের আশাহত শোষিত জনসাধারণ অন্ধকারের মধ্যে আশার আলো দেখিতে পাইল।

দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে, দূরতম প্রান্ত হইতে অসংখ্য অনুসন্ধিৎসু লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিল, নিত্য অসংখ্য চিঠি আসিতে লাগিল।

গান্ধীজী বুঝিলেন, দেশের লোক তাঁহার প্রণালী বিষয়ে, সত্যের সন্ধান বিষয়ে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনিও সাধ্যমত স্থানে স্থানে বক্তৃতা ও আলোচনার দ্বারা এবং সংবাদপত্র মারফৎ প্রচার দ্বারা তাঁহার কর্ম্ম, নীতি ও প্রণালী দেশময় প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার নীতি ও আদর্শের পরিচয় সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানিয়াছি। কিন্তু এখানে আমরা পুরাতন বিষয়গুলিকে আবার নূতন করিয়া একটু আলোচনা করিয়া লইব। এই সময়ে গান্ধীজী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' ও 'নবজীবন' নামক তুইটি পত্রিকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করিলেন। এই পত্রিকা তুইটির সাহায্যেই তিনি বিশেষ করিয়া তাঁহার সত্যাগ্রহের আদর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার অদর্শের মূলসূত্রই হইল, সত্যসন্ধানী মানুষ সকল সময়ে মিথ্যার বিরুদ্ধে, অন্যায ও অসত্যের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করিবে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবে, অন্যাযের সহিত অসহযোগ করিবে। কিন্তু সেই প্রতিবাদ নিরুপদ্রবভাবে করিতে হইবে। প্রতিবাদের কার্য্যে হিংসা, নীচতা বা ক্রোধের কোন স্থান থাকিবে না। 'আমি ইহা মানিব না, ইহা পালন করিব না, ইহা অসত্য—ইহা অন্যায়' এই ইচ্ছা লইয়া দৃঢ়চিত্তে মাথা উঁচু করিবে, অন্যায় ও অসত্য কার্য্য হইতে বিরত হইবে এবং অন্যায়ের স্রষ্টা ও আদেশকারীকে অন্যায় কার্য্যে সাহায্য করিবে না। অন্যায়ের বিরোধিতা করিবে—কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে, শান্ত ধৈর্য্যের সঙ্গে, মনের স্থির ও ধীর সংযমের সঙ্গে। মনে রাখিতে হইবে, 'আমি সত্যের সন্ধানী, সত্যের মধ্যে ক্রোধ নাই, হিংসা নাই, অসংযম নাই। আছে শান্তি, বিনয় ও দৃঢ়তা। দৃঢ়তার সহিত অথচ বিনয়ের সহিত প্রতিপক্ষের কার্য্যে বাধা দিব। হয়ত প্রতিপক্ষ আমার উদ্দেশ্য বুঝিবেন না, আমার সততা বুঝিবে না। বাধা পাইয়া আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবে, অত্যাচার করিবে। আমি মনে রাখিব,

সত্যের জন্য আমি ঐ অত্যাচার ধৈর্য্যের সঙ্গে, বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করিব। কষ্ট বরণ করিব, দুঃখ সহ্য করিব, প্রয়োজন হইলে মার খাইব কিন্তু সকল সময়ে অত্যাচারীকে শ্রদ্ধা করিব। সকল অবস্থার মধ্যে অত্যাচারীকে ভালবাসিব, অত্যাচারীর হৃদয়কে সম্মান করিব, আমার কার্য্য ও ব্যবহার নিখুঁত হইলে, আন্তরিক ও অকপট হইলে অত্যাচারীর হৃদয়ও বিচলিত হইবে, চিন্তান্বিত হইবে। সত্যের জন্য আমার অত্যাচার ও কষ্ট সহ্য করিবার সীমা দেখিয়া তাহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইবে।'

অপূর্ব্ব এই অস্ত্র! এই অভিনব যুদ্ধ-কৌশলের আবিষ্কার নিপীড়িত মানব-সমাজের মধ্যে একটা আশীর্ব্বাদের মত উপস্থিত হইযাছে। এই অস্ত্রে শুধু ভারতবর্ষ তাহার মুক্তির পথ খুঁজিযা পায নাই, সভ্য-জগতের নিপীড়িত মানব-সমাজ ও জাতিগুলি পর্য্যন্ত আজ এই অস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বে মুগ্ধ হইতেছে, জগতের অশান্তি, হানাহানি ও কুটিলতা পরিহার করিযা সকলে সাগ্রহে ইহার দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। এই সত্যাগ্রহ, অহিংসা ও অসহযোগ গান্ধীজীকে জগতের চক্ষে মহান ও অবিনশ্বর করিয়া তুলিযাছে।

এই বিষয়ে বেশী বলিবার বা বুঝাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তবে এই সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ প্রসঙ্গে গান্ধীজী নিজে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া আমাদের বক্তব্যকে যথার্থ প্রমাণ করিতে পারি। তিনি বলিযাছেন—"অসহযোগের সাফল্য নির্ভর করে পরিপূর্ণ সংগঠনের উপর। ক্রোধ হইতে আসে বিশৃঙ্খলা। সত্যাগ্রহে বিন্দুমাত্রও হিংসার অস্তিত্ব থাকিলে চলিবে না। প্রতিটি হিংসার অর্থ হইল পিছনে হটিযা আসা, নিরপরাধ জীবনের অনর্থক অপচয়।"

গান্ধীজীর মহান সত্যাগ্রহ কৌশল সম্বন্ধে মনীষী রেঁামা রোলঁা একজায়গায ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন—"প্রতিপক্ষদের প্রতি হিংসার প্রয়োগ করিতে সত্যাগ্রহীদের নিষেধ রহিয়াছে। কারণ, প্রতিপক্ষরাও যে আন্তরিকভাবে কাজ করে তাহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। একজনের কাছে যাহা সত্য বলিয়া

প্রতীয়মান হয়, অপরজনের কাছে তাঁহা ভুল বলিয়া মনে হইতে পারে, এবং হিংসার দ্বারা কাহারও মধ্যে বিশ্বাসের উদয় সম্ভব নহে। সত্যাগ্রহীদের প্রতিপক্ষকে জয় করিতে হইবে ভালবাসার দ্বারা—বিশ্বাসের মধ্যে যে ভালবাসার জন্ম হইয়াছে তাহার দ্বারা, আত্ম-অস্বীকারের দ্বারা, যন্ত্রণাকে সাদরে বরণ করার দ্বারা। বাস্তবিক পক্ষে ইহা একপ্রকার প্রচার, যাহার প্রতিরোধ কোন বৈজ্ঞানিক বা ধাতুর অস্ত্রের দ্বারা সম্ভব হয় না। এই প্রচারের ফলেই খৃষ্টের ক্রশ এবং তাঁহার স্বল্পসংখ্যক শিষ্য-সম্প্রদায়ের দ্বারা একটি বিশাল সাম্রাজ্যের জয়!"

পাছে তাঁহার এই সত্যাগ্রহের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অহিংসা-নীতিকে কেহ ভুলভাবে বিচার করে এইজন্য গান্ধীজী অহিংস-সত্যাগ্রহ. সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। সত্যাগ্রহে অহিংসা-নীতিই সত্যাগ্রহ-প্রণালীকে এত অভিনব করিয়া তুলিয়াছে। মানুষকে হিংসার সাহায্য অপেক্ষা ভালবাসার সহায্যেই স্থায়ীভাবে বশীভূত ও স্বমতানুবর্ত্তী করা যায়। সত্যাগ্রহী প্রেম বিশ্বাস ও ত্যাগের দ্বারা চিরতরে প্রতিপক্ষের হৃদয় জয় করেন।

কিন্তু তাঁহার এই অহিংসা কাপুরুষ, ভীরু বা দুর্ব্বলের অহিংসা নহে, প্রতিপক্ষের সঙ্গে শক্তিতে না পারিয়া হতাশায় অহিংসা নহে। একটি দুর্ব্বল শশক একটি শক্তিমান ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া ভয়ে বনে লুকাইল। ইহা অহিংসা নহে, বরং ভীরুতার ও কাপুরুষতার দৃষ্টান্ত। কিন্তু একটি ব্যাঘ্র একটি সিংহের সহিত সংগ্রাম করিতে সক্ষম হইয়াও তাহাকে নখদন্তের দ্বারা আক্রমণ করিল না—ইহাকে অহিংসা বলা যাইতে পারে।

আমি বলে সক্ষম, সমর্থ ও যোগ্য হইয়াও প্রতিপক্ষের উপর হিংসার প্রযোগ করিব না, প্রতিপক্ষকে আত্মার শক্তির দ্বারা, মনোবলের দ্বারা প্রতিরোধ করিব, বশীভূত করিতে চেষ্টা করিব—ইহাই হইল গান্ধীজীর অবলম্বিত অহিংসার মোটামুটি ব্যাখ্যা।

চল্লিশ

মহাযুদ্ধ ও বিপন্ন ইংরাজ

গান্ধীজী যখন আশ্রমের কাজে ও স্থানীয় সত্যাগ্রহের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের গর্জ্জন শুনা গেল। ব্রিটিশ শক্তি সেই মহাযুদ্ধে জড়াইয়া পড়িল। বলশালী ও বিরাটভাবে সংগঠিত জার্ম্মান শক্তির বিরুদ্ধে নিজের পরিমিত শক্তি ও সম্পদ নিয়োগ করিয়াও ব্রিটিশ জাতি জার্ম্মানীর কবল হইতে রক্ষার উপায় দেখিতে পাইল না। তখন সে তাহার শক্তি-বৃদ্ধির জন্য পৃথিবীর চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তাহার চোখে পড়িল তাহার বিজিত সাম্রাজ্য বিশাল ভারতবর্ষ! সে আত্মরক্ষার জন্য ভারতের সম্পদ ও জনবলের সাহায্য লইবার সঙ্কল্প করিল। সে নিজ অধিকারের বলে ভারতবর্ষকে প্রতারিত করিয়া তাহার সম্পদ শোষণ করিতে লাগিল। কিন্তু ভারতের জনশক্তিকে অত সহজে প্রতারণা করা সম্ভব হইল না। আমরা আগেই জানাইয়াছি ভারতের অন্ধকার রাত্রে তখন ভোরের আগমন জানা গিয়াছিল। ভারতবাসী সম্পূর্ণ জাগরিত না হইলেও ক্রমশঃ জড়তা ও নিষ্ক্রিয়তা ত্যাগ করিয়া নিজ অধিকার ও দাবী আদায়ের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। ইংরাজের কার্য্যের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিরুদ্ধতা না করিলেও একটা চাপা অসন্তোষে যেন মনে মনে গুমরাইতেছিল।

মহাযুদ্ধে বলি দিবার জন্য ভারতের জনবলকে ইংরাজ অনেক চেষ্টা করিয়া, অনেক কৌশল করিয়া, বিবিধ প্রলোভন দেখাইয়াও ইচ্ছামত ও যথেষ্ট সংখ্যায় সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইল না। পুরাতন পন্থা ব্যর্থ হইলে ব্রিটিশ সরকার নূতন কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিল। ভারতের বিশিষ্ট নেতাদের নিকট আবেদন করিল। আবেদনে জানাইল—ব্রিটিশ জাতির বিপদে ভারতেরও সমূহ বিপদ, ব্রিটিশ জাতি পরাজিত হইলে ভারতবর্ষ নূতন শক্তি দ্বারা অধিকৃত হইবে, নূতন শক্তি দ্বারা পীড়িত হইবে। অতএব

ব্রিটিশের এই যুদ্ধে ভারতকেও আন্তরিক ভাবে সাহায্য করিতে হইবে··· আবেদনের শেষে কিন্তু ব্রিটিশজাতির পক্ষ হইতে পবিত্র প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল—ব্রিটিশ জাতি এই সাহায্যের মহত্বের ও আন্তরিকতার যথাসাধ্য প্রতিদান অবশ্যই দিবে। ভারতবাসীগণ শাসন-বিষয়ে যে সব অধিকার চাহিতেছেন, তাহারা সেইগুলির অধিকাংশই ভারতের কল্যাণের কথা চিন্তা করিয়া প্রদান করিতে চেষ্টা করিবে। ভারতশাসনের কাজে তাহারা ভারতবাসীকে যোগ্য ও ন্যায্য অধিকার দান করিবে।

ইংরাজের এই আবেদন নেতারা জানিলেন। জানিয়াও কিন্তু শাসকগণের কার্য্য-কলাপের পূর্ব্ব ইতিহাস স্মরণ করিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইতস্ততঃ করিলেন না কেবল সরলচেতা গান্ধীজী।

গান্ধীজী বুঝিতে পারিয়াছিলেন ভারতের অধিবাসীগণের অন্তর ক্রমশঃ বিদেশী শাসকের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছে। গণমন নিজ অধিকার আদায়ের জন্য, একটা চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহা বুঝা সত্ত্বেও নিজ স্বভাব ও আদর্শ অনুসারে গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারকে বিশ্বাস করিলেন। তিনি বিশ্বাস করিলেন, স্বার্থের জন্য ব্রিটিশ ভারতকে শোষণ ও পীড়ন করিয়াছে। আজ যদি ব্রিটিশের বিপদের দিনে ভারতবর্ষ তাহার দুঃখ লইয়াও বিপন্ন ব্রিটিশকে সাহায্য করে, রণসম্ভার ও সৈন্যবল প্রদান করে, তাহা হইলে শোষক ব্রিটিশেরও মনোভাব একদিন পরিবর্ত্তিত হইবে। অত্যাচারিত জাতির সাহায্য ও সেবা লাভ করিয়া তাহার অন্তরের পরিবর্ত্তন হইবে, সে ভারতের উপর সহানুভূতিশীল হইবে, কৃতজ্ঞ অন্তর লইয়া ভারতকে তাহার সাহায্যের প্রতিদান দিবে। গান্ধীজীর হৃদয়ে এই বিশ্বাস জাগিল। ভাইসরয় চেম্‌স্‌-ফোর্ড তখন দিল্লীতে নেতাগণের এক সম্মেলন আহ্বান করিয়া প্রকাশ্যে ব্রিটিশের আবেদন তাঁহাদের নিকট পেশ করিলেন। তখন গান্ধীজীই সেই আবেদন গ্রহণ করিবার জন্য আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করিলেন। প্রধানতঃ

তাঁহার প্রচেষ্টার জন্যই নেতাগণ ও জাতীয় মহাসভা প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটিশকে সাহায্যদানে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন জাগে, এই অহিংসার পূজারী প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে হিংসাকে সাহায্য করিলেন কেন? অহিংস অসহযোগের আদর্শ মুলতুবী রাখিয়া হিংসার আদর্শ গ্রহণ করিলেন কেন?······ইহা বড় জটিল প্রশ্ন। কিন্তু আমরা সাধ্যমত ইহার এই উত্তর দিতে পারি যে, সেদিন তিনি অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব জানিযাও কেবলমাত্র ব্রিটিশ শক্তিকে ভারতীয়দের অকপটতা ও সততা দেখাইবার জন্যই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের দ্বারা তিনি তাঁহার অহিংসা নীতি বিসর্জ্জন দেন নাই, বরং উহাকে আরো বৃহত্তর মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, কাহাকেও শুধু অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিলেই হিংসা করা হয় না। অস্ত্র দ্বারা আঘাত না করিয়াও মানুষ মানুষকে, জাতি জাতিকে বেশী হিংসা করিতে পারে, জাতি জাতির উপর বেশী পীড়ন করিতে পারে। তাই তিনি মানসিক হিংসাকে ত্যাগ করিবার একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। শাসককে অস্ত্রবলে জব্দ না করিতে পারিলেও, শাসকের বিপদের সময়ে তাহাকে সাহায্য না করিয়া উপরে নিরপেক্ষ ভাব দেখাইয়া মনে মনে ঈর্ষা ও ধ্বংস কামনা করিব, অন্তরের কপটতা দিয়া উপরের হিংসাকে আবৃত করিয়া রাখিব, ইহা গান্ধীজীর আদর্শ-বিরুদ্ধ। তাই তিনি ইচ্ছা করিলেন না যে ব্রিটিশের সাহায্য প্রার্থনায় সাড়া না দিয়া বিরাগবশে ভারতবর্ষ চুপ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবে, আর সেই নিশ্চেষ্টতার মধ্যে শাসকের ধ্বংস কামনা করিবে। তিনি ভারতের এই মানসিক হিংসাকে পরিহার করিবার জন্যই ব্রিটিশকে সাহায্য করিতে উদ্যত হইলেন, ভারতের আত্মিক শক্তিকে ভিতর হইতে অহিংসার আদর্শে জাগারিত করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ইহারই জন্য তিনি সৈন্য দিয়া ব্রিটিশকে ভারতের অকপট আন্তরিকতা জানাইতে উদ্যত হইলেন।

তাঁহার এই অহিংসা-বিষয়ে পাছে লোকে কিছু ভুল ধারণা করে এই জন্য তিনি নিজেই হিংসা অহিংসা বিষযে অনেক তথ্য আমাদের দিয়া গিয়াছেন। অহিংসা দেহের কাজ নহে, মনের কাজ। মনে পরিপূর্ণ হিংসা রহিল, অথচ উপরে অহিংসা ও আন্তরিকতার নিদর্শন প্রকাশ করিলাম—ইহা গান্ধীজীর মতে আরো তীব্র হিংসা। মনে ব্রিটিশ-বিদ্বেষ রহিল, অথচ উপরে উহাকে প্রকাশ না করিয়া নিরপেক্ষ ও সৎ সাজিলাম, এই গোপন ও ঘৃণ্য হিংসা অপেক্ষা প্রকাশ্যভাবে সশস্ত্র সংগ্রামও মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য।

তবে গান্ধীজী নিজেও স্বীকার করিযাছেন যে ব্রিটিশের সামনে ভারতের আন্তরিকতার অন্য কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারিয়াই তিনি ভারত হইতে সশস্ত্র সাহায্য দিতে চেষ্টা করিযাছিলেন। তবে এই সাহায্য সত্ত্বেও অস্ত্রবল বা সামারিক শক্তির উপর অনাস্থা বা অবিশ্বাস তাঁহার চিরজীবন বর্ত্তমান ছিল।

গান্ধীজী শাসককে এইরূপ উদারতা দেখাইলেন, আবার তাঁহার অন্তরের নির্ভীকতাও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিলেন। বিখ্যাত লোকমান্য তিলক, খিলাফৎ আন্দোলনের বিখ্যাত নেতা আলী ভ্রাতৃদ্বযকে সরকার এই সময়ে বন্দী করিযা রাখিযাছিলেন। গান্ধীজী ভাইস্‌রযের কাছে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। তিনি জানাইলেন, দেশের সর্ব্বজনমান্য নেতাগণকে কারাগারের লৌহদ্বারের অন্তরালে রাখিযা দেশবাসীর কাছে সাহায্য ও সহানুভূতি কামনা করা অত্যন্ত অশোভন ও অবিবেচনার কার্য্য। তিনি এই অন্যাযের প্রতিকারের জন্য ভাইস্‌রয়কে সজাগ করিলেন। ভাইস্‌রয় তাঁহার প্রতিবাদ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিলেন এবং শীঘ্রই এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া সাধ্যমত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া তাঁহাকে জানাইলেন।

গান্ধীজী দিল্লী হইতে গুজরাটে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি স্থির করিলেন, সৈন্য সংগ্রহ করিতে হইলে (রংরুট, ইংরাজিতে recruit) সর্ব্বাগ্রে নিজ

দেশে ও পরিচিত স্থানেই এই বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত। তিনি তাঁহার সত্যাগ্রহ সংগ্রামের ক্ষেত্র খেড়া জেলায় উপস্থিত হইলেন। মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করিবার জন্য গ্রামবাসী ও চাষীভাইদের সৈন্যদলে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এই বিষয়ে সাধারণকে বুঝাইবার জন্য তিনি সঙ্গী ও কর্ম্মীদের লইয়া জেলার অনেক স্থানে সভা ও সম্মিলনী আহ্বান করিতে লাগিলেন।

কিন্তু গান্ধীজী একদিন যে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছিলেন, সেইসব স্থানে তাহাদেরই বিরোধিতা ও বিরূপ মনোভাবের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহাকে ও তাঁহার দলবলকে স্থানান্তরে যাতায়াতের জন্য কেহ গাড়ী দিত না। তাঁহার সভায় বিশেষ লোক-সমাগম হইত না, হইলেও জনতা ইংরাজকে সাহায্য করার জন্য তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত, তাঁহাকে সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করিত—ইংরাজ-সরকারকে সাহায্য করিয়া কি বিদেশী শাসন কায়েমী করিব ?

গান্ধীজী এই বাধাকে অন্তরের শক্তি দ্বারা জয় করিতে লাগিলেন। গাড়ী না পাইলেও দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে লাগিলেন। সভায় জনসাধারণকে নিজ আদর্শ ও প্রণালীগুলি জানাইতে লাগিলেন—আমরা স্বায়ত্তশাসনের জন্য ইংরাজের কাছে দাবী করিতেছি। ইংরাজ পূর্ব্বে এই দাবী স্বীকার করেন নাই। কিন্তু এখন বিপদে পড়িয়া আমাদের সাহায্য প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেছেন, আর আমাদেরও যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহারা ধাপে ধাপে ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসনের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবেন এবং এই যুদ্ধের শেষে শাসন-বিষয়ে বিরাট সংস্কার করিবেন, ভারতবাসীকে শাসনের অধিকার প্রদান করিবেন। অতএব এখন আমাদের ইংরাজ জাতির প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করিয়া সততার প্রমাণ দিতে হইবে। ইংরাজের বিপদের দিনে ইংরাজের আচরণ ভুলিয়া গিয়া ইংরাজকে

সাহায্য করিতে হইবে। আমাদের নিজ যোগ্য আচরণের দ্বারা আমরাও যে দেশরক্ষা ও দেশ-শাসনের যোগ্য ইহা প্রমাণ করিতে হইবে। আর এই প্রমাণের প্রথম পন্থাই হইবে সৈন্যদলে যোগদান করিয়া যুদ্ধ করা এবং যুদ্ধের ভিতর দিয়া ভারতের আন্তরিকতা ও সহানুভূতির পরিচয় দেওয়া।

গান্ধীজীর প্রচার ক্রমে ক্রমে সুফল প্রদান করিতে লাগিল। লোকের বিরূপ মন সরল হইতে লাগিল। রংরুটের কাজ ভালভাবে চলিতে লাগিল। তখন গ্রীষ্মকাল। গান্ধীজী দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যেও পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ গ্রামবাসীগণ দলে দলে রংরুটে ভর্ত্তি হইল।

ইতিমধ্যে ভারতীয় মুসলমানগণ ইংরাজ সরকারকে অনুরোধ করিলেন, সরকার যেন যুদ্ধের শেষে তাহার শত্রু-শক্তির সাহায্যদানকারী তুর্কীকে তাহার সাম্রাজ্যের অংশ হইতে বঞ্চিত না করে। কারণ তুর্কীগণ ধর্ম্মে মুসলমান, আর তুর্কীর সুলতান ছিলেন মুসলমান জগতের ধর্ম্মগুরু (খলিফা)। স্বধর্ম্মীয় জাতি শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য দুর্দ্দশায় পতিত হইবে এবং সন্ধি বা সর্ত্ত অনুসারে রাজ্যচ্যুত হইবে, ধর্ম্মগুরু খলিফা মক্কা বা বোগদাদ প্রভৃতি পবিত্র স্থান হইতে বঞ্চিত হইবে, এই দুর্দ্দশার কথা ভারতীয় ধার্ম্মিক মুসলমান-সম্প্রদায় কিছুতেই ভাবিতে পারিতেছিলেন না। তাই তাঁহারা ইংরাজকে যুদ্ধে সাহায্য প্রদান করিবার আগে তুর্কীর সম্মান রক্ষা বিষয়ে ইংরাজের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি দাবী করিতে লাগিলেন।

সরকারও মুসলমান সম্প্রদায়কে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিল,—যুদ্ধের শেষে তুর্কীর কোন অংশ বিচ্ছিন্ন করা হইবে না, কোন অংশ সন্ধি অনুসারে মিত্রপক্ষের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লওয়া হইবে না, তাহাদের অখণ্ড সাম্রাজ্য বজায় থাকিবে এবং খলিফার সম্মান ও প্রতিপত্তি অটুট থাকিবে।

মুসলমান সম্প্রদায় আশ্বস্ত হইলেন, তাঁহারাও যুদ্ধের জন্য সৈন্যদলে যোগদান করিতে লাগিলেন।

যুদ্ধ পূর্ণ উদ্যমে চলিতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া ব্রিটিশ জাতি জয়ের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু এ সময়ে অনিয়মিত পরিশ্রমের ফলে গান্ধীজীর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি দারুণ রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন।

গান্ধীজী তীব্র ব্যাধি-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহকর্ম্মীর দল, সঙ্গী-সাথীর দল তাঁহাকে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গান্ধীজী এই ব্যাধি নিরাময়ের জন্য কোন চিকিৎসক বা চিকিৎসাপদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করিলেন না। তিনি স্বভাব-চিকিৎসা বা প্রাকৃতিক চিকিৎসার আশ্রয় লইলেন। তিনি নিজ ব্যাধিতে প্রাকৃতিক চিকিৎসা করাইয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, প্রাকৃতিক চিকিৎসা—স্বভাবের সাহায্য রোগ-প্রতিরোধে ও দমনে মানুষকে কত বেশী ও নিশ্চিতভাবে সাহায্য করে। এই চিকিৎসার উপকারিতা বিষয়ে তাঁহার লিখিত পুস্তক হইতে আমরা স্বভাব-চিকিৎসার অভিনবত্ব ও নূতনত্ব বিষযে অনেক কিছু জানিতে পারি।

ব্যাধির জন্য গান্ধীজী কর্ম্মজীবন হইতে অবসর লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং আশ্রমে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু সেবার চিন্তা বিশ্রামের মধ্যেও তাঁহার মন জুড়িয়া বসিয়াছিল। তিনি চাষীদের জীবন-যাপন-প্রণালী দেখিয়া, তাহাদের অভাব ও দারিদ্র্য দেখিয়া, কর্ম্মের অবসরে তাহাদের অলস স্বভাব দেখিয়া ব্যথিত হইতেন, তাহাদের দুঃখ ও দারিদ্র্যের প্রতিকারের জন্য চিন্তা করিতেন। তিনি দেখিতেন চাষীরা চাষের সময়ের পর দীর্ঘকাল কেবল বেকারভাবে কাটাইয়া দেয়, অথচ ঐ দীর্ঘ অবসরে তাহারা যদি অন্য কোন কাজ করে তবে তাহাদের কিছু আয় হইতে পারে এবং দারিদ্র্য-দুঃখও তাহা হইলে কিছু পরিমাণে দূর হইতে পারে। গ্রামের নারীদের সংসারের কাজ সারিবার পরেও দীর্ঘ অবসর থাকে। এই অবসরে তাঁহারাও এমন কোন কাজ করিতে পারেন, যাহা দ্বারা সংসারের আর্থিক অবস্থায় কিছু সাহায্য হইতে পারে। গ্রাম্য আর্থিক-জীবনের এই সমস্যার প্রতিকার করার জন্য তিনি

রোগ-জর্জ্জরিত অবস্থায়ও বিবেচনা করিয়াছেন। পরিণামস্বরূপ ভারতের জাতীয় জীবনের অনুকূল এক অভিনব প্রণালীর আবিষ্কার তিনি করিলেন, যে প্রণালী শুধু চাষীদের ও গ্রাম্য রমণীদেরই আর্থিক দুর্দ্দশার প্রতিকার দেখায় নাই, পরন্তু ভারতবর্ষকে স্বাবলম্বী হইতে, স্বদেশীয় আদর্শ গ্রহণ করিতে পথ দেখাইয়া দিয়াছে—যে প্রণালী ভারতের মুক্তিকে চিরস্থায়ী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। এই প্রণালীটি হইল খাদির প্রচার ও চরকার পুনর্জন্ম।

বস্তুতঃ খাদি ও চরকার আদর্শই গান্ধীজীর জীবনের এক অমূল্য অধ্যায়··· খাদি ও চরকার প্রচার আবার ভারতের মুক্তি আন্দোলনেরও একটি বিশেষ ভূমিকা। গান্ধীজীর কর্ম্মে খাদি প্রচারের চেষ্টা যেরূপ বিশেষ বৈশিষ্ট্যলাভ করিয়াছিল পরাধীন ভারতের স্বদেশীব্রত গ্রহণের উপাখ্যানের ভিতরেও খাদি তেমনি একটি বিশিষ্ট ও বিচিত্র ইতিহাসের স্থান দখল করিয়াছিল। স্বদেশী ব্রতের এই খাদির উৎপত্তি ও চরকার প্রসারের বিষয় আমরা আবার একটু পরে সাধ্যমত বর্ণনা করিব। এখন গান্ধীজীর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কার্য্য-কলাপের ইতিহাস ব্যাখ্যা করিব।

একচল্লিশ

রাউলাট-আইন ও অকৃতজ্ঞ ইংরাজ

রোগশয্যায় শুইয়াই গান্ধীজী শুনিলেন প্রথম মহাযুদ্ধ থামিয়া গেল। গান্ধীজীর হৃদয় আনন্দে আশায় উদ্বেল হইয়া উঠিল—বিজয়ী ব্রিটিশ জাতি এইবার ভারতের সাহায্য স্মরণ করিবে···কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রদান করিবে। ব্রিটিশের সহৃদয় ঘোষণার জন্য গান্ধীজী সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ব্রিটিশের ঘোষণা প্রকাশিত হইল!

কিন্তু স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রদানের ঘোষণা নয়,······রাউলাট তদন্ত কমিটির তদন্ত-ফলের ঘোষণা···পরাধীন ভারতবাসীকে আরো কঠিন আইনের নাগপাশে বন্ধন করিবার সদম্ভ ঘোষণা!

যুদ্ধের অবসানে ব্রিটিশ সরকার শাসনবিষযে ভারতের যোগ্যতা অযোগ্যতা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এবং সেইসঙ্গে ব্রিটিশ শাসক-গোষ্ঠীর প্রতি ভারতীয প্রজার আচরণব্যবহার প্রভৃতি অনুসন্ধান করিবার জন্য রাউলাট নামক একজন ইংরাজের সভাপতিত্বে একটি তদন্ত-কমিটি গঠন করিলেন। এই তদন্ত-কমিটি বা সমিতি রাজভক্ত অনুগত ভারতীয় নাগরিকদের আনুগত্য ও সততার কথা এড়াইয়া গিযা কেবলমাত্র হিংসাপন্থী বিপ্লবী ভারতীয়গণের ঘটনা ও কার্য্যাবলী অতিরঞ্জিতভাবে বাড়াইয়া ভারতবাসী যে চিরদিন ব্রিটিশের উদার-শাসনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, ইহা নানা প্রমাণ ও সাক্ষ্য সংযোগে প্রতিপন্ন করিলেন। তদন্ত কমিটি ভারতবাসীর শত্রুতা ও অযোগ্যতা প্রমাণ করিয়া ভারতবাসীকে দমন করিয়া রাখিবার জন্য প্রচলিত আইনকানুন অপেক্ষা আরো কঠোর ও বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন আইন প্রণয়ন করিতে ব্রিটিশ সরকারকে উপদেশ প্রদান করিলেন।

ইংরাজ সরকার ভারতীয়গণেয় প্রতি সহানুভূতির ভাব দেখাইয়া জানাইলেন

—আমাদের ত ইচ্ছাই ছিল তোমাদের কিছু অধিকার দিব, কিন্তু তোমরা আমাদের সহযোগিতা চাও না। তদন্ত-কমিটির ঘোষণায় জানা গেল, তোমরা কেবল আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করিতে চাও, আমাদের উচ্ছেদ কামনা কর। অতএব এখনো কিছুকাল আমাদের শাসনের আওতায় তোমাদের বাস করিতে হইবে, তোমাদের যোগ্য ও উপযুক্ত করিবার জন্য আমরা রাউলাট কমিটির আদেশমত আরও কয়েকটি নূতন আইন ও শাসন-বিধি প্রবর্ত্তন করিব।

হতভাগ্য ভারতবাসী……

সেবার বদলে কী আশ্চর্য্য প্রতিদান!

সাহায্যের পরিবর্ত্তে কী মহান্ কৃতজ্ঞতা!

ইহার পর কৃতঘ্ন ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর মঙ্গলার্থে 'রাউলাট অ্যাক্ট' নামে নূতন আইন পার্লামেণ্টের দ্বারা পাশ করাইলেন,……আইনের বিধানবলে যে-কোন ভারতবাসীকে ইচ্ছা করিলে বা সন্দেহ করিলে গ্রেপ্তার করিবার, অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী করিয়া রাখিবার, বিচার না করিয়া শাস্তি দিবার অধিকার ঘোষণা করিলেন।

ভারতবাসী চমকিয়া উঠিল!

রাজভক্ত ও রাজার প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ ভারতীয়গণও চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন!

ভারতবর্ষময় একটা প্রবল দীর্ঘ নিঃশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল!

আশায় চঞ্চল গান্ধীজী স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার অন্তর বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িল—'এই কি যুদ্ধে সহযোগিতার পুরস্কার'!

আশাহত হৃদয় উত্তর দিল—ইহা ত বিশ্বাসের বিনিময়ে চরম বিশ্বাস-ঘাতকতা!'

গান্ধীজীর বিবেক যেন তাঁহাকে জানাইল—'আমি ব্রিটিশের একজন বিশ্বস্ত নাগরিকরূপে তাঁহাদের যে আন্তরিক সাহায্য ও সেবা করিলাম, বিপদের দিন

অতিক্রম করিয়া ব্রিটিশজাতি এত শীঘ্র 'তাহা যখন ভুলিয়া গেল, তখন আমি আর এই মিথ্যা আনুগত্যের বিশ্বাসকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিব না।'

ব্রিটিশজাতির ব্যবহারে বিশ্বাসী উদার গান্ধীজী তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তীব্র হইয়া উঠিলেন⋯ ⋯নূতন করিয়া নূতনভাবে কাজে নামিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

রাউলাট আইনের ধারাগুলির প্রতিবাদ করিযা তিনি বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে পত্র দিলেন, সংবাদপত্রগুলির সাহায্যে ভারতবর্ষময় এই আইনের কু-উদ্দেশ্যগুলি ব্যাখ্যা করিয়া জনসাধারণকে মিথ্যা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ও সজাগ করিযা তুলিলেন। সংবাদপত্রের ভিতর দিয়া ব্রিটিশ সরকারকে এই আইন রদ করিবার জন্য বার বার মিনতি করিলেন।

গান্ধীজী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি অন্যান্য বিখ্যাত নেতাগণ এই দমন-নীতিমূলক আইন মুলতুবী রাখিবার জন্য বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন কি শেষ পর্য্যন্ত গভর্ণর-জেনারেলের শাসন পরিষদের ভারতীয় সদস্যগণও এই আইনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। ব্যবস্থাপক সভায় বিশিষ্ট ভারতীয় সভ্যগণ সভার অধিবেশনের সময়ে কর্তৃপক্ষকে আইনটি প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিলেন।

কিন্তু সমস্তই বিফল হইল!⋯⋯

আইন ত রদ হইলই না, বরং আইনের পাষাণভারে অসংখ্য অসহায় ভারতবাসী নিষ্পেষিত হইতে লাগিল।

দেশময় অসন্তোষের চাপা আগুন উঁকিঝুঁকি দিতে লাগিল।

দেশের নেতাগণ এই বিষয়ে যথাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য জাতীয় মহাসভার একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিলেন।

বিয়াল্লিশ

অহিংস-ভারত ও হিংস্র-ব্রিটিশ

১৯১৯-এর প্রথমে ভারতের জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হইল। ইতিমধ্যে দেশের নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীকে মহাসভায় যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। নিজ আদর্শকে সার্থক করিবার জন্য এবং মহাসভাকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য গান্ধীজী কংগ্রেসের সদস্য হইলেন। গান্ধীজী মহাসভার নরমপন্থী কর্তৃত্বও দেখিয়াছিলেন, আবার ১৯১৮-১৯ সালে নরমপন্থীগণের বিদায়গ্রহণের ভিতর দিয়া সক্রিয় ও বিপ্লবপন্থীগণের আগমন দেখিলেন। জাতীয় মহাসভা আবেদন-নিবেদনের পালা ও শুধুমাত্র ভোজের টেবিলে বসিয়া বক্তৃতা করার রীতি ত্যাগ করিয়া দেশের জন্য সংগ্রাম করিতে এবং বাস্তবক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে ইহা এইবার তিনি বুঝিতে পারিলেন। নিষ্ক্রিয়তার ভিতর হইতে দেশবন্ধু, মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি সক্রিয়পন্থীদের উদ্যম ও প্রচেষ্টার আভাস পাইলেন। গান্ধীজী জানিলেন, মহাসভা তাঁহার আদর্শের উপযুক্ত ধারক হইতে চলিয়াছে। মহাসভার আদর্শ গান্ধীজীর আদর্শের নিকটবর্ত্তী হইল, আবেদন ও অনুনয়ের কার্য্য ব্যর্থ হইলে সংগ্রাম ও প্রতিরোধের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। গান্ধীজী এবার মহাসভায় প্রবেশ করিলেন।

মহাসভার অধিবেশনে গান্ধীজীর পরামর্শ ও প্রস্তাবই সমবেতভাবে গৃহীত হইল। সেবা ও সাহায্যের বিনিময়ে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী এতখানি নীচ ও জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা কখনই সহ্য করিবে না,—ইহা স্থির হইল। ভারতের জনসাধারণ এই কুখ্যাত রাউলাট আইনকে প্রতিবাদ করিবে··· মহাসভা এই চরম সিদ্ধান্ত করিলেন। মহাসভা গান্ধীজীর উপর এই প্রতিবাদের সময় নির্দ্ধারিত করিবার ভার প্রদান করিলেন।

আমাদের মনে পড়িতেছে রাজকোটের ভীরু ও লাজুক মোহনদাসের কথা। বাল্যের ভীরুতা ও লজ্জা একদিন যাঁহাকে বিদ্যালয়ের সমবয়সী

সঙ্গীদের কাছেও তুচ্ছ ও মূক করিয়া রাখিয়াছিল……প্রথম যৌবনের সঙ্কোচ একদিন যাঁহাকে গুটিকতক লোকের সম্মিলনীর সামনে কথা বলিতে পর্য্যন্ত অসমর্থ করিয়া রাখিয়াছিল, দুর্ব্বলতা যাঁহাকে লিখিত বিষয়ে বক্তৃতা-দান করিবার সময়েও গলদঘর্ম্ম করিয়া তুলিত—সেই মোহনদাস, মহাত্মা গান্ধীরূপে সত্যের আলোকবর্ত্তিকাধারণকারী-রূপে, অহিংসা ও অসহযোগর উদ্ভাবনকারীরূপে সমস্ত ভয়, লজ্জা ও সঙ্কোচকে নিমেষে জয় করিলেন,… ভয়, লজ্জা ও সঙ্কোচকে সমাহিত করিয়া তাহার উপর নির্ভীকতা, অকপটতা ও বিনয়মণ্ডিত তেজস্বিতার সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিলেন, সেই ভিত্তির উপর নিজ শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের বিশাল ইমারত রচনা করিলেন। ক্ষুদ্র একটি চারা গাছ প্রকাণ্ড মহীরূহরূপে ভারতের আকাশে মাথা উঁচু করিল……

ভারতের মহাসভায় শ্রেষ্ঠ নেতা ও একমাত্র অধিনায়কের স্থান তিনি গ্রহণ করিলেন।

গান্ধীজীর কর্ম্ম-জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। নদী পাহাড় হইতে নামিতে লাগিল……

বাধায় আর পাথরের আঘাতে ক্ষীণ ও সঙ্কুচিত হইতে লাগিল……

ক্ষীণস্রোতা নদী সমতলক্ষেত্রে নামিল……

ক্ষীণদেহ সমতল মাটিতে প্রসারিত করিয়া দিল……

নদী বাধামুক্ত হইল…বিরাট হইল…প্রশস্ত হইল…

ক্ষরস্রোতা নদী অবাধগতিতে ছুটিয়া চলিল…

পৃথিবী বুক পাতিয়া নদীর শ্রেষ্ঠত্বকে গ্রহণ করিল……

সত্যদ্রষ্টা গান্ধীজীর জীবনের ক্রমবিকাশের ধারাটিকে নদীর ধারার সহিত কল্পনা করিলে আমরা উভয়ের মধ্যে একটি বিচিত্র সমন্বয় দেখিতে পাইব।

* * *

গান্ধীজী প্রচার করিলেন, ভারতবাসী এই রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিবে। সরকার এই প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিলে

এই আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিবে৭ তিনি জানাইলেন—"এই আইনের প্রত্যুত্তর-স্বরূপ, আমরা সমস্ত দেশ জুড়িয়া হরতাল করার সঙ্কল্প গ্রহণ করিব। সত্যাগ্রহ আত্মশুদ্ধির যুদ্ধ, ইহা ধর্ম্ম-যুদ্ধ। ধর্ম্মকার্য্য শুদ্ধি দ্বারাই আরম্ভ করা উচিত। ঐদিন সকলে উপবাস করিবে ও নিজেদের কাজকর্ম্ম বন্ধ রাখিবে। মুসলমানদের রোজার উপর উপবাস দরকার নাই।" এই উপবাস ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত পালন করার অনুরোধ জানান হইল।

প্রতিবাদ-স্বরূপ গান্ধীজী ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল সাধারণ হরতাল করিবার জন্য ঘোষণা প্রচার করিলেন। সকল ভারতবাসীকে ঐ দিন উপবাস করিয়া অন্তরে দৃঢ় ইচ্ছা ও শক্তিলাভ করিতে অনুবোধ করা হইল। সকলকে বাহিরের কাজ-কর্ম্ম, অফিস-আদালত মিল-কারখানায় কাজের জন্য যোগদান করিতে নিষেধ করা হইল। ঐ মাসে মুসলমানগণের রোজার মাস ছিল, সেইজন্য মুসলমানভাইগণকে পৃথক উপবাস না করিয়া ঐ রোজার সহিত উপবাস পালন করিতে অনুরোধ করা হইল।

অল্প সমযের মধ্যে এই হরতালের সংবাদ সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। ধনী-দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান, জৈন-পার্শী বৌদ্ধ-খৃষ্টান সকল ভারতবাসীর মধ্যে উৎসাহের সাড়া পড়িয়া গেল। কুখ্যাত আইনকে প্রতিরোধ করিবার একটা অব্যর্থ উপায যেন নিপীড়িত ও প্রত্যাখ্যাত ভারতবাসী খুঁজিয়া পাইল। গান্ধীজী এই সমযে হরতালকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বোম্বাই গমন করিলেন। মাদ্রাজের কাজের ভার শ্রীরাজাগোপালাচারী, সর্দ্দার প্যাটেল, শ্রীমতী কস্তুরী আযেঙ্গার প্রভৃতির উপর দিয়া গেলেন। এই রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য্যের সময়েই তাঁহার শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী রাজাগোপাল আচারিয়ার সহিত পরিচয় ও মিলন হয়। শ্রীরাজাগোপাল গান্ধীজীর সহকর্ম্মীরূপে এই সময়ে দেশসেবার কার্য্যে অবতীর্ণ হন।

ভারতের সর্ব্বত্র বিরাট সাফল্যের সহিত হরতাল পালিত হইল। কোন কোন স্থানে ভারতবাসীগণ শোভাযাত্রা করিয়া রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে করিতে 'রাস্তা পরিভ্রমণ করিল। বোম্বাই সহরে গান্ধীজী নিজে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও অন্যান্য বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলমান নেতাগণের সহিত এক বিরাট শোভাযাত্রায় যোগদান করিলেন। শোভাযাত্রা এক মস্‌জিদের সামনে আসিলে, মস্‌জিদের অধিবাসী মুসলমান মৌলবীগণের অনুরোধে গান্ধীজী মস্‌জিদের চত্বরে দাঁড়াইয়া বিরাট হিন্দু-মুসলমান জনতাকে এই আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য ঐক্যবদ্ধ ও প্রস্তুত হইতে অনুরোধ করিলেন। জনতা সমবেত-কণ্ঠে তাঁহার উপদেশ-মত সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে, জানাইয়া দিল।

হরতাল শান্তির সহিত পালিত হইলেও ইংরাজ সরকার অশান্তি সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিল। কোন কোন দেশে সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী শোভাযাত্রার গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিল, শোভাযাত্রায় যোগদানকারী জনতাকে প্রহার করিল। বহু লোককে বিনা কারণে গ্রেপ্তার করিল। অগত্যা জনতাও কোন কোন স্থানে কিছু উচ্ছৃঙ্খল হইযা উঠিল। আমেদাবাদ সহরে জনতার সহিত পুলিশের সংঘর্ষ বাধিল, দিল্লী ও পাঞ্জাবের 'অমৃতসর' প্রভৃতি সহরে দাঙ্গা বাধিয়া গেল। কলিকাতা সহরেও পুলিশদল কোন কোন স্থানে অশান্তির সৃষ্টি করিল।

অশান্তি ও হিংসার সংবাদ শুনিয়া অহিংসার পূজারী বিচলিত হইয়া উঠিলেন। দিল্লী ও পাঞ্জাবে ঘটনা বেশীদূর গড়াইতে পারে জানিয়া তিনি অবিলম্বে দিল্লী ও পাঞ্জাব যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। গান্ধীজী কয়েক-জন সহকর্ম্মীর সহিত দিল্লীগামী ট্রেনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার দিল্লী যাওয়া হইল না। ট্রেণ ৮ই এপ্রিল তারিখে মথুরা পৌছিল·· ঐ সময়ে পুলিশ আসিয়া গান্ধীজীর কামরায় প্রবেশ করিয়া সরকারের হুকুমনামা তাঁহাকে জানাইয়া দিল—'আপনি দিল্লী বা পাঞ্জাবে প্রবেশ করিলে তথায় অধিক শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা। অতএব ঐ প্রদেশের সীমানার মধ্যে আপনাকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।' গান্ধীজী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ

মৃদু হাসি হাসিলেন। হাসির সহিত হৃদয়ের দৃঢ়তা মিশাইয়া সহজ কণ্ঠে বলিলেন, 'আমি অশান্তি বাড়াইতে যাইতেছি না, বরং অশান্তি কমাইতে যাইতেছি। অতএব আমি বিশেষ দুঃখিত যে সরকারের এই হুকুম আমি মানিতে পারিব না।'

হুকুম অমান্য করিয়া দৃঢ়চিত্ত গান্ধীজী যাত্রা করিলেন। পলওয়াল ষ্টেশনে পুলিশদল তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল। গ্রেপ্তার করিয়া অন্য গাড়ীতে উঠাইযা লইল।

কিন্তু গান্ধীজীর এই গ্রেপ্তারের সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। ভারতের অধিবাসীগণ এই সংবাদে অস্থির হইয়া উঠিল, ক্ষিপ্ত হইযা উঠিল। বিভিন্ন প্রদেশে সাধারণে ও পুলিশে সংঘর্ষ বাধিয়া গেল।

সরকার এইসব দেখিয়া চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে বোম্বাই সহরের নিকটবর্ত্তী একটি ষ্টেশনে আনিযা ছাড়িয়া দিলেন। গান্ধীজী সেখান হইতে বোম্বাই সহরে আগমন করিলেন। সহরবাসী হিন্দু-মুসলমান তাঁহাকে উচ্ছ্বসিত আবেগে অভ্যর্থনা করিল, তাঁহাকে লইয়া বিরাট এক শোভাযাত্রা বাহির করিল। সরকারের আবার দুর্ব্বুদ্ধি জাগিল। কর্ত্তৃপক্ষ শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য বিরাট এক পুলিশ-বাহিনী প্রেরণ করিলেন। পুলিশ আসিযা শোভাযাত্রার গতিরোধ করিল। কিন্তু জনতা পুলিশের হুকুমে শোভাযাত্রা ভঙ্গ করিতে চাহিল না। পুলিশেরও জেদ বাড়িযা গেল। অশ্বারোহী পুলিশ-বাহিনী জনতাকে দলিত নিষ্পেষিত করিয়া জনতার মধ্যে প্রবেশ করিল। অসংখ্য লোক আহত হইল, অসংখ্য লোক মুমূর্ষু হইল। হিংসার সাহায্যে অত্যাচারী কর্ত্তৃপক্ষ অহিংস শান্ত জনসংঘকে ছত্রভঙ্গ করিল। কর্ত্তৃপক্ষের এই অসাধু ব্যবহারে গান্ধীজীর মন বিতৃষ্ণায় ভরিযা উঠিল···জনতার এই দুর্দ্দশায় তাঁহার অন্তর বেদনায় গলিয়া গেল। তিনি প্রশান্ত ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বোম্বাই-এর পুলিশ কমিশনারের নিকট উপস্থিত হইলেন, এই নিষ্ঠুর পশুতুল্য ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন।

কমিশনার গান্ধীজীর প্রতিবাদের উত্তরে জানাইলেন, গান্ধীজীর শান্তি-পূর্ণ ও অহিংস আন্দোলনের কৌশল জনসাধারণ গ্রহণ করে না। তাহারা প্রতিবাদের সুযোগ লইয়া সরকারের কর্ম্মচারীদের আক্রমণ করে, সরকারী দ্রব্যাদি নষ্ট করে, তাই সরকার বাধ্য হইয়া দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

গান্ধীজী জানাইলেন, কিন্তু এক্ষেত্রে কমিশনার ভুল করিতেছেন, কারণ শোভাযাত্রার মধ্যে কেহই সরকারী বাহিনীকে আক্রমণ করে নাই।

কমিশনার গান্ধীজীর যুক্তি মানিলেন না, বরং ব্যঙ্গের সহিত জানাইলেন, গান্ধীজী দেশকে মাতাইতে পারেন, কিন্তু উন্মত্ত জনতাকে শান্ত করিতে পারেন না। তাই সরকার প্রয়োজন হইলে সর্ব্বত্রই জনতাকে শায়েস্তা করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

দুঃখিত গান্ধীজী কমিশনারের অফিস হইতে ফিরিয়া আসিলেন। জনসাধারণকে দমন করিবার জন্য দিকে দিকে সরকারী দমননীতির আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল···মানুষ প্রহৃত হইল, বন্দী হইল, কারাগারে প্রেরিত হইল।

ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে। সাধারণ মানুষের ধৈর্য্য সেই সীমায় আসিয়া পৌঁছিল। সরকারের চণ্ডনীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণ অশান্ত হইয়া উঠিল। শ্রমিকগণ বোম্বাই আমেদাবাদ প্রভৃতি সহরের রেল লাইন উপড়াইয়া ফেলিল, টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া ফেলিল, কোন কোন স্থানে সরকারী অফিস আক্রান্ত হইল।

সাধারণের এই হিংসার সংবাদ শুনিয়া গান্ধীজী ব্যথিত হইয়া উঠিলেন, বিশেষ দুশ্চিন্তার মধ্যে তিনি ডুবিয়া গেলেন। বুঝিলেন, জনসাধারণ শান্ত নিরুপদ্রব প্রতিরোধের কৌশল এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। সুতরাং অকস্মাৎ ভারতের জনসাধারণকে এই কার্য্যধারার মধ্যে টানিয়া আনিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন।

নিজের হঠকারিতার ভুল গান্ধীজী অনুধাবন করিলেন, এবং দেশবাসীকে সংযত হইতে উপদেশ দান করিলেন।

গান্ধীজীর এই আত্মদোষ-স্বীকারে ও আন্দোলন বন্ধ করার সঙ্কল্পে তাঁহার কোন কোন সহকর্মী নিরুৎসাহ হইলেন—গান্ধীজীর নিকট তাঁহারা অনুযোগ করিলেন।

গান্ধীজী তাঁহাদের বুঝাইলেন, দেশবাসীকে প্রথমে সত্যাগ্রহ ও অহিংসা শিক্ষা দিতে হইবে। সত্য ও অহিংসার নীতি জানিতে পারিলে দেশ হিংসার বিরুদ্ধে হিংসার প্রয়োগ করিতে বিরত হইবে। বরং হিংসার বদলে শান্তি ও ধৈর্য্যের সহিত অহিংসাময় প্রতিরোধ গ্রহণ করিবে। সেই প্রতিরোধ ধর্ম্মের সহিত যুক্ত হইয়া অসীম শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। তখন জগতের কোন হিংস্র শক্তির পক্ষেই সেই শক্তিকে রুদ্ধ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। অহিংস অসহযোগের কাছে সমস্ত পশুশক্তি পরাজয় স্বীকার করিবে।

গান্ধীজী তাঁহাদের জানাইলেন, দেশবাসীকে এই অহিংসা ও সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার পূর্ব্বে তিনি সত্যাগ্রহ-সভা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন স্থানে দেশবাসীকে সত্যাগ্রহে দীক্ষিত করিবার জন্য সত্যাগ্রহী-শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা উপযুক্ত সময়ে এই বিষয়ে আবার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

তেতাল্লিশ

জালিয়ানওয়ালাবাগ

গান্ধীজী তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন···

কিন্তু শাসকশক্তি গান্ধীজীর কর্ত্তব্যের অপেক্ষা না করিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেছিলেন। প্রতিবাদমুখর ভারতবাসীকে অন্যায় পীড়নের দ্বারা নীরব করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

এই অপচেষ্টার দৃষ্টান্ত জালিযানওয়ালাবাগ।

রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে হরতাল উপলক্ষ্য করিয়া পাঞ্জাবেও অন্যান্য প্রদেশের মত একটা বিরাট আলোড়ন পড়িয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ পাঞ্জাবের অমৃতসহরে এই বিষয়ে যেন একটা বিশেষত্ব দেখা গিয়াছিল। অমৃতসহরের হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মের লোক, বৃদ্ধ যুবা নারী প্রভৃতি সমস্ত মানুষ, ধনী দরিদ্র প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণী, হরতাল পালন ও প্রতিবাদ জ্ঞাপনে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। পাঞ্জাব ইংরাজের সৈন্য সরবরাহের দেশ। পাঞ্জাবী হিন্দু, মুসলমান, শিখগণ ইংরাজ সরকারের সৈন্যদলকে বিশেষভাবে পুষ্ট করিয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে বহু বিপর্য্যয় হইতে ইংরাজের মান ও প্রাণ পাঞ্জাবী সৈন্যেরা রক্ষা করিয়াছিল। সেই পাঞ্জাবীদের অন্তরেও স্বায়ত্তশাসনের স্পৃহা জাগিয়াছিল, আত্মনিয়ন্ত্রণের ইচ্ছা জাগিয়াছিল। তাহারাও অন্যান্য সাহায্যকারী অনুরক্ত ভারতবাসীর ন্যায় বিশ্বাস করিয়াছিল, এই সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে ইংরাজ সরকার তাহাদের অনেক কিছু প্রতিদান দিবেন. তাহাদের স্বদেশ-শাসনের কোন কোন অধিকার দিবেন।

সরকার এই সেবার প্রতিদান দিলেন···রাউলাট আইন!

কৃতজ্ঞতার প্রতিদান···বড় করুণ ও নিষ্ঠুর প্রতিদান!···যখন ইংরাজের অনুগত শিখ, মুসলমান ও হিন্দু পাঞ্জাববাসীগণ সরকারের রাউলাট আইনের ঘোষণা শুনিল, তখন তাহারা যতটা না বিস্মিত হইল, ততটা ক্রুদ্ধ
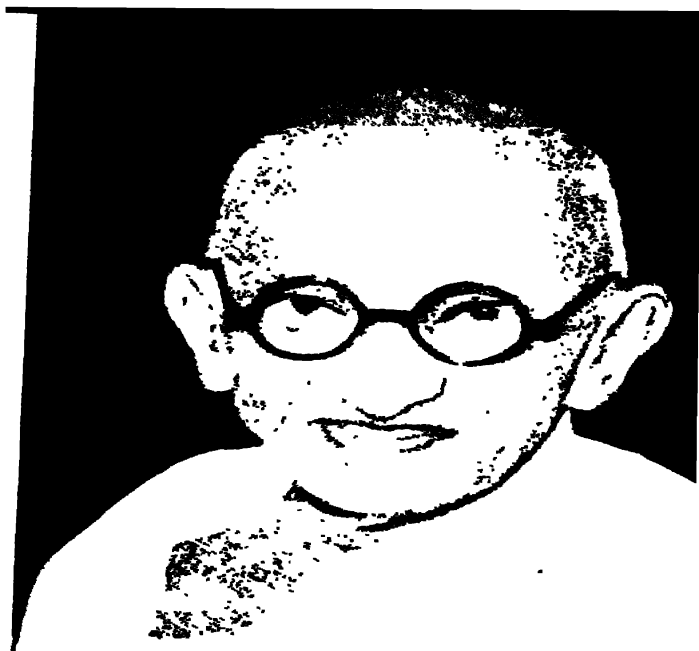
হইয়া উঠিল। তাহার পরই তাহারা এই অকৃতজ্ঞতার বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করিবার জন্য হরতালের আহ্বান জানাইল। সমরলিপ্সু পাঞ্জাবীগণ অহিংসা-মন্ত্রের পূজারীর মন্ত্র গ্রহণ করিল, সুসংবদ্ধ ও সুগঠিতভাবে আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিল।

কিন্তু মাত্র কয়েক রাত্রের মধ্যে বিরাট জনসাধারণের ভিতর পূর্ণ অহিংসার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না।

তাই অমৃতসহরের কোন কোন অংশে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিল। অবশ্য অত্যাচারী পুলিশের দমন-নীতির প্রতিক্রিয়ার ফলেই এই উচ্ছৃঙ্খলতা মাথা চাড়া দিয়াছিল।

অবশেষে পাঞ্জাবের কর্তৃপক্ষ এক অমানুষিক কাণ্ড করিয়া বসিল। তাহারা জনসাধারণকে সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রা করিতে নিষেধ করিয়া এক সামরিক আইন জারি করিল। অতি অল্পসংখ্যক লোকই এই সামরিক আইনের কথা জানিতে পারিল। অধিকাংশের কাছেই এই আইন-জারির সংবাদটা পৌঁছায় নাই।

নেতাগণ ১৩ই এপ্রিল তারিখে অমৃতসহরের জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রাচীর-বেষ্টিত মাঠে রাউলাট আইন ও সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণার জন্য একটি সভার আয়োজন করিলেন। ১৩ই এপ্রিল দলে দলে লোক আসিয়া ঐ সভাস্থলে সমবেত হইল, হিন্দু-মুসলমান সকলেই জালিয়ান-ওয়ালাবাগের মাঠে প্রতিবাদ করিবার জন্য আগমন করিল। অকস্মাৎ সশস্ত্র এক সৈন্যবাহিনী ডায়ার নামক একজন সামরিক কর্ম্মচারীর নেতৃত্বে জালিয়ানওয়ালাবাগের মাঠ ঘিরিয়া ফেলিল। ঐ মাঠে মাত্র দুইটি প্রবেশ-পথ ছিল। ডায়ারের আদেশে সৈন্যবাহিনী নিরস্ত্র জনতার উপর প্রবলবেগে গুলিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। শান্ত জনতা অতর্কিতে আক্রান্ত হইল, জনতা দিশাহারা হইল। সকলেই বাহির হইবার জন্য, পলাইবার জন্য ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি করিতে লাগিল। বাহির হইবার পথে গুলির বৃষ্টি আরো বাড়িয়া

গেল, মানুষ—বৃদ্ধ, যুবা, শিশু রুধিরাক্ত কলেবরে মাটির বুকে লুটাইয়া পড়িল। হুড়াহুড়ির ফলে দলিত ও পিষ্ট হইয়া কত দুর্ব্বল, বৃদ্ধ ও শিশুর দল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। মাঠে মৃতদেহের পাহাড় জমিয়া উঠিল। যন্ত্রণাকাতরের আর্ত্তনাদে, মুমূর্ষুর চীৎকারে, আহতের আর্ত্তনাদে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। হাজার হাজার (কেহ কেহ বলেন প্রায় কুড়ি হাজার লোক সভায় সমবেত হইয়াছিল) মানুষের রক্তে মাঠের কঠিন মাটি ভিজিয়া গেল, কোমল হইয়া উঠিল। সৈন্যদলের গুলি নিঃশেষিত হইল…গুলি ফুরাইয়া গেল দেখিয়া ডায়ার বড়ই দুঃখিত হইলেন। ভারতবাসীগণকে রীতিমত জব্দ করিতে না পারিয়া অন্তরে আফশোষ লইয়া নিজ সৈন্যদল সহ মাঠ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এই দুঃসংবাদ সন্ধ্যার দিকে সহরের লোকে জানিতে পারিল। হতভাগ্য সহরবাসীগণ আত্মীয়স্বজনের কথা চিন্তা করিয়া মাঠের দিকে ছুটিয়া আসিল। রাত্রি আসিয়া তাহার অন্ধকাররূপ কালো আঁচল বিছাইয়া এই বীভৎস ও করুণ দৃশ্যকে ঢাকিয়া দিল। কিন্তু আকুল জনতা কি অন্ধকার মানে? স্ত্রী আসিয়া মৃত স্বামীর দেহ খুঁজিতে লাগিল, পুত্র আসিয়া পিতার দেহ অন্বেষণ করিতে লাগিল, বৃদ্ধ পিতা আসিয়া যুবক পুত্রের দেহের জন্য এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

অশুভ রাত্রির অবসান হইল। কিন্তু অমৃতসহরের হিন্দু-মুসলমানের দুর্দ্দশার অবসান হইল না। বরং নূতন দুর্দ্দশা ও পীড়নের বোঝা তাহাদের উপর নামিয়া আসিল। শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী প্রবেশ করিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। রাস্তা দিয়া লোক যাইলে তাহাকে হামাগুড়ি দিয়া চলিতে আদেশ করিল, ইউনিয়ন জ্যাককে অভিবাদন করিতে বাধ্য করিল। মানুষের উপর পশুর মত ব্যবহার করিতে লাগিল। পাঞ্জাব-সরকারের বর্ব্বরোচিত অত্যাচার চরমে পৌঁছিল।

এই দুর্ঘটনা ও অত্যাচারের সংবাদ প্রথমে পাঞ্জাবের কর্ত্তৃপক্ষ চাপিয়া

রাখিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সরকারের সতর্কতাকে অতিক্রম করিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই ইহা সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িল। ইহা শুনিয়া সমগ্র ভারতের আত্মা শিহরিয়া উঠিল, সমগ্র ভারত শোকে ও বেদনায় মুহ্যমান হইয়া পড়িল। ইংরাজের মনুষ্যত্বে সাধারণ ভারতবাসীটি পর্য্যন্ত সন্দিহান হইয়া উঠিল! সংবাদ শুনিয়া ও সংবাদের ভীষণতা চিন্তা করিয়া ইংরাজের মনুষ্যত্বে বিশ্বাসী গান্ধীজীও শেষ পর্য্যন্ত ইংরাজ-চরিত্রে সন্দিহান হইয়া পড়িলেন। পাঞ্জাবের অসহায় ও হতভাগ্য দেশবাসীকে এই বিপদে সান্ত্বনা দিবার জন্য গান্ধীজীর প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

গান্ধীজী গভর্ণর-জেনারেল লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে পত্র লিখিলেন, পত্রে অনুরোধ করিলেন তাঁহাকে পাঞ্জাব যাইবার অনুমতি দিবার জন্য। কিন্তু গভর্ণর-জেনারেল অনুমতি দিলেন না।

হৃদয়ের আকুলতাবশতঃ গান্ধীজী একবার ভাবিলেন, তিনি গভর্ণর-জেনারেলের আদেশ অমান্য করিবেন। কিন্তু বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, এই উত্তেজনার মুহূর্ত্তে আইন অমান্য করিলে আরো বিপরীত ও ভয়ঙ্কর ফল ফলিতে পারে। আদেশ অমান্য করার জন্য হয়ত সরকার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবেন, আর তাঁহার গ্রেপ্তারের সংবাদ এই শোকার্ত্ত ও উত্তপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে 'আগুনে ঘি' ঢালার মত কাজ করিবে। দেশবাসী ক্রুদ্ধ হইবে, হিংস্র হইয়া উঠিবে, শাসকবর্গের প্রতি 'মারমুখো' হইয়া উঠিবে। আর দেশবাসীর এই কার্য্যের সুযোগ লইয়া অত্যাচারী সরকার আরো অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিবে, দেশব্যাপী দমন ও ধ্বংসাত্মক কার্য্য চালাইবে, দেশ দুর্দ্দশা ও দুঃখের চরম পঙ্কে নিপতিত হইবে। বিবেচনা করিয়া গান্ধীজী তখনকার মত পাঞ্জাব গমন স্থগিত রাখিলেন। কিন্তু 'ইয়ং ইণ্ডিয়া', 'নবজীবন' প্রভৃতি পত্রিকার মারফৎ পাঞ্জাব সরকারের এই চণ্ডনীতির বিরুদ্ধে তীব্র ও কঠোর সমালোচনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তদানীন্তন আর একটি বিখ্যাত ইংরাজি পত্রিকা 'বোম্বাই ক্রনিকেল'ও

এই অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে প্রচার করিতেছিলেন। ইহার সত্য-প্রচারে বিব্রত হইয়া বোম্বাই সরকার ইহার তেজস্বী সম্পাদক মিষ্টার হর্ণিম্যানকে গ্রেপ্তার করিলেন। তখন ইহার পরিচালকবর্গের অনুরোধে গান্ধীজী এই পত্রিকাটিরও ভার গ্রহণ করিলেন এবং ইহার সাহায্যেও দেশময় তীব্র প্রচার-কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। ইহা ব্যতীত দিল্লী, এলাহাবাদ, কলিকাতা প্রভৃতি নগরের প্রায় সকল দেশীয় ও জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলিও এই জঘন্য কাণ্ডের বিরুদ্ধে নির্ভীক ও সত্য সমালোচনা করিয়া দেশবাসীকে সজাগ ও বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিলেন। ভারতের প্রত্যেকটি সংবাদপত্র গান্ধীজীর পাঞ্জাব গমনের নিষেধাজ্ঞার সংবাদ শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিল এবং অবিলম্বে গান্ধীজীকে পাঞ্জাব গমনে অনুমতি দিবার জন্য দাবী করিতে লাগিল। পাঞ্জাবের জনসাধারণও দুর্দ্দিনে এই মহামানবের স্নেহ ও সহানুভূতি পাইয়া আঘাতের যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য আকুলভাবে তাঁহার আগমন কামনা করিতে লাগিল। বিশিষ্ট পাঞ্জাবী নেতাগণ বোম্বাইয়ে আসিয়া গান্ধীজীর সহিত দেখা করিলেন, পাঞ্জাব যাইবার জন্য গান্ধীজীকে মিনতি করিলেন। এই কাতরতায় গান্ধীজীর হৃদয় ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

হিংস্র ও রক্তপিপাসু পশুর দল

নিরীহ ও শান্ত মানবশিশুগুলির উপর অত্যাচার করে····· তাহাদের দংশন করে···ক্ষতবিক্ষত করে······

রক্তাক্ত শিশুগণ বেদনায় আর্ত্তনাদ করে·····

তাহাদের আর্ত্তনাদ করুণকোমলা মাতার কর্ণে প্রবেশ করে···

স্নেহপরায়ণা মাতা ব্যাকুল হইয়া উঠেন······

আহত সন্তানদের কাছে ছুটিয়া যাইবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিতে থাকেন·· ···

হিংস্র শাসকের দল·· ·

নিরীহ ও শান্ত ভারতবাসীর উপর অত্যাচার করে, তাহাদের পীড়ন করে······ক্ষতবিক্ষত করে······

অত্যাচারিত ভারতবাসীগণ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করে·· ···

তাহাদের আর্ত্তনাদ সহানুভূতি-পরায়ণ গান্ধীজীর কর্ণে প্রবেশ করে······

গান্ধীজী ব্যাকুল হইয়া উঠেন······

অত্যাচারিত ও নিপীড়িত দেশবাসীর কাছে যাইবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিলেন······

গান্ধীজী আবার গভর্ণর-জেনারেলকে পত্র লিখিলেন। এবার এই পত্রে বিনযের সহিত দৃঢ়তা ও একাগ্রতার সঙ্কল্পও জানান হইযাছিল। সত্যসন্ধ এই মহামানবের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা জানিতে পারিয়া এবার গভর্ণর-জেনারেল তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন, গান্ধীজীকে পাঞ্জাব গমনের জন্য অনুমতি দিলেন।

পাঞ্জাব-বাসীগণের জন্য গান্ধীজীর বিনিদ্র রজনী যাপনের পালা শেষ হইল। তিনি কযেকজন সহকর্ম্মীর সহিত অনতিবিলম্বে পাঞ্জাব যাত্রা করিলেন, অক্টোবর মাসের শেষের দিকে লাহোরে উপস্থিত হইলেন (গান্ধীজী ১৭ই অক্টোবর পাঞ্জাব গমনের অনুমতি লাভ করেন)।

হতভাগ্য সন্তানের পাশে যেন স্নেহপরাযণা মাতা আসিযা দাঁড়াইলেন······

হতভাগ্য ও বিভ্রান্ত পাঞ্জাবীগণ গান্ধীজীর কাছে দলে দলে ছুটিয়া আসিল······চোখের জলের সহিত অন্তরের বেদনার কাহিনী শুনাইতে লাগিল।

গান্ধীজীও যেন প্রথমটা বিভ্রান্ত ও বেদনার্ত্ত হইযা উঠিলেন······অমৃতসহরের জালিযানওয়ালাবাগের মৃত্তিকায হিন্দু-মুসলমানের শুষ্ক রক্ত দেখিয়া স্তম্ভিত হইযা গেলেন! কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন, ধীর-মস্তিষ্কে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক চিন্তা করিলেন, এই অমানুষিক অত্যাচারের প্রকৃত ইতিহাস জানিবার জন্য ও ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলেন।

তখন পাঞ্জাবের অধিকাংশ নেতাই কারাগারের অন্তরালে ছিলেন। যাঁহারা বাহিরে ছিলেন, গান্ধীজী তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিলেন। আরো অধিক পরামর্শ ও বিবেচনা করিবার উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানের নেতাগণকে অবিলম্বে পাঞ্জাবে আসিবার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অনুরোধে কলিকাতা হইতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, বারাণসী হইতে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, এলাহাবাদ হইতে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, বোম্বাই হইতে শ্রীযুক্ত আব্বাস তাযেবজী, শ্রীযুক্ত জয়াকর ও আরও অনেকে অবিলম্বে লাহোরে উপস্থিত হইলেন। গান্ধীজী সকলের সহিত ও সকলে গান্ধীজীর সহিত বিশেষভাবে পরামর্শ ও আলোচনা করিলেন। গান্ধীজী এই নাদীরশাহী হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে ও বেসরকারীভাবে তদন্ত করিবার জন্য নেতাগণের নিকট প্রস্তাব করিলেন। নেতাগণও তাঁহার প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া এই বিষয়ে যথাযোগ্য তদন্ত কবিবার জন্য একটি বেসরকারী তদন্ত-সমিতি গঠন করিতে সিদ্ধান্ত করিলেন এবং অবিলম্বে সমিতি-মারফৎ তদন্তের কার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা করিলেন। নেতাগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সংবাদপত্র দ্বারা প্রচার করিলেন, অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত দেশবাসীগণকে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেযে এই সমিতির নিকট প্রকৃত ঘটনাবিষযে সাক্ষ্য প্রমাণাদি দিতে আহ্বান করিলেন।

তদন্ত-সমিতির এক একজন সভ্য তদন্তের জন্য পাঞ্জাবের এক এক স্থানে ছড়াইয়া পড়িলেন। গান্ধীজী অমৃতসহরের আশপাশের গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলেন। গ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী অধিবাসীগণের নিকট হইতে হত্যাকাণ্ড বিষযে প্রকৃত ও করুণ সাক্ষ্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করিলেন, নযনের অশ্রুর সহিত অত্যাচারের ও অনাচারের বীভৎস ইতিহাস শ্রবণ করিলেন। পরে অন্যান্য সভ্যগণের সহিত নির্দ্দিষ্ট সমযে আবার লাহোরে মিলিত হইলেন। এইবার তদন্ত-সমিতি তাঁহাদের তদন্তের বিবরণ ও ফল (রিপোর্ট) প্রকাশ করিবার ভার গান্ধীজীকে প্রদান করিলেন। গান্ধীজীও

অসামান্ত পরিশ্রম সহকারে তাঁহার বিবরণী প্রস্তুত করিলেন এবং উহা সমিতির হাতে সমর্পণ করিলেন। সমিতি ঐ বিবরণী সংবাদপত্রের সাহায্যে সমগ্র ভারতে প্রচার করিলেন।

সমিতির ঐ বিবরণ পড়িয়া সমগ্র ভারতবর্ষ, এমন কি সমগ্র জগৎ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। নিজ স্বার্থের জন্য, নিজ সাম্রাজ্য-রক্ষার জন্য ইংরাজ সরকার যে কত বড় নীচ নিষ্ঠুর ব্যবহার মানুষের উপর করিয়াছে, তাহা জানিয়া সমগ্র দেশের মানুষ বিস্মিত ও লজ্জিত হইল। ডায়ারের ও তাঁহার সৈন্যদলের পৈশাচিক হত্যার বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্ববাসী নিন্দা ও সমালোচনা করিতে লাগিল।

ভারতসরকার ও ব্রিটিশসরকার এই সত্য-প্রকাশে বিব্রত হইয়া উঠিল, অন্ততঃ লজ্জার খাতিরেও এবং বিশ্বজনমতকে চাপা দিবার উদ্দেশ্যেও এইবার নিজেরা সরকারীভাবে একটি তদন্ত-সমিতি গঠন করিল। লর্ড হাণ্টার নামক একজন ইংরাজের সভাপতিত্বে হাণ্টার কমিটি স্থাপিত হইল। সরকার গান্ধীজীকেও এই সমিতির একজন সভ্য হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু গান্ধীজী…সত্যের পূজারী গান্ধীজী…এই সত্য-গোপনের অনুষ্ঠানটিকে স্পষ্ট উত্তর দিয়া বর্জ্জন করিলেন। দেশবাসী কর্ত্তৃক বেসরকারী সমিতি গঠনের পর আর সরকারী সমিতির কোনই প্রয়োজন নাই—ইহা জানাইয়া দিলেন। গান্ধীজীর আদর্শ অনুসারে সমগ্র দেশও এই ভণ্ড সমিতিকে সাহায্য করিতে নিবৃত্ত হইল। ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী 'হাণ্টার কমিটি'কে বর্জ্জন করিল।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী কূটচক্রীরা ইহাতে নিবৃত্ত হইবে কেন? তাহারা লোক-দেখান তদন্ত করিয়া তাহাদের মনোমত তদন্ত ফল প্রকাশ করিল। হাণ্টার কমিটি মাইকেল ওডায়ার ও সৈন্যদলের কার্য্যকলাপ অনুচিত বিবেচনা করিয়াও তাহাদের নির্দ্দোষ ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ বলিয়া মত প্রকাশ করিল এবং তাঁহাদের কর্ম্মের জন্য তাঁহাদের রেহাই দিতে অনুরোধ করিল। কর্ত্তৃপক্ষ কমিটির

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন, অত্যাচারী কর্ম্মচারীদের শাস্তি না দিয়া তাহাদের কোন কোন ব্যক্তিকে কার্য্যে উন্নীত এবং সম্মানিতও করিলেন।

দেশবাসী সরকারের স্বভাব ও স্বরূপ আরো ভাল করিয়া দেখিতে পাইল। এই ভণ্ড ও অত্যাচারী সরকারকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সমগ্র দেশবাসী উন্মুখ হইয়া উঠিল।

এই সময়ে দেশের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব একতা ও সঙ্ঘবদ্ধতার সৃষ্টি হইল। অল্প কথায় বলা যায়, ইংরাজশাসনের যুগে ভারতের এই দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সময়েই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ব্যাপক ও গভীর মিলন ঘটিয়াছিল। এই মিলন ও সঙ্ঘবদ্ধতা কতকগুলি কারণে অধিকতর দৃঢ়-বন্ধনে বদ্ধ হইল। কারণগুলি আমরা এখানে অল্পকথায় বলিতে চেষ্টা করিব।

আমরা আগেই বলিয়াছি গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড চেমস্‌ফোর্ড-এর নিকট হইতে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় ধর্ম্মগুরু খলিফার (তুর্কীর সুলতান) সম্মান ও রাজ্যরক্ষা বিষয়ে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধে ইংরাজকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহার সহিত স্বায়ত্তশাসনের সাধারণ অধিকার লাভের আশায়ও মুসলমান সম্প্রদায় ভারতবাসী হিসাবে যুদ্ধে মিত্রপক্ষের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

কিন্তু যুদ্ধ-শেষে ইংরাজ যেমন ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়কে বঞ্চিত ও হতাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভারতের মুসলমান-সম্প্রদায়কেও বঞ্চিত ও হতাশ করিলেন। ইংরাজ সরকার যুদ্ধে জয়ী হইয়া তাঁহাদের দত্ত প্রতিশ্রুতি শুধু 'কথার কথা' বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। এমন কি সন্ধিসর্ত্তে পরাজিত খলিফার সম্মান-প্রতিপত্তি বিশেষভাবে খর্ব্ব করিলেন, খলিফার রাজ্যের অধিকাশ মিত্র-পক্ষের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন।

এই প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গে ও বিশ্বাসঘাতকতায় ভারতের মুসলমানগণ উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ভারতবাসী ও মুসলমানধর্ম্মের প্রতি ইংরাজের

আচরণের অসঙ্গতি হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইংরাজ-শাসনের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইলেন।

তাহার উপর আবার জালিয়ানওয়ালাবাগের ক্ষেত্রে হিন্দু ও শিখের সহিত মুসলমানের রক্ত-ধারাও মিলিত হইল। অসন্তুষ্ট মুসলমান সম্প্রদায় অকৃতজ্ঞ শাসকের এই অত্যাচারে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত একযোগে ইংরাজের অত্যাচারের প্রতিরোধ করিবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন।

সরল হৃদয় অথচ তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী গান্ধীজী মুসলমানগণের হৃদয়ের এই আবেগ বুঝিতে পারিলেন…সেই সঙ্গে অন্যান্য ভারতবাসীর আবেগও অনুভব করিলেন। বিভিন্ন ভারতবাসীর ভিন্ন ভিন্ন আবেগ ও ইচ্ছাকে তিনি এক ও অবিভাজ্য করিবার ভার গ্রহণ করিলেন।

খলিফার প্রতি এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিবার জন্য ভারতের মুসলমান-সম্প্রদায় খিলাফৎ আন্দোলন সৃষ্টি করিলেন, ইংরাজ সরকারকে আন্দোলনের দ্বারা বিচলিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সময়ে তাঁহারা পাঞ্জাবে গান্ধীজীর নির্ভীক কার্য্যকলাপের বিষয় লক্ষ্য করিলেন। হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতি গান্ধীজীর সহানুভূতি ও সেবাপরায়ণতা লক্ষ্য করিলেন। খিলাফৎ আন্দোলনের স্রষ্টাগণ গান্ধীজীর আন্তরিকতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের মধ্যে আমন্ত্রণ করিলেন‥তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া তাঁহাদের দুঃখকষ্ট ও অভিযোগ প্রত্যক্ষ করিতে এবং তাঁহাদের উপদেশ দিতে আহ্বান করিলেন।

গান্ধীজী তাঁহাদের সহিত অবিলম্বে মিলিত হইলেন। পর পর দুইবার এলাহাবাদে দিল্লীতে ও কলিকাতায় খিলাফতের কয়টি বিশেষ সম্মিলন হইল। গান্ধীজীর সহিত পরামর্শ করিয়া খিলাফৎ সমিতি (মাননীয় সৌকত আলী, মাননীয় মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা হজরৎ সোহানী প্রভৃতি বিশিষ্ট মুসলমানগণ এই সমিতির সভ্য ছিলেন) তাঁহাদের আন্দোলনকে ভারতের জাতীয় মহাসভার সহিত মিলিত করিতে উপদেশ দিলেন। উভয়

প্রতিষ্ঠান একযোগে কর্ম্ম করিয়া এক বিরাট ও বিপুল আন্দোলন সৃষ্টি করিতে সম্মত হইলেন।

ইতিমধ্যে দেশের বিশিষ্ট নরনারীর ভিতরেও পাঞ্জাবের এই হত্যাযজ্ঞে ও ইংরাজের প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের জন্য একটা বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। জগৎপূজ্য কবি রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরাজের এই অত্যাচারে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়া পড়িলেন, ইংরাজের মনুষ্যত্বহীনতায় কবীন্দ্র বিক্ষুব্ধ অন্তরের আবেগ দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন,—"যে ইংরাজ আমার দেশবাসীকে পশুর মত হত্যা করিতে পারে, আমার দেশকে অপমান করিতে পারে, আমি সেই ইংরাজের দেওয়া সম্মান ও পদবী ধারণ করাকে আমার মনুষ্যত্ব ও জাতীয়তা-বোধের পক্ষে লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয় বলিয়া মনে করি। তাই এই অত্যাচারের প্রতিবাদস্বরূপ আমি আজ হইতে ইংরাজের দেওয়া 'নাইট' পদবী হৃদয়ের দৃপ্ততার সহিত প্রত্যাখ্যান ও বর্জ্জন করিতেছি।'

ইংরাজশাসিত ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের অসহায়ত্ব উপলব্ধি করিয়া এবং ইংরাজদের নিষ্ঠুর নির্ম্মমতায় ব্যথিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করিয়া অত্যাচারীর অহেতুক অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাইলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই দৃপ্ত ঘোষণায় গান্ধীজী প্রীত হইলেন। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া তিনিও ঘোষণা করিলেন—গুরুদেবের কবিতা ভারতের জাতীয় জাগরণের অমূল্য সম্পদ, গুরুদেবের (গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথকে ভক্তিবশতঃ গুরুদেব বলিতেন) বাণী ভারতের অন্তরের বাণী। আমিও তাই ইংরাজ জাতি ও আমার ভারতীয় ভাইয়েদের জানাইতেছি, ইংরাজ সরকারের এই অমানুষিক ও নারকীয় বর্ব্বরতার প্রতিবাদ-স্বরূপ আমিও সরকারের প্রদত্ত 'বুয়র পদক' ও 'কৈসর-হি-হিন্দ' পদক প্রত্যখ্যান ও বর্জ্জন করিলাম। যে সরকারের কার্য্যের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছি, তাঁহাদের দেওয়া সম্মানের প্রতিও আমার বিশ্বাস নষ্ট হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ

ও গান্ধীজীর এই কার্য্যে ভারতের উদার-নৈতিক মতবাদ-সম্পন্ন নেতাগণের মধ্যেও ইংরাজের সততা বিষয়ে একটা সন্দেহ ও অবিশ্বাস জাগিল।

সরকার বুঝিলেন, ছোট বড়, সাধারণ অসাধারণ সমস্ত ভারতবাসীর আত্মাই ক্রমশঃ তাঁহাদের শাসনের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিতেছে। সরকার এইবার যেন একটু ভীত হইয়া পড়িলেন। ভারতবাসীগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পার্লিয়ামেণ্টের দ্বারা ১৯১৯ সালে 'মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড আইন' নামে এক আইন পাশ করাইয়া ভারতের শাসন-কার্য্যে কিছু সংস্কার করিতে এবং শাসন-বিষয়ে ভারতবাসীকে সামান্য কিছু অধিকার দিতে প্রস্তুত হইলেন। যথাসময়ে ভারত সরকার 'মেণ্টগু চেমস্‌ফোর্ড এ্যাকটে'র কথা ভারতের জনসাধারণ ও নেতাগণের নিকট বিজ্ঞাপিত করিলেন।

ইহার মধ্যে আর একটি বিশেষ বিষয় আমরা এখানে পৃথক ভাবে আলোচনা করিয়া লইব। আমরা জানিয়াছি, খিলাফৎ কমিটি গান্ধীজীকে তাঁহাদের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গান্ধীজীও এই কমিটি মারফৎ মুসলমান সম্প্রদায়কে জাতীয় মহাসভার সহিত একযোগে কার্য্য করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। এই খিলাফৎ কমিটির মধ্যেই তিনি সর্ব্বপ্রথম ইংরাজ সরকারের সহিত অসহযোগ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রস্তাব খিলাফৎ কমিটি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছিল যে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে কংগ্রেসের সহিত যুক্তমত হইয়া তবে এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। অমৃতসহরের দুর্ঘটনা ও খিলাফতের উদ্দেশ্যের ভিতর দিয়া এইরূপে গান্ধীজীর অসহযোগ নীতির জন্ম হইল।

ইতিমধ্যে অমৃতসহরে কংগ্রেসের একটি অধিবেশন হইল। এই অধিবেশনে গান্ধীজী সম্পূর্ণভাবে মহাসভার কার্য্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাসভার নেতাগণ সত্যের সেবককে পাইয়া ধন্য ও গৌরবান্বিত হইলেন।

চুয়াল্লিশ

প্রথম অসহযোগ আন্দোলন

'মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড এ্যাক্ট' ভারতবাসীর নিকট উপস্থিত করা হইল। কেহ ইহার মধ্যে ভারতবাসীর অধিকার রক্ষার উপায় নিহিত আছে ধারণা করিলেন, কেহ বা ইহার মধ্যে শাসকশ্রেণীর আন্তরিকতার অভাব লক্ষ্য করিয়া হতাশ হইয়া উঠিলেন। ইহা গ্রহণ বা বর্জ্জন বিষয়ে নেতাগণের মধ্যেও একটা বেশ মতানৈক্যের সৃষ্টি হইল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, পণ্ডিত মতিলাল প্রভৃতি এই শাসন-সংস্কারের উপর বিরূপ হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে কোন সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করিবার জন্য প্রথমে সম্মত হন নাই। গান্ধীজী ইহাকে যৎসামান্য ও অকিঞ্চিৎকর জানিয়াও শাসনের প্রাথমিক অধিকার-রূপে গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। নেতাগণ ও গান্ধীজীর মধ্যে এইরূপ ভাবে একটা মতান্তরের আভাস দেখা গেল।

কিন্তু ইংরাজ জাতির আচরণ নেতাগণের ও গান্ধীজীর এই মতান্তর অবিলম্বে বিদূরিত করিতে সাহায্য করিল। পাঞ্জাবের অত্যাচারী ও হত্যাকারী সামরিক কর্ম্মচারী ডায়ার সাহেব যখন বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন বিলাতের জনসাধারণ তাঁহার কর্ম্মের জন্য তাঁহার নিন্দা ত করিলই না, বরং তাঁহার বীরত্বের প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল·· ইংরাজগণ তাঁহার সাহসের জন্য চাঁদা তুলিয়া ২৬০০ পাউণ্ড সংগ্রহ করিয়া (প্রায় তিন লক্ষ টাকা) তাঁহাকে পুরস্কৃত করিল। ইংরাজ জাতি ডায়ারকে সম্মানিত করিয়া ভারতবাসীর উপর অপমান, পীড়ন ও অত্যাচারকে সমর্থন করিল। ভারতের অধিবাসী এবং নেতাগণ এই নূতন অপমানে ও অবজ্ঞায় জ্বলিয়া উঠিলেন। গান্ধীজীও ইংরাজ জাতির এই ব্যবহারে হতাশ হইয়া গেলেন।

দলে দলে হিন্দু ও মুসলমান নেতা গান্ধীজীর কাছে প্রতিকারের ও প্রতিবিধানের জন্য আসা-যাওয়া করিতে লাগিলেন। গান্ধীজী অনেক চিন্তার পর এবিষয়ে মনস্থির করিলেন। তিনি জানাইলেন, ইংরাজ জাতির সততার উপর তিনি বিশ্বাস হারাইয়াছেন। যে জাতি শাসিতের উপর অত্যাচার করিযাও সেই অত্যাচারের নাম করিয়া গৌরব বোধ করে, তাহার শাসনের সহিত আমি বা আমার দেশবাসী কখনও কোনমতে সহযোগিতা করিতে পারি না। আমার মত লইলে আমি দেশবাসীকে জানাইব, তাঁহারা যেন ইংরাজ সরকার ও ইংরাজ শাসনের সহিত সহযোগিতা না করিবার নীতি আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেন।

এই প্রথম গান্ধীজী ভারতবাসীকে ব্যাপক ভাবে ও সাধারণ ভাবে আইন অমান্য করিতে পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান করিলেন।

গান্ধীজীর এই উপদেশের একটা কারণ ছিল। গান্ধীজী বুঝিয়াছিলেন, প্রত্যেকটি ভারতবাসীকে সত্যাগ্রহ ও অহিংসার শিক্ষা দিয়া দেশকে সত্যাগ্রহে অগ্রসর হইতে বলা যায় না। কারণ, কোটি কোটি অধিবাসীর সকলের পক্ষে একসঙ্গে অহিংস হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু যদি কয়েকদল ভারতবাসীও অকপটতার সহিত সত্যাগ্রহ ও অহিংসা-নীতি অনুসারে কাজ করিযা যায়, তাহা হইলে ক্রমে ইহার দ্বারা সকল ভারতবাসী একটা আদর্শ লাভ করিবে, অহিংস উপায়ে সংগ্রাম করিবার প্রেরণা লাভ করিবে। তবে এ ক্ষেত্রেও বিপদ ছিল। উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ও দুষ্ট স্বভাবের লোক এই আন্দোলনের সুযোগ লইয়া উচ্ছৃঙ্খলতা ও হিংসার দ্বারা আন্দোলনকে উদ্দেশ্যভ্রষ্ট ও পথহারা করিবার চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু তাহাদের কুকীর্ত্তির এই ঝুঁকি লইয়াও গান্ধীজী এইবার আইন অমান্য করিতে ও সাধারণ বিষয়ে পর্য্যন্ত ইংরাজকে বর্জ্জন করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

এই সময়েই গান্ধীজী খিলাফৎ আন্দোলনকারীগণের আমন্ত্রণে তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অন্তরে অসহযোগের বীজ বপন

করিয়া ভারতীয় জাতীয় মহাসভা 'দ্বারা ঐ বীজকে জলসিঞ্চিত করিয়া ফলবান বৃক্ষে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

অন্যান্য নেতাগণও অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে একটা কিছু প্রতিরোধের পন্থা খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহারা গান্ধীজীর উপদেশ শুনিলেন এবং তাঁহাদের পথ ও কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য ১৯২০ সালের সেপ্টম্বর মাসে কলিকাতায় জাতীয় মহাসভার একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিলেন। অধিবেশনে গান্ধীজীর আদর্শ ও পন্থা লইয়া প্রথমটা নেতাগণের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদ চলিল' অবশেষে সকল নেতা তাঁহাদের মতভেদ বর্জ্জন করিয়া গান্ধীজীর সহিত একমত হইলেন। তাঁহারাও বুঝিলেন, আপততঃ ইহা ব্যতীত সরকারকে সজাগ করিবার আর কোন উপাযই এখন নাই। অতএব এই অসহযোগ ও অহিংস সত্যাগ্রহের সাহায্য লওযা এখন বিশেষ প্রয়োজন।

গান্ধীজী এই অসহযোগের প্রস্তাব প্রথমে জালিযানওযালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি সবকারের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে ভিত্তি কব্রিযাই পাশ করাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু পরে অন্যান্য নেতাগণের সহিত পরামর্শ করিযা আরো ব্যাপকতর কারণ লইয়া ইহাকে পাশ করাইলেন। গান্ধীজী বলিলেন, ইংরাজ-শাসনের ব্যর্থতা পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হইয়া গিযাছে। ভারতবাসী বুঝিতে পারিয়াছে যে ইংরাজ-শাসনের দ্বারা তাহাদের কোন মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। ভারতবাসী গত চারবৎসর ধরিয়া ব্রিটিশ সাধারণ-তন্ত্রের ভিতরেই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন দাবী করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইংরাজ-সরকার ভারতের এই প্রাথমিক অধিকারের দাবীটুকু পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে চাহে না। পরন্তু ভারতবাসীকে অত্যাচার ও শোষণের দ্বারা 'নির্ব্বীর্য্য ও দুর্ব্বল করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। অতএব আমাদের নিম্নতম অধিকার আদায় করিবার জন্য আমরা বাধ্য হইয়া অসহযোগের প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছি। গান্ধাজীর

প্রস্তাব জাতীয় মহাসভা গ্রহণ করিলেন এবং স্থির করিলেন যে, এই প্রস্তাবের অনুকূলে বা প্রতিকূলে ইংরাজ সরকারের ভাবগতি লক্ষ্য করিয়া মহাসভার আগামী বাৎসরিক অধিবেশনে ইহার নীতি অনুসারে কার্য্যে অগ্রসর হইবার পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। মহাসভা গান্ধীজীর উপর অসহযোগের প্রস্তুতি বিষয়ে কর্ম্ম-সূচী প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। গান্ধীজীর অসহযোগের মূল কথা হইল, সরকারের সমস্ত কিছুকে বর্জ্জন করা। সরকারকে সকল কার্য্যে সাহায্য না করা, বা সহযোগিতা করা হইতে বিরত থাকা। তাঁহার কর্ম্ম-সূচীর মধ্যে এই বিষয়গুলি বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছিল যে, সরকারী চাকরী বর্জ্জন করিতে হইবে, খেতাব ও সম্মান বর্জ্জন করিতে হইবে, সরকারী বিদ্যালয় ইত্যাদি বর্জ্জন করিতে হইবে, অফিস আদালত ও আইন-সভাগুলিকে বর্জ্জন করিতে হইবে, বিদেশীয় পণ্য বর্জ্জন করিতে হইবে।

গঠনমূলক কার্য্যের কর্ম্মসূচীর মধ্যে তিনি চরকা ও স্বদেশী প্রচারকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিলেন, উহার সহিত দেশের শিক্ষার জন্য জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয় এবং জনসাধারণের দ্বারা গঠিত সালিশী আদালত স্থাপনের পরামর্শ দিলেন।

একটু চিন্তা করিলে দেখি, ইহা অপূর্ব্ব ও বিচিত্র সংগ্রাম-কৌশল। ইংরাজ সরকার ভারত-শাসন করিতেন ভারতবাসীদেরই একচেটিয়া সাহায্য ও সহযোগিতা লইয়া। ভারতবাসীগণই শাসনের প্রত্যেকটি সাধারণ ও অসাধারণ স্তরে এবং প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সরকারকে সুষ্ঠু শাসনে সহায়তা করিত। গান্ধীজী সেই সহায়তা ও সহযোগিতা বন্ধ করিয়া ভিতর হইতে শাসনের যন্ত্রকে অচল করিতে চাহিলেন। অস্ত্রের দ্বারা সংগ্রাম না করিয়াও ইংরাজ সরকারকে সহায়হীন ও পঙ্গু করিতে চাহিলেন। গান্ধীজীর উদ্ভাবিত এই সংগ্রাম জাতীয় মহাসভার উদ্দেশ্য ও কার্য্যকে অনেকদূর আগাইয়া লইতে সাহায্য করিল। অধিকাংশ নেতাও এই কর্ম্ম-সূচীতে তুষ্ট হইয়া ইহাকে সমর্থন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ইহার পর ডিসেম্বর মাসে নাগপুর সহরে জাতীয় মহাসভার বাৎসরিক অধিবেশন বসিল। ঐ অধিবেশনে বিপুল উৎসাহে জাতীয় নেতা ও কর্ম্মীর দল গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাবকে সমর্থন ও অনুমোদন করিলেন এবং এই বিষয়ে চরমভাবে সমস্ত কিছু করিবার ভার গান্ধীজীকে অর্পণ করিলেন।

গান্ধীজী এইবার জানাইলেন, অসহযোগের সহিত তিনি সত্যাগ্রহের কাজ করিবেন। তাই এই অসহযোগের কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে সবসময়ে অহিংসার দ্বারা পরিচালিত করিতে হইবে। এই কার্য্যের ভিতর হিংসার কোন স্থান থাকিবে না।

এই প্রস্তাবে দেশের তরুণদলের পক্ষ হইতে প্রথমে কিছু আপত্তি উঠিয়াছিল। পরে অবশ্য গান্ধীজীর এই অহিংস অসহযোগিতার অভিনব বৈপ্লবিক প্রণালী বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা আগ্রহ ও আনন্দের সহিত এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

এইবার গান্ধীজী তাঁহার কর্ম্ম-সূচীকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন। দেশময় প্রচার করিলেন, সকল প্রকার বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করিতে হইবে। দেশবাসী উৎসাহিত হইয়া উঠিল, কর্ম্ম-প্রেরণায় উদ্দীপিত হইয়া উঠিল, চঞ্চল হইয়া উঠিল। লোকে বিলাতী পোষাক ত্যাগ করিল, ইংরাজের অন্ধ অনুকরণ ত্যাগ করিল। বোম্বাই, দিল্লী, আমেদাবাদ, কলিকাতা প্রভৃতি সহরে উৎসাহ ও আড়ম্বরের সহিত বিলাতী পোষাক ও দ্রব্যাদি প্রকাশ্য স্থানে আগুনে পোড়ান হইতে লাগিল। দেশের অনেক ধনী লোক পর্য্যন্ত মূল্যবান বস্ত্রাদি আগুনে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বিলাতী পণ্য ধ্বংসের জন্য সমস্ত দেশে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। দেশবাসী যেন এতদিন পরে জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারের একটা প্রতিকার খুঁজিয়া পাইল।

কিন্তু গান্ধীজীর এই বিলাতী দ্রব্য পোড়ানর কার্য্যে তাঁহার অনেক বিদেশী ভক্ত ও গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব তাঁহার নিকট অনুযোগ করিয়া জানাইলেন—

এই বহ্যুৎসবের দ্বারা আপনি কিন্তু প্রকারান্তরে মনের হিংসারই পরিচয় দিতেছেন, ইহা কি আপনার অহিংস নীতির আদর্শ-সম্ভূত কার্য্য ?

গান্ধীজী তাঁহাদের জানাইলেন, হয়ত ইহাতে মনের কোণে একটা প্রতিহিংসার ভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা অপেক্ষা এই প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষকে তিনি অহিংস রূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কোন জাতির প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্রও বিদ্বেষ নাই এবং সমস্ত বিদেশী মালকেও তিনি ধ্বংস করিতে চান না। যে সমস্ত মাল ভারতের অনিষ্ট করিবে, তিনি কেবল সেইগুলিকেই নষ্ট করিতে চাহিয়াছেন। ইংরাজের পণ্য-উৎপাদনের কারখানাগুলি কোটি কোটি ভারতবাসীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই সকল কলকারখানা ভারতের হাজার হাজার মানুষকে করিয়া তুলিয়াছে অস্পৃশ্য এবং গোলাম।

বৃটিশ শাসকদিগকে ভারতবর্ষ ইতিপূর্ব্বেই ঘৃণা করিতে সুরু করিয়াছিল। কিন্তু গান্ধীজী তাহাদের ঘৃণাকে বাড়াইয়া তুলিতে চান নাই। বরং তিনি জনসাধারণের লক্ষ্যকে ইংরাজের উপর হইতে ইংলণ্ডে উৎপন্ন দ্রব্যের দিকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। ভারত যে ইংলণ্ডের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, তাহারই সঙ্কেত হিসাবে পোড়ান হইতেছিল এই বিদেশী পোষাক ও বিদেশীপণ্য। এই 'সার্জ্জিক্যাল অপারেশনে'র প্রয়োজনও ছিল। এই বিষাক্ত জিনিসগুলি গরীব-দুঃখীকে এতকাল দেওয়া অন্যায় হইত, কারণ গরীব-দুঃখীরও আত্মসম্মান আছে। অতএব বিচার করিলে, বিবেচনা করিলে বোঝা যাইবে যে, এই বিলাতী দাহনের কার্য্যকে আপাতঃ হিংসামূলক মনে হইলেও, ইহাতে হিংসার স্পর্শ মাত্রও নাই। আছে কেবল ভারতের প্রতিরোধ পরায়ণ আত্মার প্রতিরোধ স্পৃহার বাহ্যিক প্রকাশ।

গান্ধীজীর ব্যাখ্যায় বিশ্ববাসী ও ভারতবাসী মুগ্ধ হইল, বিলাতী মাল বর্জ্জনের স্পষ্ট হেতু ও নির্দ্দেশ সকলে খুঁজিয়া পাইল।

কিন্তু কার্য্যকরী ভাবে অসহযোগ আন্দোলনে দেশকে পরিচালিত করিবার

আগে তিনি তাঁহার কর্ম্মসূচীর অন্যান্য বিষয়গুলি দ্বারা দেশকে অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের যোগ্য করিয়া তুলিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন।

তিনি অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, হিন্দু-মুসলমান মিলন এবং খাদি ও চরকা প্রচারে নিযুক্ত হইলেন।

গান্ধীজী অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছিলেন, অস্পৃশ্যতাই হিন্দু জাতির এবং ভারতের পতন ও অপমানের অন্যতম মূল কারণ। ভারতবর্ষের অধিবাসীরা পৃথক পৃথক শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছে, সেই পার্থক্যের মধ্যে ছোট বড়র ভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। বড় ছোটকে ঘৃণা করিতে এবং পরিত্যাগ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, এক শ্রেণী সামাজিক অধিকারের দোহাই দিয়া আর এক শ্রেণীর মানুষকে অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ বলিয়া গণ্য করিয়াছে। এই ঘৃণা অভিমান ও অস্পৃশ্যতা অপরাধের জন্য ভারতবাসী একতা ও সঙ্ঘবদ্ধতা হারাইয়াছে, নিজেদের ভেদনীতির মধ্যে বিদেশী জাতিকে বারবার ভারতের প্রভু করিয়াছে, নিজেদের শ্রেণী-কলহের জন্য নিজেরাই পরাধীনতার শাস্তি বরণ করিয়াছে।

এই অস্পৃশ্যতা ও শ্রেণীবিদ্বেষরূপ পাপকে দূরীভূত করিয়া হিন্দুকে আবার স্বমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ও একতা-বদ্ধ করিবার কার্য্যে তিনি তাঁহার সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমার বিশ্বাস কাহাকেও উচ্চ আসনে তুলিয়া ধরা বা কাহাকেও নিম্নস্তরে ঠেলিয়া ফেলা—ইহা হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। ভগবানের সৃষ্টির সেবার জন্য সবাই জন্মিয়াছে। ব্রাহ্মণ তাহার জ্ঞানের দ্বারা, ক্ষত্রিয় তাহার রক্ষণ-শক্তি দ্বারা, বৈশ্য তাহার বাণিজ্য-নৈপুণ্যের দ্বারা এবং শূদ্র তাহার দৈহিক শ্রমের দ্বারা সকলের সেবা করিবেন। অবশ্য ইহা হইতে এই অর্থ হয় না যে, ব্রাহ্মণকে কোনরূপ শারীরিক শ্রম করিতে বা আত্মরক্ষার কর্ত্তব্য পালন করিতে বা অন্যান্য কার্য্য করিতে হইবে না। জন্মই বিশেষভাবে ব্রাহ্মণকে জ্ঞানজীবী করিয়া তুলিবে। জন্মস্বত্ব ও শিক্ষার দ্বারা তিনি অপরকে জ্ঞানদানের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত হইবেন। অপর পক্ষে

শূদ্র জ্ঞানের অধিকারী হইতে চাহিলে তাহাকে বিরত করিবার কিছুই থাকিবে না। কেবল মাত্র দেহের দ্বারাই সে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ভাবে সবার সেবা করিতে পারিবে। সেবার জন্য উচ্চশ্রেণীর যোগ্য কোন বিশেষ গুণের অধিকারী হইলে, তাহাকে হিংসা করিবার কোন কারণই থাকিবে না। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানের অধিকারী বলিয়া উচ্চতার দাবী করেন, তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী। সেই ব্রাহ্মণ বিন্দু-মাত্রও জ্ঞানের অধিকারী নহে।'

গান্ধীজী এইরূপে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রচার করিতে লাগিলেন। কার্য্য-ভেদে বর্ণভেদ হইয়াছে, কিন্তু বর্ণভেদে শ্রেণী বা জাতিভেদ কোনদিনই ব্যবস্থাপিত হয নাই, ইহা তিনি প্রমাণ করিয়া দিলেন।

উচ্চশ্রেণীর ঘৃণা ও হিংসা দূর করিবার জন্য তিনি নিম্নশ্রেণীর পক্ষ লইলেন, অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজদের সহিত নিজেকে মিশাইযা দিলেন। তিনি অস্পৃশ্য শ্রেণীদের বাসস্থানে নিজের বাসস্থান ও কার্য্যস্থল স্থাপিত করিলেন। তিনি বলিলেন, 'মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই। সকল মানুষের মধ্যেই ভগবানের অস্তিত্ব রহিযাছে। অতএব যে মানুষ শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব্ব লইয়া আর একজন মানুষকে ত্যাগ করে বা ঘৃণা করে, সে ভগবানকেই ঘৃণা করে।' তিনি প্রচার করিলেন, "নিম্নশ্রেণীরা ঈশ্বরের হরিরই অংশ, উহারা 'হরিজন'। হিন্দু-জাতির পক্ষে এই ভুল বুঝিযা হরিজন ভাইদের নিজের ঘরে ডাকিযা আনা কর্ত্তব্য। আমাদেব জাতিভেদবিহীন অখণ্ড হিন্দুধর্ম্ম গঠন করা কর্ত্তব্য। এত অধঃপতনের মধ্যেও এখনো উচ্চ-নীচেব দম্ভ ও ঘৃণা আঁাকড়াইযা থাকিলে সমস্ত জাতিটারই সম্পূর্ণ ধ্বংস ও পতন অনিবার্য্য।"

তাঁহার সাবধান-বাণী দেশকে সজাগ ও চেতনাযুক্ত করিয়া তুলিল। উচ্চশ্রেণীর স্বার্থপর গোঁড়া ও দাম্ভিক সমাজপতিগণ তাঁহার প্রচারে ও প্রচেষ্টায় বিব্রত হইযা উঠিলেন। দেশের নেতাগণ ও জাতীয় মহাসভার কর্ণধারগণ সমাজের অভিশাপ-স্বরূপ শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীবিভেদের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। ভারতের ও জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ

গান্ধীজীর আদর্শকে অভিনন্দন জানাইযা উচ্চশ্রেণীগুলিকে সতর্ক করিয়া কবিতা রচনা করিলেন—

দেখিতে পাওনা তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি' দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে।
সবারে না যদি ডাকো এখনো সরিয়া থাকো
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান,
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।

দিকে দিকে হিন্দু-সমাজের মধ্যে একটা জাগরণ দেখা দিল। কিন্তু ইহাতেও অস্পৃশ্যদরদী মহাত্মা ও মহামানবের হৃদয তৃপ্ত হইল না। তিনি আরো একেবারে সম্পূর্ণ ভাবে কাজে নামিয়া পড়িলেন। তিনি হরিজনদের সহিত একাত্মা হইয়া গেলেন, হরিজনদের সহিত খাওয়া বসা চলা ফেরা কাজ করা—সব কিছুই করিতে লাগিলেন। হরিজন পল্লীকেই নিজের স্থায়ী আবাস করিযা তুলিলেন। তিনি আবার ভারতবাসীকে জানাইলেন—"যদি পুনরায জন্মগ্রহণ করি তবে যেন অস্পৃশ্যদের মধ্যেই জন্মি, তাহাতে আমি তাহাদেব অসুবিধার অংশ গ্রহণ কবিতে পারিব, তাহাদের মুক্তির জন্য খাটিতে পারিব।"

আমরা জানি, তাঁহার এই হরিজন-প্রীতি ও হরিজনসঙ্গ তিনি জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত বজায রাখিযাছিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, তিনি নিজেকে নিঃশেষে হরিজনদের মধ্যে বিলাইযা দিয়াছিলেন। তিনি কার্য্যবশে যখনই যেখানে গিযাছেন, তখনই সর্ব্বাগ্রে সেই স্থানের অস্পৃশ্য অন্ত্যজ পল্লীতে গিযা বাসা বাঁধিযাছেন এবং সেই স্থান হইতে তাঁহার কার্য্যাবলী পরিচালনা করিযাছেন।

আফ্রিকার কর্ম্মক্ষেত্রে অর্থাৎ টলষ্টয আশ্রমে অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন রূপ যে মহত্ত্বের বীজ জন্ম লইযাছিল, সেই বীজ ভারতের অসহযোগের কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া প্রকাণ্ড ও বিশাল মহীরুহে পরিণত হইল। বিভিন্ন পতিত শ্রেণীর মধ্যে একটা আশার আলো জ্বলিয়া উঠিল।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতবাসীর আরো বৃহত্তর ও জটিলতর সমস্যার সমাধান করিতে তৎপর হইয়া উঠিলেন। আমরা বলিতে চাহিতেছি, তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলন সাধনেও উদ্যোগী ও সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন।

তিনি বুঝিয়াছিলেন হিন্দুর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে মিলনের যেরূপ প্রয়োজন, ভারতের হিন্দু আর মুসলমান এই দুইটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে সেইরূপ মিলনের ও ঐক্যের আরো বেশী প্রয়োজন। ভারতের এই সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায় দুইটি যদি ঐক্যবদ্ধ হইয়া ভারতের কল্যাণ ও উন্নতির কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে, তবে সেই উন্নতি যত নিশ্চিত ও দ্রুত ভাবে হইবে, এমন আর কিছুতেই হইবে না। ভারতের হিন্দু আর মুসলমান যদি মিলিত হইযা, এক স্বার্থযুক্ত হইযা স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য চেষ্টা করে, তাহা হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভ করিবে। হিন্দু মুসলমানের মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টাকে বাধা দিতে বা হিন্দু মুসলমানের মিলিত শক্তিকে দাবাইযা রাখিতে শুধু ইংরাজ সরকার কেন, পৃথিবীর কোন শক্তিরই সাধ্য নাই।

এই মিলনের কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্যই তিনি মুসলমান সম্প্রদাযের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করিলেন। খিলাফৎ আন্দোলনকে জাতীয মহাসভার প্রচেষ্টার সহিত যুক্ত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি খিলাফতের পরিচালকগণের আন্তরিক আহ্বানে সাড়া দিলেন, প্রত্যেকটি বিশেষ বিশেষ খিলাফৎ সম্মিলনীতে যোগদান করিলেন এবং ইংরাজের সহিত অসহযোগিতার নীতি খিলাফতের আন্দোলন কার্য্যের অঙ্গীভূত করিলেন।

ইহা ছাড়া তিনি এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও সদ্ভাবের ইচ্ছা জাগরিত করিবার জন্য আরো অনেক প্রীতিকর উপায অবলম্বন করিলেন। তিনি ভারতের হিন্দু আর মুসলমান উভয সম্প্রদাযকে গো-হত্যা নিবারণ

করিবার জন্য পরামর্শ দান করিলেন। মুসলমানকে বুঝাইলেন, গোহত্যা নিবারণ করিয়া তাঁহারা যেন মনে না করেন যে, হিন্দুদিগের সন্তোষের জন্য তাঁহারা এই কাজ করিতে বাধ্য হইতেছেন। পরন্তু তাঁহারা যেন চিন্তা করিয়া দেখেন, ভারতের খাদ্য ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যই অযথা গরুর জীবন-নাশ কার্য্য হইতে তাঁহারা বিরত হইতেছেন। হিন্দুকে বুঝাইলেন, খাইবার জন্য যদিও তাঁহারা গরু হত্যা করেন না, কিন্তু গরুকে অনাদর ও অবজ্ঞা করিয়া তাঁহারা প্রকারান্তরে কোটি কোটি গাভীর প্রাণনাশ করেন আর গাভীর স্বাস্থ্য ও জীবন নষ্ট করিয়া তাঁহারা স্বদেশকে পুষ্টিকর খাদ্য ও সম্পদ হইতে বঞ্চিত করেন। তাঁহারা যেন বিবেচনা করিয়া দেখেন যে দেশের সমষ্টিগত মঙ্গলের জন্যই, দেশের পুষ্টিকর খাদ্যের জন্যই তাঁহারা গরুকে অনাদর ও অযত্ন করার কার্য্য হইতে বিরত হইতেছেন।

তিনি এইভাবে মুসলমানকে গোহত্যা করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাহার জন্য কোন বিনিময়ের সর্ত্ত আরোপ করিলেন না। দেশের মঙ্গলের জন্য মুসলমানগণ স্বেচ্ছায় গোহত্যা বন্ধ করিবেন এবং এই কার্য্যের দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে হিন্দুগণের প্রীতি ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিবেন। হিন্দুগণও দেশসেবা বিষয়ে মুসলমানগণের আন্তরিকতায় বিশ্বাসী হইয়া তাঁহাদের অভাব-অভিযোগে সহানুভূতি জানাইবেন, তাঁহাদের দাবী ও আন্দোলনকে তাঁহাদের নিজেদেরই দাবী ও আন্দোলন বলিয়া ভাবিতে শিখিবেন। হিন্দুরা মুসলমানদের সকল সংগ্রামে ও চেষ্টায় তাঁহাদের সহিত যোগ দিবেন, মুসলমানেরা হিন্দুর সংগ্রামকে নিজেদেরই জাতীয় সংগ্রাম বলিয়া বুঝিতে শিখিবেন—ইহাই ছিল গান্ধীজীর একমাত্র প্রচেষ্টা ও সাধনা।

এই সাধনায় সাফল্য লাভ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়া তিনি বেদ, উপনিষদ ও কোরাণের ধর্ম্ম-নীতির ও উপদেশের ভিতর হইতে উদার বাণী উদ্ধৃত করিয়া সকল ধর্ম্মের যে এক ভাব ও এক আদর্শ তাহা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিলেন। হিন্দু আর মুসলমান উভয়কেই ধর্ম্মের

পার্থক্য ও বিরুদ্ধতা লইয়া বিবাদ করিতে নিষেধ করিলেন। বিদেশী শাসকের কুমন্ত্রণায় আপন পর না চিনিয়া ধর্ম্মদ্বন্দ্বে মাতিয়া দেশকে দুর্দ্দশাপন্ন না করিতে বারবার মিনতি করিলেন।

গান্ধীজীর এই আন্তরিক ও আপ্রাণ চেষ্টার ফল ফলিতে লাগিল। শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্তে ও স্বার্থপূর্ণ প্রচারে দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অসন্তোষের মেঘ ঘনীভূত হইতেছিল, তাহা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইতে লাগিল। দুইটি সম্প্রদায়ই বুঝিতে চেষ্টা করিলেন, ধর্ম্ম তাঁহাদের ব্যক্তিগত আদর্শ। ব্যক্তিগত আদর্শ বজায় রাখিযাও জাতিগত উচ্চতর আদর্শের জন্য দুইটি সম্প্রদায়কেই একসঙ্গে মিলিত হইতে হইবে। এই বোধশক্তির সহিত নিজদলীয় স্বার্থ ও মর্য্যাদার সঙ্কট যখন অগ্রসর হইযা আসিল, তখন দুইটি সম্প্রদাযের মধ্যে মিলনের ইচ্ছাও স্বাভাবিক হইযা আসিল। ধর্ম্মগুরু খলিফাকে ও ধর্ম্মকে অপমান করার জন্য মুসলমানগণ ইংরাজ শাসকের উপর বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। অন্যদিকে দেশের শোষণ, অত্যাচার ও স্বাধীনতার সমস্যা লইযা হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদাযও ইংরাজের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হইযা উঠিযাছিলেন। বিক্ষোভ একই দেশের মধ্যে একই জাতির বিরুদ্ধে হওযাতে, উহা সহজেই একযোগে মিলিত হইবার উপায খুঁজিযা পাইল। তাহার সহিত গান্ধীজীর এক-জাতীয়তা আদর্শের প্রচারের জন্য উহা স্বদেশীয ও স্বজাতীয ভাবে দীক্ষিত হইল। হিন্দু মুসলমানের মিলিত বিক্ষোভ ইংরাজ শাসকের অটল সিংহাসনকে চঞ্চল করিযা তুলিল। গান্ধীজীর চেষ্টা ও সাধনা সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিযা মনে হইল।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও সাম্প্রদায়িক প্রীতি স্থাপনের চেষ্টার সহিত তিনি কিভাবে স্বদেশী-প্রচার ও খাদি-প্রচলনের কার্য্যে অগ্রসর হইলেন, তাহা আমরা এইখানে জানিয়া লইব।

বিলাতী মাল বর্জ্জনের জন্য তিনি জাতীয় মহাসভা ও খিলাফৎ সমিতি মারফৎ দেশবাসীর নিকট আবেদন করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি বিশেষভাবে

জানিতেন এই বিদেশী মালের পরিবর্ত্তে স্বদেশী মাল বা দ্রব্যাদি দিয়া ভারতবাসীর অভাব দূর করিবার সামর্থ্য তখন ভারতের কারিগরদের ও ব্যবসায়ীদের ছিল না। তাই বিলাতী দ্রব্যাদির বিনিময়ে ভারতে স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদন ও প্রসারের উপর তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। এই বিষয়ে তিনি ভারতের উৎপাদিত বস্ত্রের কথা চিন্তা করিলেন। কিন্তু ভারতের বস্ত্র উৎপাদনের সামর্থ্য তখন তুচ্ছ ও নৈরাশ্যজনক ছিল।

গান্ধীজী স্থির করিলেন, কোটি কোটি দরিদ্র ভারতবাসীর জন্য যদি মোটা ভাত-কাপড়ের বন্দোবস্ত করিতে পারা যায়, বিদেশী বণিকের অর্থগৃধ্নুতা হইতে যদি দরিদ্র ভারতবাসীকে রক্ষা করিয়া নিজস্ব সাধারণ বস্ত্র দিয়া উহাদের লজ্জা নিবারণ করা যায়, তাহা হইলে একদিন ভারতবর্ষের সত্যকারের জাগরণের পথ উন্মুক্ত হইবে।

ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি ইংরাজ সরকারেব সহিত বিরোধিতাকে প্রধান স্থান দেন নাই। বরং স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ এবং খাদির প্রসারকেই ভারতের মুক্তির এবং সমৃদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই স্বদেশীয় শিল্পটির পুনরুদ্ধারের কাজে নামিয়া তিনি এত বেশী বাধা ও অসুবিধার সম্মুখীন হইলেন, যাহা তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ অসহযোগিতা বা সত্যাগ্রহ সংগ্রাম অপেক্ষা অনেক বেশী দুষ্কর ও দুরতিক্রম্য বলিয়া মনে হইল। কারণ ভারতীয় বস্ত্রের স্রষ্টা ও গৌরব ভারতীয় তাঁতীকুলকে বিলাতের বণিকদল ধ্বংস করিযাছিল। সস্তা বিলাতী বস্ত্রের দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষ ছাইয়া গিযাছিল। ভারতীয তাঁতীগণ উচ্চমূল্যে সূতা ও তাঁত সংগ্রহ করিয়া ততোধিক উচ্চমূল্যে উহা বিক্রয় করিবার কোন ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। ইহাতে সস্তা অথচ উৎকৃষ্ট বিলাতী পোষাক ও বস্ত্র পাইযা ভারতবাসী উচ্চমূল্যের ভারতীয় তাঁতের বস্ত্রকে ত্যাগ করিল। সস্তার লোভে স্বদেশীকে বর্জ্জন করিয়া বিদেশীকে গ্রহণ করিল। ফলে ভারতের তাঁতী-সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়া গেল।

গান্ধীজী স্বদেশী-বস্ত্র উৎপাদনের জন্য ভারতের এই তাঁত-শিল্পের প্রতি প্রথমে তাঁহার সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত করিলেন। তিনি তাঁত সংগ্রহ করিয়া তাঁহার আশ্রমে উহা স্থাপিত করিলেন। কারণ প্রথমে তিনি নিজে এবং তাঁহার অনুগামীর দল এই শিল্পটির পুনর্জাগরণের পরীক্ষায় আত্মনিযোগ করিতে উদ্যত হইলেন, পরে ইহার ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়া ইহাকে বিস্তার করিতে চেষ্টা করিবেন—ইহাই ব্যবস্থা করিলেন। আশ্রমে তাঁত খাটান হইল, হইল, কিন্তু তাঁতে বুনিবার সূতা কোথায়?······তখন দুই-একটি মাত্র ভারতীয় কাপড়ের কল বোম্বাই প্রদেশে স্থাপিত হইয়াছিল বা হইতেছিল। তিনি ঐ কল হইতে সূতা কিনিয়া তাঁতে বস্ত্র বুনিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু উহাতে তাঁহার মন সন্তুষ্ট হইল না। মিল হইতে সংগৃহীত উচ্চমূল্যের সূতার জন্য বস্ত্রের মূল্যও উচ্চ হইবে গান্ধীজী ইহা বুঝিলেন। ইহা ছাড়া বিশেষভাবে বুঝিলেন যে, ঐ কলের সূতাও অধিকাংশ বিদেশী বণিকেরই দেওয়া ও চালানী মাল। অতএব উহা দ্বারা নির্ম্মিত বস্ত্র ভারতবাসীগণের নিজস্ব বস্ত্ররূপে অভিহিত হইতে পারে না। তিনি স্বদেশী বস্ত্র উৎপাদন করিতে যাইয়া এইরূপে প্রথমেই সূতা সঙ্কটে বাধাপ্রাপ্ত হইলেন।

কিন্তু বাধার দ্বারা হতোদ্যম হইবার মানুষ তিনি ছিলেন না। তিনি ইহার প্রতিকারের পথ খুঁজিতে লাগিলেন এবং দেশীয় সূতার সংগ্রহ ব্যাপারে মন দিলেন। সূতা নির্ম্মাণের যন্ত্রের কথা তাঁহার মনে জাগিল, ·····দেশের প্রাচীনকালের ও মধ্যযুগের চরকার কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি বুঝিলেন, এই চরকাই সূতা উৎপাদনের সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করিতে পারে। এই চরকাই অল্প সময়ে ও অল্প খরচে স্বদেশীয় মোটা বস্ত্রের জন্য যথেষ্ট মোটা সূতা উৎপাদন করিতে পারে। ভারতের বিস্তৃত ও পরিত্যক্ত চরকা আবার তাহার নবরূপ লইয়া গান্ধীজীর চেষ্টায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। ভারতীয় জাতির জনকের প্রচেষ্টায় একটি গৌরবান্বিত ভারতীয় শিল্প আবার তাহার আবির্ভাবের পথ খুঁজিয়া পাইল। চরকার পুনর্জন্ম হইল।

কিন্তু চরকার কথা মনে আসিলেও বিনা আয়াসে গান্ধীজী চরকা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন নাই। চরকা তখন কোথায় পাওয়া যাইবে! ইহাই এক মস্ত সমস্যা হইয়া উঠিল। তাঁতাকুলই যখন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তখন চরকা মিলিবে কোথায়? ·····কিন্তু গান্ধীজী নিরুৎসাহ হইলেন না। নিজে ঘুরিয়া বা লোক পাঠাইয়া চরকার জন্য গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার আশ্রমের সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণও চারিদিকে চরকার জন্য ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে উদ্যম ও পরিশ্রমের ফল ফলিল, গুজরাটের একটি গ্রামের একটি বাড়ীতে বার-তেরটি চরকার সন্ধান মিলিল। আরও জানা গেল, ঐ বাড়ীর মহিলাগণ চরকায় সূতা বুনিতে জানেন। যদি তাঁহারা তুলার পাঁজ পান, তাহা হইলে তাঁহারা চরকা হইতে সূতা বুনিয়া দিবেন। গান্ধীজী যেন স্বর্গের দর্শন পাইলেন। তিনি 'কল' হইতে পাঁজ সংগ্রহ করিয়া দিলেন। রমণীগণও সূতা বয়ন করিয়া দিলেন। গান্ধীজী আশ্রমের সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের সহিত উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত সূতা কাটার পদ্ধতি শিখিয়া লইলেন।

সমস্ত জীবন ধরিয়া তিনি যেমন চরকার প্রসারের জন্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন, নিজেও দেশবাসীকে আদর্শ ও উদাহরণ দিবার জন্য দৈনন্দিন সহস্র দায়িত্বপূর্ণ কাজের মধ্যেও সময় নির্দিষ্ট করিয়া চরকা কাটিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উদাহরণের দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন, প্রত্যেকটি ভারতবাসী যদি সময়মত কিছু কিছু সূতা উৎপাদন করেন, অন্ততঃ যদি নিজের বস্ত্রের জন্য সূতা উৎপাদন করেন, তাহা হইলে ভারতীয়গণের চেষ্টায় ভারতের বস্ত্রাভাবের সমাধান ত হইবেই ভারতে অন্নাভাবেরও সন্তোষজনক সমাধান হইবে।

গান্ধীজী চরকা পাইলেন। চরকা তাঁহার আশ্রমে স্থাপিত হইল। কিন্তু এবার সূতা কাটার উপযোগী তুলার পাঁজের অভাব দেখা দিল। গান্ধীজী স্থির করিলেন, তিনি মিলের পাঁজ কিনিবেন না। কারণ, উহা যদিও ভারতীয় তূলাজাত ছিল, তথাপি উহা দ্বারা তাঁহার আশ্রমবাসী বা দেশবাসী স্বাবলম্বনের

শিক্ষা লাভ করিবে না। তিনি এত বেশী অগ্রসর হইয়া অকস্মাৎ এই নূতন বাধায বিচলিত হইলেন না। অধিকন্তু, অবিচলিত উদ্দেশ্য ও উৎসাহ লইয়া তুলা হইতে পাঁজ সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে শয্যাদ্রব্য নির্ম্মাণকারী ধুনুরিদের কথা তাঁহার মনে জাগিল।

তিনি ধুনুরি সংগ্রহ করিলেন, উচ্চ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাহাকে দিযা তুলা হইতে পাঁজ প্রস্তুত করাইলেন। প্রথমে ধুনুরিগণই আশ্রমের প্রযোজনীয পাঁজ প্রস্তুত করিযা দিতে লাগিল, কিন্তু স্বাবলম্বী আশ্রমবাসীগণ হইাতে সন্তুষ্ট হইবেন কেন?······গান্ধীজীর সঙ্গীগণ উৎসাহের সহিত অল্পদিনের ভিতরেই পাঁজ প্রস্তুত করিতে শিখিলেন। আশ্রমের কর্ম্মীগণ তুলা পিঁজিতে লাগিলেন। এইরূপে গান্ধীজীর প্রচেষ্টায, উদ্যমে ও আন্তরিকতায ভারতের সমৃদ্ধ অথচ বিস্মৃত শিল্প তাঁত, চরকা ও তুলার পুনরাবির্ভাব হইল। ভারতের নিজস্ব সম্পদ খাদির জন্ম হইল, ভারতের দারিদ্র্য দূরীকরণের ও স্বাধীনতা অর্জ্জনের এক অভিনব অস্ত্র আবিষ্কৃত হইল।

আশ্রমের চরকার সূতা হইতে আশ্রমেরই তাঁতে বস্ত্র হইতে লাগিল। প্রথমে বস্ত্র একটু নিকৃষ্ট ধরণের হইল, কিন্তু অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রের আকার ও ধরণ উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল। গান্ধীজী আশ্রমের বোনা খদ্দরের কাপড় অঙ্গে ধারণ করিলেন, আশ্রমবাসীগণ খদ্দর ধারণ করিলেন।

খাদির কৌশল জানিযা লইযা তিনি খাদির ব্যাপক প্রচারে মনোনিবেশ করিলেন। স্থানে স্থানে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করিযা, ভারতের প্রাচীন চরকা ও তাঁত শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ প্রচার করিতে লাগিলেন। চরকাই জাতির দুঃখদুর্দ্দশা বিতাড়নের মূল অস্ত্র—ইহা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তিনি ও তাঁহার সঙ্গী এবং সহকর্ম্মীগণ চরকা কাটিয়া দেশবাসীকে দৃষ্টান্ত দেখাইতে লাগিলেন। তিনি 'ইযং ইণ্ডিয়া' 'নবজীবন' প্রভৃতি সংবাদপত্র মারফৎ চরকা এবং খাদির অতীত ইতিহাস ও বর্ত্তমান কার্য্যকারিতা বিষযে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এই চরকা ও খাদির প্রচারে দেশের নেতাগণের দৃষ্টি ইহার প্রতি পড়িল। ভারতের জাতীয় ও অর্থনৈতিক জীবনে ইহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া জ্ঞানী নেতাগণও ইহার প্রচারে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহারা খদ্দর পরিধান করিলেন, মোটা সুতার শুভ্র খদ্দর তাঁহাদের অন্তরের ও দেহের পবিত্রতা বৃদ্ধি করিল।

জনসাধারণও খদ্দরের প্রয়োজন ও উপকারিতা বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিতে লাগিল। বিদেশীর দেওয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রকে বর্জ্জন করিয়া 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের' জন্য তাহারা আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। লোকে চরকায় সূতা কাটিতে আরম্ভ করিল। বহুস্থানে তাঁত প্রতিষ্ঠিত হইল। দেশবাসী বিদেশী শাসকের অত্যাচারে ও শোষণে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিযাছিল। এই সময়ে অত্যাচারের প্রতিকার-স্বরূপ তাহারা নূতন অস্ত্রের সন্ধান পাইল—চরকা ও খাদির প্রচার। দেশের বিভিন্ন স্থানের 'সত্যাগ্রহ সভার' সত্যগ্রহীগণ চরকা কাটার কেন্দ্র স্থাপন করিলেন। দেশে প্রায কুড়ি লক্ষ চরকা চলিতে লাগিল। চরকার সূতায তৈযারী খাদি বস্ত্র দেশের সত্যাগ্রহী স্বদেশসেবীদের দ্বারা নানা স্থানে বিক্রীত হইতে লাগিল।

অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তিস্বরূপ এইরূপে গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন, সাম্প্রদাযিক-সম্প্রীতি ও খাদির কার্য্যের দ্বারা দেশবাসীকে অহিংস সংগ্রামের যোগ্য করিযা তুলিতে লাগিলেন। দেশবাসীর হাতে অস্ত্র দিয়া এইবার তিনি ইংরাজ সরকারকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায আহ্বান করিলেন। ভারতবাসী অসহযোগ-সংগ্রামে মাতিযা উঠিল। বিলাতী বস্ত্র ও দ্রব্যাদির বর্জ্জন আড়ম্বরের সহিত চলিতে লাগিল। বহু ভারতীয সরকারী কর্ম্মচারী সরকারের চাকরী বর্জ্জন করিলেন, ছাত্রগণ বিদ্যালয় ও কলেজ ত্যাগ করিলেন। এমন কি বহু স্থানে শ্রমিকগণ পর্য্যন্ত মিলে ও কারখানার কাজ করা বন্ধ করিলেন।

১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর ইংলণ্ড হইতে 'প্রিন্স অফ্ ওয়েলস'

(যুবরাজ) ভারতে আসিলেন। জাতীয় মহাসভা ঘোষণা করিলেন, ইংরাজ-শাসনের ও ইংরাজ-রাজের প্রতি ভারতীয়গণের অন্তরের বিক্ষোভ প্রকাশ করিবার জন্য প্রিন্স্ অফ্ ওয়েলস-এর আগমনের দিনে সমগ্র ভারতে হরতাল পালন করিতে হইবে। মহাসভার নির্দ্দেশ ভারতবাসী অক্ষরে অক্ষরে পালন করিল। ১৭ই নভেম্বর ভারতের প্রত্যেকটি সহরের দোকানপাট, হাটবাজার, আফিস-কারখানা, যানবাহন প্রভৃতি সমস্ত কিছু বন্ধ রহিল। মনে হইল বিক্ষুব্ধ ভারতবাসী যেন হরতাল পালনের দ্বারা ইংরাজ-রাজের উপর আপন অন্তরের পরিপূর্ণ ক্ষোভ ও অভিযোগ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিল।

সরকার ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বিলাতী বর্জ্জনে বণিক-সরকারের পণ্য-সম্ভার ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সরকারী ও বেসরকারী কার্য্যে সাধারণের সহযোগিতার অভাবে শাসনে অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলা বাড়িল। তাহার উপর রাজপুত্রের অপমানে সরকারের মর্য্যাদায় বিশেষ আঘাত লাগিল। ক্রুদ্ধ সরকার ব্যাপক-ভাবে ধরপাকড় ও গ্রেপ্তার সুরু করিয়া দিলেন। বড় বড় ও সর্ব্বজনমান্য নেতাগণ কারাগারে নীত হইলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। নেতাদের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে সরকার সাধারণ ভারতবাসীকেও দলে দলে ধরিতে লাগিলেন। সরকারের শূন্য কারাগার সংখ্যাতীত অসহযোগী ভারত-বাসীর দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সরকারের এই দমননীতির জন্য আরো বিপরীত ফল ফলিতে লাগিল। সরকারের অত্যাচারে বিচলিত ও চঞ্চল হইয়া অনেক বড় বড় ভারতীয় কর্ম্মচারী শাসনবিভাগ হইতে পদত্যাগ করিতে লাগিলেন। সরকার শেষে বিব্রত হইয়া উঠিয়া গান্ধীজীর নিকট আপোষ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, সরকার জাতীয় মহাসভার সহিত একটি সম্মিলিত আলোচনার বন্দোবস্ত করিতে চাহিলেন।

গান্ধীজী কিন্তু যথেষ্ট বিনয় অথচ স্পষ্টভাবে জানাইলেন যে, সরকার

আমার লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে অন্যায়ভাবে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের মুক্তি না দেওয়া পর্য্যন্ত আমার অন্তর অন্যায়ের সহিত আপোষ বা আলোচনা করিতে সাড়া দেয় না। আমি অনুরোধ করিতেছি, সত্যই যদি সরকার আপোষ করিতে চান, তবে আগে বন্দীদের বিনাসর্ত্তে মুক্তি প্রদান করুন—নিজের অন্যায় ও ভুল স্বীকার করুন, তাহার পরে আপোষের জন্য অগ্রসর হউন। মিথ্যাকে অন্তরে রাখিয়া কখনও ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

অসহযোগিতার এই আন্দোলনে দেশবাসীর একতাবোধ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা লক্ষ্য করিয়া গান্ধীজী আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি অনুধাবন করিলেন, দেশের জনসাধারণ আন্দোলনের মধ্য দিয়া অহিংস প্রতিরোধের অর্থ ও কার্য্যধারা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়া উঠিয়াছে। হিংসা ত্যাগ করিয়া শান্তি ও সংযমের সহিত ইংরাজের শাসনকে বিকল করিতে শিক্ষা ও প্রেরণা লাভ করিয়াছে। আশান্বিত গান্ধীজী মনে করিলেন, এই অসহযোগের মধ্য হইতেই তিনি সত্যাগ্রহের সৃষ্টি করিবেন, এই বিক্ষোভের ভিতর হইতেই তিনি আইন-অমান্যের কার্য্যধারা গ্রহণ করিবেন।

গান্ধীজী তাই ঘোষণা করিলেন,—সরকারের যদি হৃদয়ের পরিবর্ত্তন না হয়, তাহা হইলে তিনি সংগ্রাম আরো তীব্রতর করিয়া তুলিবেন।

কিন্তু দিনের পর দিন গেল, সরকারের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইল না। বরং অত্যাচার ও দমনের গতি যেন আরো বাড়িয়া গেল। কোথাও কোথাও ধর্ম্মঘট-রত শান্ত শ্রমিকদের উপর পুলিশের গুলি পর্য্যন্ত বর্ষিত হইল, ছাত্রগণ প্রহৃত হইল, কুলকামিনীগণ অপমানিত হইলেন।

গান্ধীজী হতাশ হইয়া অবশেষে সমগ্র ভারতে প্রচার করিলেন—প্রচারের সাত দিন পরে তিনি বোম্বাই-এর বরদোলি তালুকে বরদোলির চাষী ও নিজের সত্যাগ্রহ-ব্রতী সহকর্ম্মীদের লইয়া অহিংস আইন-অমান্য-আন্দোলন আরম্ভ করিবেন। কিন্তু আইন-অমান্যের পূর্ব্বে পৃথিবীর প্রথম

ও শ্রেষ্ঠ সত্যাগ্রহী তাঁহার সত্যাগ্রহের ধর্ম্মপালনে উদ্যত হইলেন। তিনি ভারতের শাসনকর্ত্তাকে পত্র দ্বারা তাঁহার সঙ্কল্পের কথা অকপট ভাবে জানাইয়া দিলেন। তিনি জানাইলেন যে, 'সরকার দুর্নীতি ও অন্যায়ের কালিমায় কলঙ্কিত, তাহার প্রতি আমি আর বিন্দুমাত্র সম্মান বা সহানুভূতিকে প্রশ্রয় দিতে পারি না। এই আইন-অমান্যের দ্বারা আমি সরকারকে জানাইতে ইচ্ছা করি, আজ এই সরকারের সকল ভুল-ত্রুটি সংশোধন করাইবার প্রয়োজন হইয়াছে। আমি আশা করি, সরকার তাঁহার কৃত-অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য তাঁহার আইন-অমান্যের পূর্ব্বেই জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মুক্তি দিবেন ও তাঁহাদের সহিত আপোষ করিয়া সকল অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ করিবেন।'

বিনীত সত্যাগ্রহীর এই স্পষ্ট আবেদনেও ভ্রান্ত ইংরাজ সরকারের পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। গান্ধীজীর আইন-অমান্যের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। সমগ্র জগৎ ভারতের এই অভূতপূর্ব্ব ও অভিনব সংগ্রাম দর্শন করিবার জন্য স্তব্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। শাসকের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে গান্ধীজী তাঁর আফ্রিকার অভিজ্ঞাতাজাত সত্যাগ্রহ অস্ত্র-নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন।

পঁয়তাল্লিশ

চৌরিচৌরা ও আন্দোলন প্রত্যাহার

অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে কোথাও কোথাও ছোট-খাট হিংসার বিকাশ ঘটিল। জনতার মধ্যে কোথাও কোথাও উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসংযম দুই-একবার মাথা চাড়া দিল। বোম্বাইয়ে এক ছোটখাট জনতার সহিত পুলিশের একটি সংঘর্ষের সংবাদ শোনা গেল। এই সংবাদে গান্ধীজী নিরুৎসাহ হইলেন না। কিন্তু দুঃখিত হইলেন। তিনি বোম্বাই সংঘর্ষের জন্য নভেম্বরের প্রথম দিকে সাতদিন প্রয়োপবেশন করিলেন। তাঁহার এই উপবাসের প্রতিক্রিয়া হইতে লাগিল। জনসাধারণ যেন নিজেদের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইল। চারিদিকে আবার একটা সংযম ও শৃঙ্খলা দেখা দিল। তিনি আশ্বস্ত হইলেন, উপবাস ভঙ্গ করিলেন। তাহার পরেই তিনি সরকারকে সত্যাগ্রহের জন্য চরম পত্র দিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ একটা অচিন্ত্যনীয় দুর্ঘটনা তাঁহার আশা ও উদ্যমকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া গভীর নিরাশার সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা নামক একটি গ্রাম হইতে এক চরম হিংসা ও প্রতিহিংসার দুঃসংবাদ সত্যাগ্রহশিবিরে আসিয়া পৌছিল।

একদল অসহযোগী শোভাযাত্রা করিয়া পথ দিয়া যাইতেছিল। পুলিশ-বাহিনী ও পুলিশের একজন দারোগা উহাদের পথ বন্ধ করিয়া উহাদের শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করিতে চেষ্টা করে......শোভযাত্রা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য উহারা লাঠির দ্বারা জনতাকে আঘাত করে। কিন্তু জনতা পুলিশের এই আচরণে সংযম হারাইয়া ফেলে, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে, ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। প্রতিহিংসা লইবার জন্য ঐ পুলিশ-দলকে সমবেতভাবে আক্রমণ করে। বিরাট জনতার ভয়ে একুশজনের দ্বারা গঠিত মুষ্টিমেয় বাহিনী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে, অবশেষে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাহারা পলাইয়া নিকটবর্তী 'থানায়' যাইয়া

আশ্রয় নয়। জনতা আক্রোশের বশবর্ত্তী হইয়া থানা ঘিরিয়া ফেলে। পুলিশদল তখন আতঙ্কে একটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। জনতার মনে খুন চাপিয়া গিয়াছিল। তাহারা বাহির হইতে ঐ ঘরটি তালা বন্ধ করিয়া দেয়। বন্দী পুলিশদলের বাহিরে আসার পথ বন্ধ করে। তাহার পর পৈশাচিক উল্লাসে ঐ ঘরে অগ্নি সংযোগ করে। একুশজন পুলিশ ও একজন দারোগা 'বেড়া আগুনে' জীবন্ত পুড়িয়া মরিল। প্রতিহিংসাপরায়ণ জনতা হিংস্র আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। এই দুঃসংবাদ সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। এই হিংসার কাহিনী গান্ধীজীর কর্ণে প্রবেশ করিল। উত্তমা সত্যাগ্রহীর শক্তি নষ্ট হইয়া গেল, অহিংসার পূজারীর উৎসাহ নিভিয়া গেল ...গান্ধীজী হতাশায় ও বিষাদে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, উচ্ছৃঙ্খল জনতা অহিংসার অর্থ বুঝিল না, আঘাতের পরিবর্ত্তে এত বড় হীন ও জঘন্য প্রতিহিংসার কার্য্য করিয়া বসিল!

গান্ধীজী অনুতপ্ত হৃদয়ে অথচ শান্ত মনে ভাবিতে লাগিলেন। সবিশেষ বিবেচনা ও অনুধাবনের পর বিবেকের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের কল্যাণকর নির্দ্দেশ লাভ করিলেন—তিনি ভারতবাসীকে সুস্পষ্টভাবে জানাইলেন—আইন-অমান্য ও সত্যাগ্রহ করার ব্যবস্থা তখনকার মত তিনি বর্জ্জন করিলেন। যুদ্ধের সেনাপতির মুখ হইতে অসময়ে যুদ্ধ-বিরতির এই সংবাদ শুনিয়া ভারতবাসী বিস্মিত হইল, ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে একটা নিরুৎসাহ ও অসন্তোষের ভাব জাগিয়া উঠিল। নেতাগণ ও কর্ম্মীর দল অনুযোগ করিতে লাগিলেন, আশাহত জনসাধারণ অকস্মাৎ সংগ্রাম বন্ধ করার জন্য গান্ধীজীকে দোষারোপ করিতে লাগিল।

গান্ধীজী সকলের অভিযোগের উত্তর দিলেন—দেশবাসী এখনও অহিংসা ও সংযমকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আমি বরং দেশকে—দেশের আত্মাকে অহিংসা, সংযম ও ভালবাসায় শিক্ষা দিবার কার্য্যে অগ্রসর হইব। যদি আবার দেশকে অহিংসার যোগ্য দেখা যায়, তবে আবার সত্যাগ্রহ পালন করিব।

তাঁহার এই কৈফিয়তেও নেতাগণ ও জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, 'দেশ উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়াছে। অর্দ্ধপথে এই উৎসাহ ও উদ্যম বন্ধ করিয়া দিলে আবার ইহাকে জাগাইতে বহু সাধ্যসাধনা করিতে হইবে। একস্থানের একটি সীমাবদ্ধ হিংসার ঘটনায় সমগ্র দেশের আন্দোলন স্থগিত রাখা অযৌক্তিক হইবে। গান্ধীজী বিচলিত হইলেন না—অনুতপ্ত শান্তস্বরে আবার জানাইলেন, "আমি চাই সমরক্ষেত্রের সকল সৈন্যের মনে অহিংসা বিরাজ করিবে। আমার ধারণা, একটি মানব-মনের হিংসাও আইন-অমান্য সংগ্রামকে কলুষিত ও পথভ্রষ্ট করিতে পারে। চৌরিচৌরার স্থানীয় সীমাবদ্ধ হিংসাও আমার অন্তরকে অনুতপ্ত ও ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। এই অনুতাপ যাহাতে আমার হৃদয়কে একেবারে ভাঙ্গিয়া না ফেলে, তাহার জন্যই আমি এই সংগ্রামকে প্রত্যাহার করিতেছি। একথাও মনে হইতেছে যে, দেশবাসী বোধহয় এখনও পূর্ণ অহিংসার পথে চলিতে অভ্যস্ত হয় নাই।

তিনি আরো জানাইলেন—"সরকারের রক্তচক্ষুকে আমি কিছুমাত্র ভয় করি না, কিন্তু জনতার বিশৃঙ্খলাতে আমি বিশেষ ব্যথিত হই। কারণ আমি জানি অসহযোগের সাফল্য নির্ভর করে পরিপূর্ণ সংযমের উপর। ক্রোধ হইতে আসে বিশৃঙ্খলা। সত্যাগ্রহে বিন্দুমাত্রও হিংসার অস্তিত্ব থাকিলে চলিবে না। অহিংসা-সংগ্রামে প্রতিটি হিংসার অর্থ হইল পিছনে হটিযা আসা, জীবনের অনর্থক অপচয়।"···

এই ভ্রান্তি ও অনুশোচনা-বিষয়ে তিনি ১৯২২ সালের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন—"ভগবান আমাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, ভারতে এখনো সত্য ও অহিংসার আবহাওয়া প্রস্তুত হয় নাই। কেবলমাত্র সত্য এবং অহিংসাই ব্যাপক সত্যাগ্রহকে ন্যায়সঙ্গত করিয়া তুলিতে পারিত। এই আইন-অমান্যকে (disobedience) তখনই Civil বলা যাইতে পারে যখন তাহা হইবে শান্ত, সত্য, বিনীত—জ্ঞাত ও স্বেচ্ছাকৃত অথচ প্রীতিপূর্ণ, ঘৃণাশূন্য ও নিরপরাধ। এই যুক্তির

হিসাবে ভারতীয়গণের আচরণে আমার হিসাবে ভয়ঙ্কর ভুল হইয়াছে, স্বীকার করিলাম। তাই আমি কেবলমাত্র সাধারণের আইন-অমান্য থামাইলাম না, এমন কি নিজের আইন-অমান্যও বন্ধ করিলাম। ··ভগবান আমাকে বোম্বাই-এর ঘটনা দ্বারা সতর্ক করিযাছিলেন, এখন আমি উহা বুঝিতে পারিতেছি। এইজন্য তিনি আমাকে চৌরিচৌরার দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করাইলেন। তাই বরদৌলিতে যে সত্যাগ্রহ হইবার কথা ছিল, আমি তাহা বন্ধ করিলাম। দেশ ইহার দ্বারা পরিণামে লাভবানই হইবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আন্দোলন বন্ধ রাখার ফলে ভারতবর্ষ সত্য ও অহিংসার প্রতীক হইতে চেষ্টা করিবে।" গান্ধীজী বিশেষ বিবেচনা ও বিচার করিয়া সংগ্রাম বন্ধ করিলেন।

একদল দেশবাসী তাঁহাকে অস্থির-মতি বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল। বোঝা গেল, দেশের একদল গান্ধীবাদের বিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করিতে চাহিতেছে।

সরকার এতদিন চুপ করিযা ছিলেন। গান্ধীজীর বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া দেখিযা সরকার বুঝিলেন ভ্রান্ত ভারতবাসীর অপচেষ্টায গান্ধীজীর জনপ্রিয়তা বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। জনসাধারণের এই বিরূপ মনোভাবের সুযোগ সরকার গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা এইবার সাহস করিযা সত্যাগ্রহ ও অসহযোগের স্রষ্টাকে গ্রেপ্তার করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

গান্ধীজী চৌরিচৌরার হিংসার প্রায়শ্চিত্ত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি দেশবাসীকে আবার জানাইলেন—'আমাকে শুদ্ধিলাভ করিতে হইবে। আমার সত্যের মধ্যে যেন গভীরতর সত্য ও দীনতা থাকে। হিংসার শুদ্ধির জন্য আমার পক্ষে অনশনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। আমার যুক্তি ও সত্যকে অবলম্বন করিয়া যাহারা অসত্যকে ও হিংসাকে প্রকাশ করিয়াছে, তাহাদেরই অপরাধ স্খালনের জন্য আমি অনশনের সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহাদের পাপের শাস্তি আমিই গ্রহণ করিতে মনস্থ করিযাছি। ভবিষ্যতের আন্দোলন যাহাতে হিংস বা হিংসার অগ্রদূত হইযা উঠিতে না পারে, সেজন্য আমি সকল প্রকার দীনতা, সকল উৎপীড়ন, পূর্ণ নির্ব্বাসন এবং মৃত্যুও বরণ করিতে

রাজী আছি।' অনুতপ্ত-হৃদয়ে তিনি 'পাঁচদিন খাদ্যগ্রহণ না করিয়া, আপনার উপবাসের কৃচ্ছ্রসাধনের ভিতর দিয়া উন্মত্ত দেশবাসীকে পথ দেখাইলেন।

এই স্বেচ্ছাকৃত উপবাস গান্ধীজীর জীবনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। উপবাসের দ্বারা আত্মশুদ্ধির প্রণালী সত্যসন্ধানী মহাত্মার এক অভিনব আচরণ!

ইতিমধ্যে সরকারও প্রস্তুত হইলেন। সসস্ত্র পুলিশবাহিনী দর্পিত পদবিক্ষেপে সবরমতী আশ্রমের হিংসাশূন্য শান্ত নীরবতা ভঙ্গ করিল। তাহারা আশ্রমে আসিয়া অহিংসার মূর্তিমান বিগ্রহকে গ্রেপ্তার করিল, বলিল—'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় ইংরাজশাসনের উপর দোষারোপ করিয়া আপত্তিকর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য তিনি গ্রেপ্তার হইলেন।

কৃশ মানুষটি হাস্যোজ্জ্বল মুখে পুলিশদলের সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আশ্রমবাসীগণ বিদায়কালে তাঁহার সামনে আসিলেন, তাঁহার বিদায়বাণী কামনা করিলেন। তিনি বলিলেন—আমার বাণী হইল আমার জীবনের আদর্শ। আমার গ্রেপ্তারে আপনারা ক্রুদ্ধ হইবেন না, আমার প্রিয় দেশবাসীগণ ক্রুদ্ধ ও আত্মহারা হইবেন না। আপনারা পরিপূর্ণ আত্মসংযম পালন করিবেন এবং 'ক্রোধের বদলে আমার গ্রেপ্তারের দিনকে * উৎসব-আনন্দের দিন বলিয়া গণ্য করিবেন। অসহযোগ আন্দোলনের মূলে রহিয়াছি আমি। তাই সরকার আমাকে সাধারণের নিকট হইতে সরাইয়া সাধারণ ভারতবাসীগণের শক্তির পরিমাণটুকু বুঝিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমার অনুরোধ এই হিংসার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে সাধারণ ভারতবাসী অহিংসা দ্বারা গ্রহণ করুন, অবিচলভাবে পূর্ণ শান্তি রক্ষা করুন। জনসাধারণ আমার গ্রেপ্তারে বিক্ষোভ প্রকাশ না করিয়া, শান্ত ধৈর্য্যের সহিত গঠনমূলক কর্ম্মসূচী পালন করিতে

* বস্তুতঃ এই উপদেশ তিনি গ্রেপ্তার হইবার কয়েকদিন পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছিলেন।

থাকুন। কিন্তু কোন প্রকার বিক্ষোভ বা হরতাল অথবা সরকারের সহিত সহযোগিতা না হয়। আমার অভাবেও কাজ পূর্ণভাবে চলিবে। পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত পালন করিতে হইবে অসহযোগের কর্ম্মসূচী। জনসাধারণ যদি আমার যুক্তি গ্রহণ করেন, তবেই তাঁহারা জয়লাভ করিবেন। অন্যথায় তাঁহাদিগকে মহা বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে।' পুলিশ গান্ধীজীকে লইয়া গেল। কিন্তু গান্ধীজীর বাণী দেশের বাহিরে রহিয়া গেল। সরকার বিশ্ববাসীকে দেখাইবার জন্য সাড়ম্বরে বিচার-প্রহসনের ব্যবস্থা করিলেন।

১৮ই মার্চ্চ তাঁহার বিচার হইল। সরকারের পক্ষ হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইল—তিনি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় এমন তিনটি আপত্তিকর প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা দ্বারা জনসাধারণকে ইংরাজ-শাসন উচ্ছেদের বিষয়ে উত্তেজিত করা হইয়াছে। তাঁহারা প্রবন্ধ তিনটির দু'একটি স্থান বিশেষ অপরাধজনক বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। একটির মধ্যে গান্ধীজী লিখিয়াছিলেন, "এমনও মনে হইতেছে যে, গভর্ণমেণ্ট যেন হত্যা, অগ্নিকাণ্ড, অত্যাচার নিবারণের একমাত্র অধিকারী। এই অধিকার প্রমাণ করিবার জন্যই তাঁহারা যেন সমগ্র দেশকে হত্যা, অগ্নিকাণ্ড ও অত্যাচারে ডুবাইয়া ফেলিতে চাহিতেছেন।" ..... আর একটি প্রবন্ধে তিনি ইংরাজ কর্তৃপক্ষের উদ্ধত হুমকীর বিরুদ্ধে লিখিয়াছিলেন,—"বৃটিশসিংহ যদি আমাদের মুখের উপর তাহার রক্তাক্ত থাবা নাড়িতে থাকে, তবে তাহার সহিত আমাদের আপোষ-মীমাংসা কেমন করিয়া সম্ভব? বৃটিশ সাম্রাজ্য শারীরিক দুর্ব্বলতরদের শোষণ করিতেছে এবং পশুশক্তি প্রকাশ করিয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বিশ্বের শাসনকর্ত্তা ন্যায়বান বিধাতা বলিয়া যদি কেহ থাকেন, তবে তাহা কখনো টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। ১৯২০ সালে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, সে যুদ্ধ একমাস হউক, কিম্বা এক বৎসর হউক, কিম্বা বহু বৎসর হউক, শেষ পর্য্যন্ত চলিবে। এখন বৃটিশ জনসাধারণের তাহা উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে। আমি আশা করি এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে,

শেষ পর্য্যন্ত অহিংস থাকিবার মত প্রচুর দীনতা ও পর্য্যাপ্ত শক্তি যেন ভারতের থাকে।"*

আর এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছিলেন,—"আমরা চাই স্বরাজ, চাই সরকার জনসাধারণের নিকট মাথা নত করুক।"

গান্ধীজী রাজদ্রোহের অভিযোগ প্রশান্ত মনে স্বীকার করিয়া লইলেন। তিনি জানাইলেন, তিনি স্পষ্ট বিবেক ও পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া সরকারের বিরুদ্ধে দেশকে অহিংস সংগ্রামে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছেন, এবং সরকারের অত্যাচার ও শোষণের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার এই সংগ্রামের শেষও হইতে পারে না।......'আমি আমার কর্ত্তব্য করিয়াছি। তাই আমি কোন লঘু শাস্তি (ইংরাজের বিচারে) নহে, কঠিনতম শাস্তি গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইয়াছি। আমি করুণা চাহি না, বরং কঠিনতম শাস্তি সানন্দে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।"

গান্ধীজী রাজদ্রোহের অপরাধে ছয় বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

বিচারের অভিনয় শেষ হইল।

সত্য ও প্রেমের আদর্শ পূজারীকে তাঁহার সঙ্গী, কর্ম্মী ও অনুরক্ত জনসাধারণ চোখের জলে বিদায় দিলেন। সত্যাগ্রহী মাহাত্মা স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া দেশবাসীর নিকট হইতে বিদায় লইলেন। স্থির ও ধীর পদবিক্ষেপে কারাগারের 'অপরাধী-গাড়ীতে' (Prisoners' Van) উঠিয়া বসিলেন।......

কারাগারের লৌহদ্বারের ঝনৎকার হিংসার গর্জ্জন করিয়া বন্ধ হইয়া গেল......।

---

*এই প্রবন্ধ তিনটি ১৯২১ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯ সেপ্টেম্বর ও ১৫ই ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়।

ছেচল্লিশ

কারাগার ও ধ্যানমগ্ন মনীষী

গান্ধীজীকে প্রথমে সবরমতী জেলে পাঠান হইল। তাঁহাকে বাসের জন্য দেওয়া হইল পৃথক ঘর, সে ঘরের সহিত অন্য কোন বন্দীর সংস্পর্শ ছিল না. সে ঘরে অন্য কোন বন্দীর যাতায়াতের অধিকার ছিল না।

গান্ধীজী ইহা দেখিয়া বাঁকিয়া বসিলেন, জানাইলেন—মানুষের নিকট হইতে পৃথক হইয়া তিনি এখানে বাস করিতে পারিবেন না, আর বাস করিতে চাহেনও না। কারণ কারাগারের লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ প্রত্যেকটি বন্দীর মতই তাঁহারও যখন একই অবস্থা, তখন তিনি পৃথক ভাবে কারাবাস করিবেন কেন? তিনি সবাইযের সহিত, সাধারণ কয়েদীদের সহিত অতি সাধারণভাবে থাকিতে চান।

তাঁহার জেদই জয়লাভ করিল, তিনি সাধারণ বন্দীগণের মধ্যে ঘর পাইলেন।

ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক নরক······নরকের কষ্টে পাপী জীবগণ আর্ত্তনাদ করিতেছে···

নরকপুরীতে স্বেচ্ছায় আসিলেন দেবর্ষি নারদ ···

পাপীদের কাছে আসিলেন ·····তাহাদের ভালবাসিলেন ···

বীণার মধুর সুরে তাহাদের কণ্ঠে ঢালিলেন হরিনামের মধুর সঙ্গীত······

পাপীরা তাঁহার পবিত্র স্পর্শে··হরিনামের মাহাত্ম্যে পবিত্র হইল······

তাহারা নরকের মধ্যে বাস করিয়াও নরক হইতে উদ্ধার পাইবার শক্তি পাইল······

ইংরাজ সরকারের নরকতুল্য যন্ত্রণাদায়ক কারাগার ·····কারাগারের লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ বন্দীগণ আর্ত্তনাদ করিতেছে······

কারাগারে বন্দীদের মধ্যে স্বেচ্ছায় আসিলেন মহাত্মা গান্ধী······

সাধারণ কয়েদীগণের সংস্পর্শে আসিলেন···তাহাদের ভালবাসিলেন······

ব্যবহার, আচরণ ও যুক্তির দ্বারা তাহাদের শুনাইলেন সংযম ও দুঃখবরণের অপূর্ব্ব বাণী······

পবিত্র আচরণে···পবিত্র বাণীতে তাহারা শুদ্ধ হইতে চাহিল······দুঃখ সহ্য করিবার শক্তির মন্ত্র পাইল·· ···কারাগারে বাস করিয়াও কারাযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইবার শক্তি পাইল।

গান্ধীজীর এই আচরণে কারা-কর্ত্তৃপক্ষ শঙ্কিত হইলেন। ভাবিলেন—"এ ত বড় সহজ মানুষ নয়! কারাগারের দুর্দ্দান্ত ও পশুতুল্য বন্দীসকলকেও মানুষ করিতে চাহে দেখিতেছি!"··· ··ভীত কর্ত্তৃপক্ষ আবার তাঁহাকে পৃথক করিলেন। জানাইলেন, তিনি অন্যান্য সাধারণ কয়েদীকেও তাঁহার রাজদ্রোহের মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছেন। অতএব তাঁহাকে একলা বাস করিতে হইবে।

গান্ধীজীকে · হাস্যময় রহস্য-চঞ্চল এই শীর্ণ শান্ত মানুষটিকে তাঁহারা পৃথক ঘরে পাঠাইয়াও শান্তি পাইলেন না। তাঁহারা তাঁহাকে অন্য কারাগারে প্রেরণ করিলেন।

বাইরের মানুষের জানার গণ্ডির বাহিরে অজ্ঞাত কোন এক লৌহকারার অন্তরালে ভারতের অহিংস-মন্ত্রের ঋষি তাঁহার অজ্ঞাত জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

এই অজ্ঞাতবাসকালেই মহাত্মা গান্ধী তাঁহার 'আত্মজীবনী' রচনা করেন··· ধ্যানমগ্ন তপস্বী নিজের জীবনের ঘটনার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ সত্যের যে পবিত্র আলোক দর্শন করেন, সেই সত্যদর্শনের ইতিহাস নিজের জীবন-কাহিনীতে সন্নিবেশিত করেন।

কিন্তু অত্যাচারী দানব চিরদিনই দেবতাকে ভয় করে···তাই দেবতাকে পীড়ন করিতে চেষ্টা করে। অত্যাচারী শাসক চিরদিনই গান্ধীজীকে··· নির্ব্বিরোধী, শান্ত ও সৌম্য মানুষটিকে ভয় করিত···তাই তাঁহাকে পীড়ন করিতে চেষ্টা করিত। তাঁহাকে অজ্ঞাত স্থানে পাঠাইয়াও তাহারা নিশ্চিন্ত

হইল না, তাঁহাকে পীড়ন করিতে লাগিল, তাঁহাকে সাধারণ দস্যুতস্করের যোগ্য স্থলে রাখিতে লাগিল, তাঁহাকে নিকৃষ্ট ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে বাস করিতে বাধ্য করিল।

গান্ধীজী এই শাস্তি প্রশান্ত মনে বরণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার দেহ ইহা সহ্য করিতে পারিল না। ১৯১৭ সালে 'আমাশয় ব্যাধি' হইবার পর হইতেই তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। অনবরত পরিশ্রমের জন্য এই দুর্ব্বলতা বিশেষভাবে বিদূরিতও হয় নাই। তাহার উপর আবার কারাবাসের এই কষ্ট ও অত্যাচার দেহকে আরো দুর্ব্বল করিয়া ফেলিল। দুর্ব্বল শরীরকে সহজেই রোগ আক্রমণ করিল। গান্ধীজী কষ্টকর ও বিপজ্জনক 'অ্যাপেণ্ডি-সাইটিস্' রোগে কষ্ট পাইতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম সরকার তাঁহার প্রতি কোন যত্নই করিলেন না, কিন্তু রোগ যখন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তখন সরকার শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, এই ব্যাপার গোপন রাখিলে বা গান্ধীজীর অবস্থা খারাপ হইলে দেশবাসী, ভারতের জনসাধারণ উন্মত্ত হইয়া উঠিবে। তাই শঙ্কিত সরকার জনমতের ভয়ে গান্ধীজীর ব্যাধির কথা প্রকাশ করিলেন, অত্যাচার করিবার পর আড়ম্বরের সহিত তাঁহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের দ্বারা তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচার করিলেন। গান্ধীজী ব্যাধিমুক্ত হইলেন।

দেশবাসী কিন্তু অধীর হইয়া উঠিল· তাহারা গান্ধীজীকে অবিলম্বে ও বিনাসর্ত্তে মুক্তি দিবার জন্য ভারতবর্ষের আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিল। ভারতের সংবাদপত্রগুলি গান্ধীজীর আটকের বিরুদ্ধে তীব্র জনমত প্রকাশ ও প্রচার করিতে লাগিল।

সরকার জনমতের দাবী স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

গান্ধীজী ১৯২৪-এর ৫ই ফেব্রুয়ার বিনাসর্ত্তে মুক্তিলাভ করিলেন।

নেতাগণ গান্ধীজীকে কিছুকাল বিশ্রাম লইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। গান্ধীজীও বুঝিলেন বিশ্রাম লাভ করিয়া সুস্থ না হইলে, হৃতশক্তি

পুনরুদ্ধার করিতে না পারিলে, তিনি দেশবাসীর কোন কাজই করিতে পারিবেন না। গান্ধীজী তাই স্বাস্থ্যলাভের জন্য বোম্বাই প্রদেশের 'জুহু' নামক স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন করিলেন।

'জুহু' ভারতের তীর্থস্থান হইয়া উঠিল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, আলী ভ্রাতৃদ্বয়, আব্বাস তায়েবজী প্রভৃতি ভারতের দিকপালগণ ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নির্ণয় করিবার জন্য গান্ধীজীর নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেসী নেতাগণ যখন কারাগারে ছিলেন, সেই সময়ে দেশে সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দিয়াছিল। একদল হিংসাপন্থী বিপ্লবী সশস্ত্র বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের সাহায্যে ইংরাজগণকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিযাছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হইয়াছিল, তাঁহাদের অনেক কর্ম্মী ও নেতা ধরা পড়িলেন।

এইসব হিংসাপন্থী নেতাদেব কার্য্যের জন্য গান্ধীজী দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তিনি উদাত্তকণ্ঠে ইঁহাদের দেশপ্রেমের আন্তরিকতার সুখ্যাতি করিলেন। তিনি কোন কোন্ নেতার উপর সরকারের অত্যাচারের ও পাশব ব্যবহারের প্রতিবাদও করিলেন।

সরকারও এই হিংসার অনুষ্ঠানকারীদিগের সহিত জাতীয় মহাসভার অহিংসাপন্থী নেতাদেরও জড়াইতে চেষ্টা করিল। তাহারা 'মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা', 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা' প্রভৃতি কতকগুলি মামলার সৃষ্টি করিয়া বহু বিশিষ্ট নেতাকে বিপ্লবীকর্ম্মিগণের সহিত গ্রেপ্তার করিল। গান্ধীজীর পরামর্শে জাতীয় মহাসভা অর্থসংগ্রহ করিযা এই মামলায অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। মহাসভার আদর্শে সমগ্র দেশে বিপুল উৎসাহ জাগিল, ভারতবাসীগণ অকাতরে অর্থ ঢালিয়া অভিযুক্ত দেশপ্রেমিকগণকে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

গান্ধীজীর অনুপস্থিতেতে দেশের ভিতর আরও একটি প্রতিক্রিয়ার কার্য্য

চলিয়াছিল। আইন-অমান্ত ও অসহযোগের জন্ম দেশ যখন নেতাশূন্ম হইয়া পড়িল, তখন একদল স্থবিধাবাদী দেশদ্রোহী সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্ম বিশিষ্ট সরকারী পদসমূহ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন কি অনেক নরম-পন্থীও সরকারী কার্য্যে সহায়তা করিয়া সরকারের শাসনব্যবস্থাকে দৃঢ় ও কঠোর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী ও নেতাগণের মুক্তি-লাভের পর হইতে এইসব প্রতিক্রিযাশীলদের বিশ্বাসঘাতকতা সমূলে ধ্বংস হইয়া গেল, জনসাধারণ ইঁহাদের স্বরূপ জানিতে পারিয়া ইঁহাদের বর্জ্জন করিল। গান্ধীজীও মহাসভার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আবার নূতন কর্ম্মপ্রেরণায় মাতিয়া উঠিলেন।

গান্ধীজীর আদর্শের বিপরীত আর একটি ধ্বংসকারী প্রতিক্রিয়াও তাঁহার অনুপস্থিতিকালে সাম্রাজ্যবাদী সরকার সমগ্র দেশের মধ্যে ছড়াইযা দিযাছিলেন। আমরা হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও দাঙ্গার বিষযে এখানে উল্লেখ করিতেছি। সরকার অসহযোগ আন্দোলনের ধারা হইতে স্পষ্ট বুঝিযাছিলেন, ভারতের হিন্দু-মুসলমান একতাবদ্ধ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে তাঁহাদের সাম্রাজ্যের সমূহ বিপদ। তাই তাঁহারা খিলাফৎ ও জাতীয় মহাসভার মিলিত কার্য্যধারায়, মহাত্মা গান্ধীর মিলনের ও প্রেমের বাণী প্রচারের কার্য্যকলাপে বিশেষ শঙ্কিত হইয়া পড়িযাছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, ভারতের হিন্দু আর মুসলমান এই দুই গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি ভেদ ও কলহ সৃষ্টি করিতে পারা যায়, যদি হিন্দু আর মুসলমান পরস্পর দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে মাতিয়া উঠে, তাহা হইলে ভারতের একতাবদ্ধ বিশাল জনসঙ্ঘের একতা ও মিলনের গ্রন্থি ছিন্ন হইবে। একটি সম্মিলিত স্বাধীনতাকামী জাতি সাম্প্রদাযিক দ্বন্দ্বে উন্মাদ হইযা উঠিলে, উহারা স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া এক আত্মঘাতী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে। তাহা হইলে আবার ইংরাজ শাসন বিপন্মুক্ত হইবে, আর ভারতের স্বাধীনতালাভের আশাও সুদূর-পরাহত হইবে। চতুর সরকার তাই নেতাহারা জনসাধারণের মধ্যে ঈর্ষা ও দ্বন্দ্বের বীজ বপন করিলেন, প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বার্থপর

সাম্প্রদায়িক নেতা ও প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিলেন। হিন্দুকে মুসলমানের বিরুদ্ধে উস্‌কাইয়া তুলিলেন। মুসলমানকে হিন্দুর বিরুদ্ধে উস্‌কাইতে লাগিলেন। হিন্দুকে বুঝাইলেন মুসলমানগণ দেশের কোনই কাজ করে না, শুধু ফললাভ হইলে সুবিধাটুকু এবং আরামটুকু ভোগ করিতে চায়। আর মুসলমানকে বুঝাইলেন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে তোমাদের কষ্ট ও বিপদ উপস্থিত হইবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুসম্প্রদায় দেশের সমস্ত শক্তি অধিকার ও দখল করিয়া তোমাদের গোলাম করিয়া রাখিবে।

অর্থ দিয়া, সম্মান দিয়া, বিশিষ্ট পদ দিয়া, স্বার্থান্বেষী সরকার সাম্প্রদায়িক নেতা তৈয়ারী করিলেন। এইসব নেতা নিজ সম্প্রদায়ের মংগলাকাঙ্ক্ষী ও ত্রাণকর্ত্তা সাজিয়া বসিলেন, নিজ সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নানাভাবে সন্দেহপ্রবণ ও উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। এই সময়ে 'মুসলিম লীগ' নামক মুসলমানগণের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান জাতীয় মহাসভার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিল। নিজেদের পৃথক সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করিল, এবং শুধু নিজ সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও সুবিধার জন্য পৃথকভাবে কার্য্য করিতে লাগিল। দেশের স্বাধীনতার জন্য ১৯১৭ ও ১৯১৮ সালে যে হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে সরকারের গুলিতে জালিয়ানওয়ালাবাগে রক্তদান করিয়াছিল, ১৯২১ ও ১৯২২ সালের অসহযোগের সময়েও যে হিন্দু ও মুসলমান সম্মিলিতভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, ১৯২৪ ও ১৯২৫ সালে সেই হিন্দু-মুসলমানই আবার ভ্রান্তিবশে, ঈর্ষাবশে পৃথক হইয়া গেল, এক ও অখণ্ডজাতির দুইটি শাখা বিদেশী শাসকের চক্রান্তে পরস্পর দূরে সরিয়া গেল, ভাই ভাইয়ের রক্তপাত করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিল।

কাল-বৈশাখী ঝড়ের আভাস ঈশানকোণে দেখা দিল……চারিদিকে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের তাণ্ডব জাগিতে লাগিল। বোম্বাই নগরে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাধিল, কলিকাতা নগরে দাঙ্গা বাধিল, কোহাটে দাঙ্গা বাধিল। চারিদিকে যেন আত্মঘাতী পিশাচ ও দৈত্যের দল মাথা খাড়া

করিযা দাঁড়াইল, চারিদিকে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের দামামা বাজিযা উঠিল। মুসলমান হিন্দুকে হত্যা করিল। হিন্দুও মুসলমানকে হত্যা করিল। আজ যে মুসলমান হিন্দুর সহিত ব্যবসা করে, কাল সে তাহাকে ছুরিকাঘাত করিল। আজ যে হিন্দু মুসলমানকে আত্মীয়জ্ঞানে শ্রদ্ধা করে কাল সেই মুসলমানকে সে হত্যা করিল। দেশের আকাশ-বাতাস সাম্প্রদাযিক সংঘর্ষে ও দ্বন্দ্বে বিষাক্ত ও কলুষিত হইযা উঠিল।

কারাগারের বাহিরে আসিযা এই পরিবর্ত্তন দেখিযা গান্ধীজীর অন্তর কাঁদিয়া উঠিল। যে মুসলমান-সম্প্রদায একদিন জাতীয মহাসভার অসহযোগের প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত শুনিযাও নিরুৎসাহ না হইযা অসহযোগের আন্দোলনকে দ্বিগুণ তীব্র করিযা তুলিযাছিলেন, যে হিন্দু-সম্প্রদায় একদিন 'বামরহিম না জুদা করো' মন্ত্রে দীক্ষিত হইযা মুসলমান ভাইকে পাশে লইযা দেশের মুক্তি-সংগ্রামে অগ্রসর হইযাছিলেন, যে হিন্দু-মুসলমান এতকাল ধর্ম্মকে মন্দিরের আর মসজিদের মধ্যে রাখিযা, বাহিরে এক-জাতীয়তাবোধ লইযা দেশের দুর্দ্দশা-মোচনে সমবেতভাবে অগ্রসর হইয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের মধ্যে এক অনৈক্যের মনোবৃত্তি যেন বিস্তারলাভ করিল।

এই সর্ব্বনাশা আত্মকলহ হইতে হিন্দু-মুসলমানকে নিবৃত্ত করিবার কি কোন প্রণালী নাই, ভ্রান্তি দূর করিযা চেতনা জাগাইবার কি কোন পন্থা নাই, সাম্প্রদাযিক কলহে নিজেদেরই লাঞ্ছনা ও দুর্দ্দশা আরও বাড়িবে, ইহা বুঝাইবার কি কোন উপায নাই?

দরদী মহামানবের অন্তরে উপায জাগিল। বড় করুণ অথচ চরম উপায। তিনি ঘোষণা করিলেন, যদি ভারতবর্ষের হিন্দু আর মুসলমান দ্বন্দ্ব বন্ধ না করেন, যদি হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদাযিক দাঙ্গা ও হত্যা ইত্যাদি চলে, তবে তিনি প্রাযোপবেশনে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিবেন। দেশের কলহ ও বিসংবাদ দেখার চেয়ে তিনি মৃত্যুকে অধিকতর বরণীয় মনে করিবেন। হিন্দু আর মুসলমানের পাপের জন্য তিনি তাঁহার মৃত্যুহীন প্রাণকে আরও কতবারই না

উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হন! কতবার নৈরাশ্যের আর ব্যথার ভার বুকে লইয়া আত্মদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন!......অন্ধ আমরা, স্বার্থপর আমরা, ঈর্ষাপরায়ণ আমরা, তাঁহার সেই পবিত্র ত্যাগের মাহাত্ম্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

গান্ধীজী অবিচল সঙ্কল্প লইয়া দিল্লীতে আসিলেন। দিল্লীতে মৌলানা মহম্মদ আলীর ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। নিজের সঙ্কল্পে অটল থাকিয়া ২২শে সেপ্টেম্বর (১৯২৪) হইতে অনশন সুরু করিলেন।

ভারতের দূরতম প্রান্ত হইতে নেতাগণ মহম্মদ আলীর ভবনে ছুটিয়া আসিলেন। মুসলমানদের মধ্যে যাহারা আত্মকলহের ভয়াবহ পরিণাম কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা গান্ধীজীর পাশে আসিয়া সমবেত হইলেন। হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা দ্বন্দ্বের ধ্বংসকর চিত্র অনুধাবন করিযাছিলেন তাঁহারা মহামানবের নিকটে আসিযা দাঁড়াইলেন। সকলে কাতরভাবে তাঁহাকে উপবাস ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন, তাঁহাকে খাদ্য গ্রহণ করিতে মিনতি করিলেন। কিন্তু সঙ্কল্প-কঠোর মহাত্মা জানাইলেন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসান না হইলে, এই ভেদের প্রতিকার না হইলে তিনি আর জীবন ধারণ করিবেন না।"

নেতাগণ বলিলেন, "এই দ্বন্দ্ব ও ভেদ নিবারণের উপায় আমাদের বলিয়া দিন, ইহার প্রতিকারের পন্থা আমাদের দেখাইয়া দিন, আমরা আনন্দিত মনে অটুট ধৈর্য্যে সাম্প্রদায়িক মিলন ও সদ্ভাব স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিব, আমরা সকল সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করিব।

গান্ধীজী জানাইলেন—আপনারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আবার পূর্ব্বেকার সম্প্রীতি ও সদ্ভাব ফিরাইযা আনুন, হিন্দু আর মুসলমানের মন্দির ও মসজিদের ধর্ম্মার্চ্চনার সমস্যার সমাধান করুন। হিন্দু-মুসলমানকে আবার একতাবদ্ধ করিবার কার্য্যে অগ্রসর হউন। তবেই আমি আবার বাঁচিতে ইচ্ছা করিব, উপবাসে প্রাণত্যাগের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিব।

ভারতের অনেক স্বনামখ্যাত হিন্দু আর মুসলমান নেতা গান্ধীজীর ইচ্ছামত পন্থা নির্দ্ধারণের জন্য দিল্লীতে ২৬শে সেপ্টেম্বর হইতে ২রা অক্টোবর পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী এক-বিরাট ঐক্য-সম্মেলন আহ্বান করিলেন। সম্মেলনে উভয় সম্প্রদায়ের সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন নেতাগণ ধর্ম্মদ্বন্দ্ব বিষয়ে একটি আপোষের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল, হিন্দুগণ মুসলমানের নমাজের সময় মসজিদের পার্শ্ব দিয়া বাজনা বাজাইয়া যাইবেন না, মুসলমানদের হিন্দুদিগের ধর্ম্ম-বিষয়ে আঘাত লাগে এমন কোন কাজ করিবেন না। মুসলমানগণ হিন্দুর মন্দির বা অন্য পবিত্র-স্থানের নিকট গো-হত্যা ইত্যাদি করিবেন না, হিন্দুর মনে ধর্ম্ম-বিষয়ে আঘাত লাগে এমন কোন কাজ করিবেন না। আরো স্থির হইল, দেশের ছোট বড় সমস্ত নেতা, সমস্ত কর্ম্মী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। দেশ পর্য্যটন করিয়া সর্ব্বত্র সভাসমিতি করিয়া দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও একতার বাণী প্রচার করিবেন, আবার দুইটি সম্প্রদায়কে প্রীতির বন্ধনে বাধিতে প্রাণপণ চেষ্টা সকলেই করিবেন।

ঐক্যসম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ মহাত্মাকে তাঁহাদের সঙ্কল্প ও চেষ্টার কথা নিবেদন করিলেন। মহাত্মা অন্ধকারের মধ্যে আবার আলো দেখিতে পাইলেন। আশ্বস্ত অন্তরে উপবাস ত্যাগ করিলেন।

কয়েক মাসের জন্য দেশে যেন আবার একটা শান্তির ভাব ফিরিয়া আসিল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কলহ ও ঈর্ষার ভাব কমিয়া আসিল। গান্ধীজীর জীবন উৎসর্গের সঙ্কল্পে সেবারের মত সাম্প্রদায়িক কলহ নিবারিত হইল।

সাতচল্লিশ

চরকা হরিজন ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য

১৯২৪-এর ডিসেম্বর মাসে বেলগাঁও-এ কংগ্রেসের অধিবেশন বসিল। এই অধিবেশনের জন্য ভারতের জাতীয় মহাসভার সমস্ত দল সমবেত ভাবে গান্ধীজীকে সভাপতি মনোনীত করিলেন। দেশবাসী তাঁহার আদর্শকে গ্রহণ করিতে উন্মুখ হইয়াছে জানিয়া, সকলে তাঁহার অসহযোগ আন্দোলনে সহযোগিতা করিতে উদ্যত হইয়াছে জানিয়া, তিনি দেশ-নেতাদের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের প্রীতি জানাইলেন, স্বরাজ্যদলকে অসহযোগী দলের মধ্যে টানিয়া লইলেন। তিনি বলিলেন, 'আজ প্রত্যক্ষ কর্ম্মের দায়িত্ব ও অহিংস সংগ্রাম পরিচালনা করিবার ভার আপনারা গ্রহণ করুন, আমাকে রাজনীতির কাজ হইতে অতন্তঃ কিছু কালের জন্য অবসর লইতে অনুমতি করুন। সক্রিয় আন্দোলন অপেক্ষা দেশের সাম্প্রদায়িক সামাজিক ও আর্থিক দুর্দ্দশাগুলি এখন আমার অন্তর ও বিবেককে বেশী আকর্ষণ করিতেছে। ঈশ্বর যেন আমাকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন—ভাইয়ে ভাইয়ে কলহ করিয়া যদি দেশ দুর্ব্বল হইয়া যায়, দেশের অধিবাসীগণ যদি দুঃখ দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার মধ্যে পড়িয়া দীন জীবন যাপন করেন, সমাজের স্তরে স্তরে যদি শ্রেণীবিদ্বেষ ও অস্পৃশ্যতা-বিদ্বেষ সমাজকে বিভক্ত ও পঙ্গু করে, দেশবাসী যদি স্বদেশী দ্রব্যের অভাবে বিদেশী দ্রব্য ও বস্ত্র গ্রহণ করেন; তাহা হইলে তুমি শুধু রাজনীতি করিয়া, অহিংসা আন্দোলন করিয়া দেশবাসী কোটি কোটি মানুষের কি সেবা করিলে, অসংখ্য দরিদ্র নিপীড়িত আর্ত্ত মানুষের কি কল্যাণ করিলে? ... ...

'আমি ঈশ্বরের এই সতর্কবাণী গ্রহণ করিব স্থির করিয়াছি, আমি তাই প্রত্যক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া দেশের আভ্যন্তরীন সেবায় অগ্রসর হইব সঙ্কল্প করিয়াছি।

'অন্তরে এই সতর্ক-বাণী শুনিযা অনুতাপ জাগিতেছে—সত্যই ত, দেশের প্রকৃত কল্যাণ আমি কি করিলাম? আমার দেশের জনসাধারণই যদি ভ্রান্তিতে দারিদ্র্যে, অশিক্ষায ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন রহিল, তাহা হইলে স্বাধীনতা লইয়া আমরা কি করিব। আমার দেশবাসী যদি একতাবদ্ধ, সুশিক্ষিত সমৃদ্ধ ও উদার মনোবৃত্তি-সম্পন্ন হইযা উঠে, তাহা হইলে দেশের সেই পুনর্জাগরণকে আমি স্বাধীনতা অপেক্ষা ও বেশী কাম্য ও শ্রেয বলিয়া মনে করিব। আমি চিরজীবন সত্যাগ্রহী, সত্যকে গ্রহণ ও অনুসরণ করিবার জন্য এবং দেশের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের প্রদর্শিত সত্যপথকে অবলম্বন করিব।'

মহাসভার নেতাগণ ও প্রতিনিধিগণ এই দুর্জ্জয় সঙ্কল্প শুনিযা অভিভূত হইলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত গান্ধীজীকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির কর্ম্ম ও কর্ত্তব্য হইতে সামযিক ভাবে বিদায দিতে বাধ্য হইলেন। সকলেই চিন্তা করিযা অনুধাবন করিলেন, দেশের এই আভ্যন্তরীন দুর্দ্দশার সমযে দরিদ্র অশিক্ষিত অসহায দেশবাসীর সহিত গান্ধীজীর মত মহাপ্রাণের সংযোগেরই বিশেষ প্রযোজন। লক্ষ লক্ষ ধ্বংসোন্মুখ গ্রামের মধ্যে গান্ধীজীর বাণী ও আদর্শের প্রচার একান্ত প্রযোজন। নেতাগণ মহান্ নেতাকে—মহাসেনাপতিকে মহাব্রত পালনের জন্য দুঃখের সহিত বিদায দিলেন। অবসর গ্রহণ করিবার কালে গান্ধীজী জানাইলেন, 'কিন্তু আমি আপনাদের স্নেহ ভুলিব না। আপনাদের আন্তরিকতা ও সেবা ভুলিব না। আপনারা যখনই আমার রাজনীতিতে যোগদান আবশ্যক মনে করিবেন, আমাকে আদেশ করিবেন। আমি প্রযোজন সত্য মনে করিলে, তৎক্ষণাৎ আপনাদের আদেশে আবার আপনাদের সহিত মিলিত হইব। আবার আপনাদের পাশে দাঁড়াইযা অহিংসার জন্য প্রাণদান করিব, আবার সংগ্রাম করিয়া সরকারের যে কোন শাস্তি বরণ করিব।'

গান্ধীজী সাময়িকভাবে রাজনীতির ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। দেশের-সমাজের সেবা-ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

গান্ধীজী স্থির করিলেন, সমাজের দুঃখ দুর্দ্দশা ও দারিদ্র্য প্রত্যক্ষ করিয়া

উহার সাধ্যমত প্রতিকার করিবার জন্য তিনি ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিবেন। দরিদ্র দীন দুঃখী ও পতিত দেশবাসীর সংস্পর্শে আসিবেন, তাহাদের হৃদয় জানিবেন, তাহাদের নিকট নিজের হৃদয় খুলিয়া দিবেন। তাহাদের সুখে সুখী হইবেন, দুঃখে দুঃখী হইবেন।

সঙ্কল্প স্থির করিয়া তিনি ভ্রমণে বাহির হইলেন।

ভক্ত তীর্থযাত্রী ····

তীর্থ যাত্রায় চলিয়াছেন······

মন্দিরে মন্দিরে, তীর্থে তীর্থে দেবতার দর্শন লাভ করিয়া···দেবতাকে সেবা করিয়া ধন্য হইবার জন্য অচঞ্চল দৃঢ়-পদে অগ্রসর হইতেছেন······

ভক্ত গান্ধীজী······

তীর্থযাত্রায় চলিয়াছেন······

গ্রামে গ্রামে···পথে-ঘাটে নররূপী দেবতার দর্শন লাভ করিয়া···মানুষের সেবা দ্বারা মানুষের অন্তরস্থিত ভগবানকে সেবা করিবার জন্য বন্ধুর পথ বাহিয়া অচঞ্চল দৃঢ় পদে অগ্রসর হইতেছেন।

গান্ধীজী ১৯২৫ সালের গোড়া হইতেই এক প্রদেশ হইতে আর এক প্রদেশে, এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামে ঘুরিতে লাগিলেন। তিনি যেখানেই গেলেন, আগে সেখানের অস্পৃশ্য পল্লীতে আশ্রয় লইলেন, অস্পৃশ্য·· হরিজনদের মধ্যে নিজের আশ্রম স্থাপনা করিলেন, তাহাদের সহিত মিশিয়া গেলেন। তাহাদের প্রতি স্নেহ ভালবাসা প্রকাশ করিলেন, তাহাদের সেবা করিলেন, তাহাদের সহিত একসঙ্গে পল্লীর কার্য্যে মাতিয়া উঠিলেন, তাহাদের দীনভাব ও অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য উপদেশ ও পরামর্শ দিলেন। অস্পৃশ্যগণ, অন্ত্যজগণ তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া হিন্দু সমাজের প্রকৃত আদর্শ কি, প্রকৃত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কি, তাহা জানিতে পারিয়াছিল। নিজেদের দীনস্বভাব পরিহার করিয়া তাহারা আবার মানুষের মত মাথা উঁচু করিবার আদর্শ ও প্রেরণা পাইয়াছিল। তিনি সাধ্যমত পল্লীতে পল্লীতে তাহাদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়

স্থাপনার বন্দোবস্ত করিলেন, তাহাদের শ্রমের মর্য্যাদাজ্ঞান দান করিলেন। চাষী শিখিল, কর্ম্মের অবসরে আলস্যে কালহরণ করা মহাপাপ। মজুর শিখিল, পরিশ্রমের অবসরে কষ্টার্জ্জিত অর্থকে ব্যসনে ও বিলাসে নষ্ট করা মহা অন্যায়। চাষী মজুর সকলেই অবসর সময়ে পরিশ্রম করিয়া নিজের অর্থ ও জীবিকা অর্জ্জনের জন্য সচেষ্ট হইল।

সমাজের ভদ্র ও উচ্চশ্রেণীগণের মধ্যেও ইহার দ্বারা সর্ব্বত্র একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল। শিক্ষিত তরুণের দল সকল স্থানেই গান্ধীজীর সহিত মিলিত হইলেন। হরিজনেরাও তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। নিজেদের আন্তরিকতা, সেবা ও আচরণের দ্বারা শ্রেণীভেদের ব্যবধান লুপ্ত করিতে লাগিলেন। ঘুমন্ত অথচ বিরাট সমাজের প্রতিটি অঙ্গে নব-জাগরণের একটা সাড়া পড়িয়া গেল। গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন প্রচেষ্টাই আজ হিন্দু সমাজকে ধ্বংস হইতে উদ্ধার করিয়াছে।

তাঁহার সেই সব দিনের চেষ্টার ফলেই আজ ভ্রান্ত সমাজ যেন চেতনা লাভ করিয়াছে।

গ্রামাঞ্চলে এই কাজের সহিত গান্ধীজী তাঁহার স্বদেশী গ্রহণ এবং খাদি প্রচারের কার্য্যও অশেষ উদ্যমের সহিত পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তিনি যেখানেই যাইতে লাগিলেন, সেখানেই দেশবাসীকে চরকার উপকারিতা বুঝাইতে ও শিখাইতে লাগিলেন। তিনি নিজে চরকায় সূতা কাটিয়া গ্রামবাসীগণের মধ্যে প্রেরণা দান করিলেন। তাঁহার ভ্রমণের সাথী ও সহগামীগণ বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া চরকা কাটিতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন।

চরকার ঘর্ঘরে গ্রামগুলি মুখরিত হইয়া উঠিল। চাষীগণ অবসর কালে চরকা কাটিতে লাগিলেন, গৃহস্থ কাজের ফাঁকে সূতা কাটিতে লাগিলেন, তাঁতী মনের আনন্দে তাঁত চালাইতে লাগিল। স্বদেশী চরকার স্বদেশী কাপড় পরিয়া দরিদ্র গ্রামবাসী লজ্জা নিবারণ করিতে শিখিল।

গান্ধীজী উৎসাহিত হইলেন, সমগ্র ভারতে স্বদেশী প্রচারের ব্রতে দীক্ষিত

কর্ম্মী ও সেবকগণের সহযোগে একটি সম্মেলন আহ্বান করিলেন। সম্মিলনীর কর্ম্মীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া চরকা ও খাদির প্রচারের জন্য 'নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন। স্থির হইল কাটুনী সঙ্ঘের কর্ম্মীগণ ভারতের গ্রামে গ্রামে কাটুনী সঙ্ঘের শাখা স্থাপন করিবেন এবং কর্ম্মী ও সেবকের দল গ্রামবাসীগণের মধ্যে চরকার আদর্শ, খাদির আবশ্যকতা বিষয়ে প্রচার করিবেন এবং ঐ সঙ্গে নিজেরাও চরকা কাটিয়া গ্রামবাসীগণকে চরকা কাটিতে ও খাদি গ্রহণ করিতে প্রেরণা দিবেন।

নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘের কর্ম্মীদল সমস্ত গ্রামে ছড়াইয়া পড়িলেন, তাঁহাদের চেষ্টায়, তাঁহাদের শ্রমে ঘরে ঘরে চরকা ঘুরিতে লাগিল, ঘরে ঘরে খাদি-গ্রহণের সঙ্কল্প জাগিল।

বাংলার জনসাধারণ প্রথম অসহযোগের সময় হইতেই খাদির মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এখন তাঁহারা আরো উদ্যমের সহিত চরকা ও খাদির কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। জাতিকে স্বদেশী মন্ত্রে উৎসাহিত করিবার জন্য জাতির চারণ কবির দল গান গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল—

'চরকা আমার সোয়ামী-পুত, চরকা মোদের নাতি,
চরকার দৌলতে মোদের দুয়ারে বাঁধা হাতী।'

বাংলার কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে শুনাইলেন—

ঘরবার করবার দরকার নেই আর,
মন দাও চরকায় আপনার আপনার!

চরকার দৌলতে জাগিল, 'গুজরাট পাঞ্জাব বাংলায় সাড়া'····· সকলে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখিল······দেশের পণ্যের উপর নির্ভর করিতে উদ্বুদ্ধ হইল।

দেশে যেন একটা নূতন প্রাণের স্পন্দন জাগিল। গান্ধীজীর অন্তর শান্তি ও স্বস্তির আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

চরকা হরিজন ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য

খাদি ও স্বদেশী পণ্য প্রচারের সহিত গান্ধীজী যন্ত্রশিল্পের প্রতি তাঁহার বীতরাগ এই সময়ে ভারতবর্ষের জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতে আরম্ভ করেন এবং যন্ত্রশিল্পকে বর্জ্জন করিয়া কুটীর-শিল্পকে ভারতের আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিকজীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আমরা বিশেষভাবে জানিতে পারিলাম যন্ত্রের বিরাট ও বিপুল ক্ষতিকর প্রভাব কেমন করিয়া ভারতের সর্ব্বনাশ করিতেছে, কেমন করিযা প্রচুর মাল উৎপাদন কবিয়া দেশের বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি করিতেছে, কেমন করিযা যন্ত্রদানবের প্রভাবে মানুষের আত্মা পর্য্যন্ত দানবে ও পিশাচে পরিণত হইতেছে। তাঁহার মতে বর্ত্তমান সভ্যতার আত্মা হইল যন্ত্র। তিনি স্থির করিলেন, যন্ত্রদানবের হাত হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে হইবে। তিনি বারবার দেশবাসীকে যন্ত্রের গোলামী পরিত্যাগ করিবার জন্য আবেদন করিলেন। তিনি বলিলেন, 'ভারতে স্বদেশী বস্ত্র পাইবার জন্য মিলের সংখ্যা বাড়ান অপেক্ষা ম্যাঞ্চেষ্টারে টাকা পাঠানও অনেক মঙ্গলজনক। একজন ভারতীয় মিলমালিক শোষণের দিক দিযা একজন আমেরিকান মিল মালিক অপেক্ষা কোন দিক দিযাই ভালো হইবেন না। যন্ত্র মানুষকে ক্রীতদাসের জাতিতে পরিণত করে।

যন্ত্রের মধ্য দিযাই দরিদ্রশোষণকারী ধনতন্ত্র মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়ায়, যন্ত্রের জাগরণেই মানুষের দৈহিক শক্তি লোপ পায। যন্ত্রের নিষ্পেষণেই মানুষ ক্রমশঃ দরিদ্র ও চরিত্রভ্রষ্ট হয। এখন হইতে যন্ত্রসভ্যতার কুফল প্রমাণ ও প্রচার করাই গান্ধীজীর বিশেষ কর্ম্মসূচী হইযা উঠিল। তাই তিনি বারবার নিজ দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া জানাইলেন— 'কতো সাম্রাজ্যের উত্থান পতন ঘটিযাছে, কিন্তু ভারত একাকী তাহারই মধ্যে হাজার হাজার বছর ধরিয়া অবিচলভাবে দাঁড়াইযা আছে। আর সমস্ত কিছু চলিযা গিযাছে, কেবল ভারতবর্ষ অর্জ্জন করিযাছে আত্মসম্মানের অধিকার। ইহা যন্ত্র চাহে নাই, নগর কামনা করে নাই। প্রাচীন চরকা এবং দেশীয কুটীর-শিল্পই ইহাকে নিঃসন্দেহে

জ্ঞান ও শুভের অধিকারী করিয়াছে। তাই ভারতের সমৃদ্ধি কামনা করিবার জন্য আবার তাহার প্রাচীন সারল্যে ফিরিয়া যাইতে চাই।' এইরূপে যন্ত্রশিল্পের ধ্বংসকর দিকটি প্রকাশ করিয়া তিনি ভারতবাসীকে কুটীর-শিল্পের প্রতি অনুরাগী হইতে পরামর্শ দিলেন। যন্ত্রই যে সমাজ-শোষণ-কারী ধনতন্ত্র-বাদের মূল কারণ তাহা বিশ্বজগৎকে তিনি জানাইয়া দিলেন।

এইরূপে যন্ত্রশিল্পের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্যের ভিতর দিয়া তিনি ধনতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধেও প্রচার আরম্ভ করিলেন এবং ধনসঞ্চয়ের নেশাই যে দরিদ্র ভারতবাসীর দুঃখ ও কষ্টের কারণ তাহা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তবে এই ধনতন্ত্রবাদের প্রতিকারের জন্য তিনি এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করিবার যুক্তি দিলেন। তিনি ধনিকদের জানাইলেন, তাঁহারা যেন সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন যে, তাঁহারা দরিদ্র দেশবাসীর অর্থের রক্ষকমাত্র দেশের ধনের অছিমাত্র। তাঁহাবা অর্থ দ্বারা আপনার ভোগ ও বিলাস চরিতার্থ না করিয়া, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসাবের জন্য, দবিদ্রের অন্ন ও বস্ত্রের সংস্থানের জন্য, নব নব দ্রব্যসম্ভারের বৃদ্ধির জন্য, সমাজেব সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য অর্থকে ব্যয় করিবার ইচ্ছা লইয়া প্রস্তুত থাকিবেন। মিলমালিক শ্রমিকের মত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিবেন, জমিদার সাধারণ প্রজার মত থাকিতে চেষ্টা করিবেন। মিলমালিক মজুরদিগকে এবং জমিদার প্রজাদিগকে তাঁহার সহ-মালিক বলিয়া মনে করিবেন। অন্য কথায় বলা চলে, মিলের মালিকদের মত জমিদারগণও প্রজাদের অছিরূপে জমিদারী রাখিবেন। কেবলমাত্র নিজেদের শ্রম ও মূলধন ব্যবহারের জন্য পরিমিত কমিশন লইবেন। তাহা হইলে সমাজে শ্রমিকে মালিকে, জমিদারে প্রজায় বিবাদ থাকিবে না। তাহা হইলে ধনতন্ত্রের মধ্যে শোষণের ব্যবস্থা থাকিবে না, বরং সঞ্চিত ধন দেশের দরিদ্রদের কল্যাণের জন্য নিযুক্ত হইবে। (হরিজন পত্রিকা, ১৯৩৪ সালের এবং ২৭শে এপ্রিল, ১৯৪০ সালের প্রশ্নোত্তরেব সারাংশ।)

আটচল্লিশ

ভাইকমের কথা ও দেশবন্ধুর স্মৃতি

স্বদেশী প্রচারের ভিতর দিযাই যন্ত্রশিল্পের বিরুদ্ধে গান্ধীজী প্রচারকার্য্য চালাইতেছিলেন, আর ঐ সঙ্গে ধনতন্ত্রবাদের ক্ষতিকর দিকটিকে প্রকাশ করিযা সমাজের দরিদ্রগণের কল্যাণের জন্য অর্থ-সাম্যের আদর্শ প্রচার করিতেছিলেন।

হরিজন-বন্ধু ও দরিদ্র-বন্ধু মহাত্মা সেবার আদর্শ গ্রহণ করিযা গ্রামে গ্রামে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। মানুষের মধ্যে সমাজ-বিভেদের প্রাচীর ধূলিসাৎ করিবার আপ্রাণ চেষ্টা সুরু করিলেন। পুঁজিবাদের বিষবৃক্ষকে তিনি উচ্ছেদ করিতে চাহিলেন। কুটীরশিল্পের জাগরণ ও দরিদ্রের প্রতি সমবেদনাই ভারতের ঐশ্বর্য্য ও শক্তির মূল উৎস—ইহা তিনি জানাইযা গিযাছেন।

ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের ভাইকম নামক গ্রামে আসিযা উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এই গ্রামের একটি জঘন্য সামাজিক অনাচারের কথা তাঁহার সত্যপ্রিয অন্তরকে বিশেষভাবে চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ করিযা তুলিল। এই গ্রামের উচ্চশ্রেণীর সমাজপতিগণ জাত্যভিমানে মত্ত হইযা নিম্নশ্রেণীর হরিজনদের পশুর মত দেখিতেন। বলিতে গেলে, পশু অপেক্ষাও হীন বলিযা তাহাদিগকে গণ্য করিতেন। হরিজন অধিবাসীগণ উচ্চবর্ণীয়গণের পল্লী হইতে দূরে কোণঠাসা হইয়া বাস করিতেন, উচ্চবর্ণীয়গণ যে রাস্তা দিযা যাতাযাত করিতেন, সেই রাস্তা দিযা পর্য্যন্ত তাঁহাদের যাইবার অধিকার ছিল না, তাঁহারা উচ্চবর্ণীয়গণের পরিত্যক্ত পৃথক রাস্তা দিযা সন্তর্পণে অপরাধীর মত যাতায়াত করিতেন।

গান্ধীজী এই দৃশ্য বেদনার সহিত প্রত্যক্ষ করিলেন। আফ্রিকার গর্ব্বান্ধ শ্বেতাঙ্গগণের ব্যবহারের কথা তাঁহার অন্তরে উদয় হইল। তিনি বেদনার্ত্ত

হইয়া উঠিলেন এবং এই অনাচার ও মিথ্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য অটুট সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। তিনি সঙ্গী ও সহকর্ম্মীদের নিকট জানাইলেন, মাটির পথ ঈশ্বর সৃষ্ট পৃথিবীরই অংশ। এই পথে চলার অধিকার শুধু উচ্চবর্ণীয় হিন্দুগণের নাই, হরিজনদেরও এবং ছোটবড় প্রত্যেকটি মানুষেরই আছে। এই পথে সকল মানুষ জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে যাহাতে চলিতে পারে তাঁহারা সেই উপায ও ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

সত্যাগ্রহী কর্ম্মীর দল সত্য-স্থাপনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা উচ্চশ্রেণীদের দ্বারে দ্বারে যাইযা করজোড়ে ও বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন—হরিজন ভাইয়েদের এই সব নিষিদ্ধ পথে চলিতে অনুমতি দিন, মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার দূর করুন। এই সব মূঢ় মূক ম্লান পতিত মানবকে আপনাদের কাছে টানিযা নিন।

কিন্তু তাঁহাদের অনুনয়-বিনয়ে বিপরীত ফল ফলিল। উচ্চবর্ণীযগণ অধিকার হারাইবার ভযে জ্ঞানহারা হইলেন। ক্রুদ্ধ হইযা সত্যাগ্রহীদের ও হরিজনদের নিষিদ্ধ পথে গমন করিতে নিষেধ করিলেন, ত্রিবাঙ্কুরের প্রতিক্রিযা-শীল সরকারের নিকট আইনের দোহাই দিযা নালিশ করিলেন। স্বেচ্ছাচারী দেশীয সরকারও সমাজিক ভেদাভেদের মোহে অন্ধ ছিল, তাহারা এইজন্য আইন অমান্য না করিবার জন্য সত্যাগ্রহী ও হরিজনদের নিকট রক্তচক্ষু দেখাইয়া তর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহারা ঘোষণা করিল, হরিজনগণ সরকারের আদেশ অমান্য করিয়া নিষিদ্ধ পথগুলিতে আসিতে চেষ্টা করিলে, সরকার শক্তিপ্রয়োগ করিয়া বাধা দিতে বাধ্য হইবে। হরিজনের যোগ্য শাস্তি দিতে বাধ্য হইবে।

কিন্তু সত্যাগ্রহীদের হিংসাশূন্য নির্ভীক হৃদয় দেশীয় সরকারের রক্তচক্ষু দেখিয়া বা গর্ব্বান্ধ ব্রাহ্মণগণের অভিশাপ-বাণী শুনিয়া ভীত হইল না, বরং সত্য প্রতিষ্ঠায় বাধা আছে জানিয়া আরো উৎসাহিত হইল, তাঁহাদের সঙ্কল্প আরও কঠোর হইল।

গান্ধীজী সত্যাগ্রহী সেবকদের সহিত সমাজ-পরিত্যক্ত হরিজনগণকে সঙ্গে লইয়া নিষিদ্ধ পথে অগ্রসর হইলেন। সরকারের রক্তচক্ষু ও উচ্চবর্ণের সমাজপতিগণের প্রতিহিংসার চক্ষু তাঁহাদের উপর অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। সরকারের পুলিশ-বাহিনী হরিজনদের ও সত্যাগ্রহীদের পশুর মত প্রহার করিতে লাগিল, নির্দ্দয়ভাবে পীড়ন করিতে লাগিল। সত্যাগ্রহীর দল প্রশান্ত মনে সে অত্যাচার সহ্য করিলেন। হরিজনদের উপর নিক্ষিপ্ত লাঠি নিজেরা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তথাপি তাঁহারা সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না। গান্ধীজীর এই সত্যসেবা ও আদর্শনিষ্ঠার কথা সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। সত্যাগ্রহীদের দুঃখ-বরণের কাহিনী শুনিয়া ভারতবাসী চঞ্চল ও অস্থির হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষময় ত্রিবাঙ্কুর সরকারের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে একটা প্রবল বিক্ষোভ জাগিযা উঠিল। ত্রিবাঙ্কুরের সমাজহিতৈষী জনসাধারণও এই মিথ্যা প্রথা ও অন্যায অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য গান্ধীজীর পাশে আসিযা সমবেত হইলেন।

স্বৈরাচারী সরকার ইহা দেখিযা ভীত হইযা পড়িলেন, পরিণাম চিন্তা করিয়া সাবধান হইলেন। তাঁহারা উচ্চবর্ণীযগণের পক্ষ ত্যাগ করিযা নিজ আদেশ প্রত্যাহার করিলেন। সকল পথেই মানুষের গমনাগমনের সমান অধিকার আছে, ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। বাধামুক্ত হইযা মিথ্যা প্রথা চূর্ণ করিয়া গান্ধীজী হরিজনদিগকে লইযা নিষিদ্ধ পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বিভেদের বাধা দূর করিলেন।

গান্ধীজীর কার্য্য-কলাপে বহু দেশের মধ্যে পরিবর্ত্তন হইল। নানাদেশের হরিজনদের উপর হইতে নানাপ্রকার নিষিদ্ধ প্রথা ও অবরোধের নিয়ম তুলিযা লওয়া হইতে লাগিল। ভারতের নবজাগ্রত তরুণদল গান্ধীজীর আদর্শে হরিজন ভাইদের আবার নিজের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে প্রচার-কার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষ করিয়া গান্ধীজী বাংলা প্রদেশে আসিলেন।

বাংলার গ্রাম ও নগরে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি বাংলার সমাজের সহিত পরিচিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি পুনরায় শান্তিনিকেতনে গিয়াছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে বাস করিয়া তিনি ভারতের শাশ্বত ও প্রকৃত শান্তির আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মানব-প্রীতি ও ঈশ্বরোপলব্ধি দেখিয়া শ্রদ্ধানত চিত্তে কবিবরকে নতি জানাইয়াছিলেন। গান্ধীজীর ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হইল।

এই সময়ে একটা শোকের কালো ছায়া সমগ্র ভারতবর্ষকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীর অন্তরকে আচ্ছন্ন করিযা ফেলিয়াছিল।

ভারতের অন্যতম জননায়ক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এসময়ে গুরুতর পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও দেশের সেবার জন্য, দেশের দরিদ্র দুঃখী আতুরের জন্য নিজের সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিঃশেষে দান করিযাছিলেন। দেশবাসী দেশবন্ধুর পীড়ায় উদ্বিগ্ন হইযা উঠিলেন। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য অসংখ্য দেশবাসীর কাতর অনুরোধে সর্ব্বত্যাগী চিত্তরঞ্জন দার্জ্জিলিঙে গমন করিযাছিলেন। কিন্তু মৃত্যু তাঁহাকে দেশের জনগণের নিকট হইতে নির্ম্মমভাবে বিচ্ছিন্ন করিল। দেশকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া ১৯২৫-এর জুন মাসে দেশবন্ধু এই মরজগৎ হইতে মহাপ্রযাণ করিলেন।

দুঃখে সমগ্র ভারতবর্ষ যেন অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এই দুঃখ-সংবাদ গান্ধীজী শুনিলেন। গান্ধীজীর হৃদয ব্যাকুল হইযা উঠিল। তাঁহার অসহযোগ আন্দোলনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীটিকে স্মরণ করিয়া গান্ধীজী তাঁহার নশ্বর দেহকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য কলিকাতায় ছুটিয়া আসিলেন। দেশবাসীর আকুল প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য দেশবন্ধুর মৃতদেহ দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতায আনা হইল। বিরাট ও অভূতপূর্ব্ব শোভাযাত্রা সহকারে তাঁহার নশ্বরদেহ কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে নীত হইল। গান্ধীজী দেখিলেন, দেশবন্ধু চিতার বক্ষ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। গান্ধীজী তাঁহার অন্তরকে প্রশ্ন করিলেন, দেশের বন্ধুর কোন স্মৃতিই কি দেশবাসীর নিকট তাঁহার অসীম সেবা ও গুণের কথা স্মরণ

করাইবার জন্য অবশিষ্ট থাকিবে না, দেশবন্ধুর পুণ্য ও পবিত্র স্মৃতি কি দেশবাসীর নিকট ধূপের ধোঁযার মত মধুর গন্ধ বিতরণ করিবে না ?...... জানিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে দেশবন্ধু তাঁহার ভবানীপুরের একমাত্র প্রাসাদটি পর্য্যন্ত দেশের সাধারণের কল্যাণ-কামনায সাধারণের নামে দান করিয়া গিয়াছেন।

গান্ধীজী তাঁহার অন্তরের প্রশ্নের সমাধান খুঁজিযা পাইলেন। তিনি নেতা-গণের সহিত পরামর্শ করিযা স্থির কবিলেন, ভবানীপুরের প্রাসাদে তিনি দেশের দরিদ্র ও অনাথা নারী এবং শিশুগণের চিকিৎসা ও সেবার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয প্রতিষ্ঠা করাইবেন। কিন্তু এই সেবার কার্য্যে প্রচুব অর্থের প্রযোজন। নেতাগণ দাতব্য চিকিৎসালয প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব চিন্তা করিযা নিরুৎসাহ হইযা পড়িলেন। গান্ধীজী এই সমস্যারও সমাধান করিলেন। তিনি বলিলেন, 'দেশবন্ধু ছিলেন দেশেব বন্ধু, তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে অর্থেব প্রযোজন হইবে, তাহা দেশবাসী দান করিবেন। দেশবাসীর নিকট হইতে অর্থ ভিক্ষা করিযা সর্ব্বত্যাগী ভিখারী শিবের মহিমা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আমি নিজে এই অর্থ ভিক্ষা করিব। দেশের দ্বারে দ্বারে হাত পাতিযা ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করিব'।

সঙ্কল্প-কঠোর গান্ধীজী কখনও সঙ্কল্প হইতে বিরত হইতেন না। তিনি দীর্ঘ তিন মাস ধরিযা ধনী ও দরিদ্রের দ্বারে দ্বারে হাত পাতিয়া বেড়াইলেন। এক মহান্ আত্মার স্মৃতি-রক্ষার জন্য ধনীদরিদ্র আপামর সমস্ত ভারতবাসী আর এক মহান্ আত্মাকে দশলক্ষ টাকা সাহায্য প্রদান করিলেন। গান্ধীজী সঞ্চিত অর্থ নেতা ও উদ্যোক্তাগণের হস্তে অর্পণ করিলেন। অর্থ দ্বারা 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' স্থাপিত হইল,—চিত্তরঞ্জনের অমর স্মৃতি সেবাসদনের সেবার দ্বারা চির অমরত্ব লাভ করিল।

উনপঞ্চাশ

সাইমনের ফাঁকি ও নেহেরু রিপোর্ট

সেবাসদন প্রতিষ্ঠা করিয়া গান্ধীজী আবার তাঁহার চরকা ও সংগঠনের কার্য্যে মন দিলেন। আবার ভারতের বিভিন্ন জেলায় ভ্রমণ করিয়া খাদি প্রচার করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে দক্ষিণ অফ্রিকার ভারতীযগণের সমস্যা লইয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা চলিতেছিল। আলোচনার পর (১৯২৬-২৭ সাল) দুই সরকার সমস্যার সমাধান করিবার জন্য একটি আপোষ-মীমাংসায় উপনীত হইলেন। তাঁহারা মীমাংসার সর্ত্তাবলী গান্ধীজীকে জানাইলেন।

সর্ত্তে স্থির হইযাছিল যে (১) জীবনযাপনে প্রতীচ্য মান স্বীকার করিয়া লইলে প্রবাসী ভারতবাসীগণ দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিযনে স্থায়ী বাসিন্দারূপে বসবাস করিতে পারিবে। (২) যাহারা এই ব্যবস্থায সম্মত নয, তাহাদের ইউনিয়ন সরকার নিজ খরচায ভারতে পাঠাইযা দিবেন। (৩) একাদিক্রমে ইউনিয়নে তিন বৎসর অনুপস্থিত হইলে, সেইখানে বসবাসের অধিকার লোপ পাইবে। (৪) প্রত্যেক স্থায়ী বাসিন্দাকেই ১৯১৮ সালের সাম্রাজ্য-সম্মেলনের নির্দ্ধারণ মানিয়া লইতে হইবে। (৫) ভারতীযগণের এক-পত্নীত্বে সম্মতি দিতে হইবে এবং প্রথমা স্ত্রীর পুত্রগণ আইন-সম্মত বলিযা গৃহীত হইবে।

গান্ধীজী সর্ত্তাবলী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেন। শেষ পন্থা হিসাবে অগত্যা ইহাকে প্রবাসী ভারতীয়গণের পক্ষে মন্দের ভাল বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু ভারত-সরকারকে জানাইলেন, আফ্রিকার ভারতীয়গণের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য একজন বিশেষ ক্ষমতা-সম্পন্ন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইবে। গান্ধীজীর পরামর্শ ভারত সরকার গ্রহণ করিলেন। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়কে আফ্রিকার ভারতের বিশেষ কর্ম্মচারীরূপে (এজেন্ট,

জেনারেল) প্রেরণ করিলেন। এইরূপে গান্ধীজী আফ্রিকা সমস্যার একটা শেষ সমাধান করিলেন।

অতঃপর গান্ধীজী তাঁহার স্বদেশী প্রচার ও সমাজসেবার কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার কার্য্য বন্ধ করিতে হইল। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার গুরুতর পরিণতির জন্য দেশের নেতাগণ ও দেশবাসী আবার তাঁহাকে স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনা করিবার জন্য একান্তভাবে কামনা করিতে লাগিলেন। গান্ধীজীও বুঝিলেন, আবার তাঁহার রাজনীতিতে যোগদান করিবার সময় আসিয়াছে। স্বদেশী প্রচার, সমাজসেবার কার্য্য, 'কাটুনী সঙ্ঘ' প্রভৃতি তাঁহার মন্ত্রদীক্ষিত সত্যাগ্রহীদিগের উপর ছাড়িয়া দিয়া তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করিলেন।

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এই সময়ে সাইমন কমিশনের আবির্ভাব ভারতের জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। আমরা সাইমন কমিশন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আবার মূল বিষয়ে ফিরিয়া আসিব।

ভারতবাসীর অসহযোগ আন্দোলনে ইংরাজ সরকার যেমন বিব্রত হইতেছিলেন, ইংরাজ বণিককুলও সেইরূপ ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছিলেন।

ইংরাজের বস্ত্রশিল্পের মূল কেন্দ্র ম্যাঞ্চেষ্টারের কলকারখানাগুলি কাজের অভাবে বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, শ্রমিকগণ বেকার হইয়াছিল, ভারতে অন্যান্য বিলাতী মালেরও সরবরাহে বিশেষ মন্দা পড়িয়াছিল। ইংলণ্ডের সাধারণ ইংরাজগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে একটা প্রতিকারের উপায়স্বরূপ ভারতীয়গণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য চাপ দিতে লাগিল। পার্লামেণ্ট ও মন্ত্রীসভা বাধ্য হইয়া ভারতের শাসনবিষয়ে কিছু পরিবর্ত্তন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পার্লামেণ্টের নির্দ্দেশমত ভারতের তদানীন্তন বড়লাট (গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়) লর্ড আরউইন ১৯২৭ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী ভারতবাসীগণের উদ্দেশ্যে এক সরকারী ঘোষণা প্রচার করিলেন। এই ঘোষণায় তিনি জানাইলেন—স্যার জন সাইমন নামক একজন বিশিষ্ট

রাজনৈতিক নেতার নেতৃত্বে একটি অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হইবে। এই সমিতি ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিয়া শাসন বিষয়ে ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করিবেন এবং অনুসন্ধানের দ্বারা ভারতীয়গণ শাসনাধিকারে কতখানি যোগ্য তাহাও জানিয়া লইবেন। অবশেষে ইঁহাদের অভিজ্ঞ মতামত ও অনুসন্ধানের ফলাফল পার্লামেণ্টের নিকট দাখিল করিবেন। পার্লামেণ্ট এই কমিশনের মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ভারতীয়গণকে শাসন-বিষয়ে যথাযোগ্য অধিকার দিবার সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন।

কিন্তু এই ঘোষণা মারফৎই ভারতীয়গণ জানিতে পারিলেন যে, এই কমিশনে সরকারী বা বেসরকারী কোন ভারতীয় সদস্যকে গ্রহণ করা হইবে না, কেবলমাত্র ঝুনা ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ দ্বারা এই কমিশন গঠিত হইবে।

এই ঘোষণায় ভারতীয়গণ সন্তুষ্ট ত হইলেনই না, বরং অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। যে কমিশনে একজনও ভারতীয় সদস্য থাকিবে না, সে কমিশন ভারতের দুঃখ-দারিদ্র্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা কেমন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবে? কমিশনের ইংরাজ সদস্যগণ ভারতের রাজনৈতিক, আর্থিক অভাব-অনটন বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকার দরুণ কি মতামত প্রদান করিবে? ইংরাজ সদস্যগণ সাতসাগরের পারে থাকিয়া শুধু কেতাবী বিদ্যা দ্বারা আর আমলাতন্ত্রী ইংরাজ কর্ম্মচারীগণের মারফৎ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ভারতের যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিষযে কি প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিবেন?

অসন্তুষ্ট ভারতবাসীগণ দাবী করিলেন, এই কমিশনে ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করিতে হইবে। অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ ভারতীয় সদস্য লইতে হইবে, যাহাতে ভারতীয়গণের মতামত ভারতীয়গণের দ্বারাই ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কর্ণগোচর হইতে পারে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী সরকারের প্রকৃত অধিকার ত্যাগ করিবার বাসনা ছিল না। তাঁহাদের বাসনা ছিল শুধু আড়ম্বর করিয়া ভারতবাসীকে প্রতারিত করা। তাই তাঁহারা ভারতবাসীর দাবীতে বা অনুরোধে কর্ণপাত

করিলেন না। নিজেদের খেয়াল ও খুশীমত কেবলমাত্র ইংরাজ কর্ম্মচারীগণের দ্বারা গঠিত কমিশন পাঠাইবার জন্য ব্যবস্থা করিলেন।

আবেদন-নিবেদন বিফল হইল দেখিয়া ভারতীয়গণও এবার চরম পন্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ভারতের জাতীয় মহাসভা বিশেষ সিদ্ধান্ত করিয়া এই কমিশনকে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিবার জন্য এবং ইহার সহিত সর্ব্বপ্রকারে অসহযোগ করিবার জন্য সমগ্র দেশবাসীর নিকট আবেদন করিলেন। দেশবাসী মহাসভার সিদ্ধান্ত পরিপূর্ণভাবে পালন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। আসমুদ্র-হিমাচল সমগ্র ভারতের জনসাধারণ এই কমিশনকে 'বয়কট' করিবার জন্য নবীন উৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন।

নেতাগণ গান্ধীজীকে এই সঙ্কল্প বিষয়ে সমস্ত কিছু জ্ঞাপন করিলেন। গান্ধীজী তাঁহাদের সঙ্কল্পকে সমর্থন করিয়া জানাইলেন, যে কার্য্যে ভারতীয় আত্মার প্রতি দরদ নাই, ভারতীয়গণেরও সেই কার্য্য বা প্রণালীকে সত্যরক্ষার জন্য বর্জ্জন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কমিশনকে অহিংসভাবে বর্জন করিয়া জানাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য যে, আপনাদের সহিত আমাদের পরিচয় নাই, অতএব আপনাদের সহিত আমাদের কোন বাধ্যবাধকতাও নাই।

১৯২৮ সালে ৩রা ফেব্রুয়ারী স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে সাইমন কমিশন বোম্বাই বন্দরে অবতরণ করিল। বোম্বাই-এর সর্ব্বত্র হরতাল পালন করা হইল, স্বেচ্ছাসেবকগণ বন্দরে যাইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন—'সাইমন, ফিরিয়া যাও।'

শুধু বোম্বাই নহে, কমিশন যেখানে যাইতে লাগিল, সেইখানেই উহা তীব্র বিক্ষোভের সম্মুখীন হইল, সেইখানেই তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও পূর্ণ হরতাল পালিত হইল।

কমিশনের অনুসন্ধান কার্য্যে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। সরকারও এই ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া তীব্র ও অমানুষিক দমন কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করিল। স্থানে স্থানে বিক্ষোভ-প্রদর্শনকারী জনতার

উপর লাঠি, গ্যাস ও গুলি চালাইতে লাগিল। বড় বড় নেতারাও লাঠি ও গুলির আঘাতে আহত হইলেন। পঞ্জাবের বিখ্যাত নেতা লালা লজপত রায় লাঠিতে মারাত্মকভাবে আহত হইলেন এবং দিন কয়েক বাদে পীড়াগ্রস্ত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। জনসঙ্ঘের ধৈর্য্য শেষ সীমায় আসিয়া পৌছিল, তথাপি তাঁহারা সম্ভবমত অহিংস থাকিয়া কমিশনকে বর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কার্য্য শেষ করিয়া কমিশন ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেল।

ইতিমধ্যে জাতীয় মহাসভার নেতৃবৃন্দ শুধু কমিশনকে বয়কটের পরামর্শ দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন না। তাঁহারা ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগ বিষযে এবং অধিকার অনধিকার বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া ভারতবাসীর শাসন বিষয়ে যোগ্যতা ও ক্ষমতার সম্বন্ধে একটি নির্দ্দিষ্ট অভিমত প্রস্তুত করিবার জন্য একটি স্বদেশীয় কমিশন গঠন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহারা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে এই কমিশনের সভাপতি মনোনীত করিলেন। পণ্ডিতজীর দক্ষ নেতৃত্বে অন্যান্য ভারতীয় সদস্য বিশেষ অনুসন্ধান ও আলোচনার পর একটি অভিমত (Report) রচনা করিলেন। এই অভিমতে ভারতীয়গণকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার অবিলম্বে প্রদান করা উচিত, ইহা জ্ঞাত করা হইল। ব্রিটিশ সাধারণতন্ত্রের অধীনে ভারতবর্ষ আত্মশাসনাধিকার ভোগের সম্পূর্ণ অধিকারী ইহা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা হইল।

১৯২৮ সালে মহাসভার যে সাধারণ অধিবেশন হইল, উহাতে বিপুল ভোটাধিক্যে নেহেরু কমিশনের অভিমত (নেহেরু রিপোর্ট) গ্রহণ করা হইল। পণ্ডিত জহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি বামপন্থী নেতাগণ স্বায়ত্ত-শাসন প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিলেন এবং ব্রিটিশ কর্তৃত্ববিহীন পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু গান্ধীজী তাঁহাদের বুঝাইলেন, সরকারের উপর আস্থা হারাইলেও ব্রিটিশ জাতির উপর আমরা এখনো আস্থা হারাই নাই। আমরা আশা করি, আমাদের স্বায়ত্ত শাসনাধিকারের মধ্য দিয়াই আমরা ব্রিটিশ জাতির নিকট হইতে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে

পারিব! শেষ পর্য্যন্ত গান্ধীজীর অভিমতই মহাসভার অধিকাংশ সদস্য গ্রহণ করিলেন।

রাজনীতির মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও গান্ধীজী কোনদিনই দেশের দরিদ্র চাষী-মজুরদের কথা ভুলিতে পারেন নাই। সহস্র কার্য্যের ভিতরেও তাঁহার হৃদয় যেন সর্ব্বদা চাষী ও মজুরগণের দুর্দ্দশা লাঘব করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াই ছিল।

এই সময়ে দেশের অন্যতম জননায়ক সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল গান্ধীজীর গ্রামসেবার আদর্শ অনুসারে গুজরাটের গ্রামে সেবার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সর্দ্দারজীর নিকট হইতে গান্ধীজী প্রজাদের বিপদের একটি করুণ কাহিনী শুনিয়া ব্যথিত হইযা পড়িলেন। গুজরাট প্রদেশে একটি আইন ছিল যে, অজন্মার বৎসরে সরকার প্রজাদের নিকট হইতে কর লইবেন না বা কোন করভার বৃদ্ধি করিবেন না। সেই বৎসর গুজরাটের অধিকাংশ গ্রামে ফসল একেবারেই জন্মিল না বলিলেই হয। কিন্তু শোষক সরকার নিজ ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার লালসায আইনের দোহাইও মানিলেন না, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত চাষী ও গ্রামবাসীদের কাতর প্রার্থনাতেও কর্ণপাত করিলেন না। জোর করিয়া, ভয় দেখাইয়া খাজনা আদায করিতে উদ্যত হইলেন। গুজরাটের বরদৌলী গ্রাম হইতে সর্দ্দার প্যাটেল ও অন্যান্য সমাজসেবীগণ এই বিষয় গান্ধীজীকে জানাইয়া এই সঙ্কটে একটা সন্তোষজনক প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন।

ব্যথিত গান্ধীজী জানাইলেন—'যাহাকে অসত্য ও অন্যায় বলিযা মনে করেন, তাহাকে কদাচ স্বীকার করিবেন না। সেই অসত্যের বিরুদ্ধে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ভীকভাবে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবেন, সেই অসত্যের সহিত পরিপূর্ণ-ভাবে অসহযোগ করিবেন, সেই অসত্যকে অহিংসার সহিত, সংযমের সহিত, নিরুপদ্রবতার সহিত প্রতিরোধ করিলেন। সরকারের কর আদায় যদি অসত্য ও অন্যায় বলিয়া মনে করেন, তবে গ্রামবাসীগণ সরকারকে জানাইয়া দিবেন,

এই অন্যায় কর তাঁহারা স্বেচ্ছায় দিবেন না, বরং এই শোষণ বন্ধ করিবার জন্য সত্য দাবী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তাঁহারা সত্যাগ্রহ করিবেন।'

গান্ধীজীর প্রেরণায় ও উপদেশে সর্দারজী ও লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী (বরদৌলী ও অন্যান্য গ্রাম) উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। গ্রামবাসীদের লইয়া সর্দারজী সরকারের কর আদায়ের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক ও বিরাট সত্যাগ্রহ স্বুরু করিযা দিলেন। সরকারও সর্ব্বশক্তি প্রযোগ করিয়া এই সত্যাগ্রহকে দমন করিতে উদ্যত হইলেন।

সরকারী কর্ম্মচারীগণ লক্ষ লক্ষ চাষীকে প্রহার করিতে লাগিল, চাষীদের ঘরের দ্রব্যাদি টানিয়া বাহির করিল, প্রকাশ্য নিলামে তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিতে লাগিল।

কিন্তু চাষীগণ অচল অটল রহিলেন। একদিকে অহিংস আত্মা দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া অথচ প্রশান্ত ক্রোধবিহীন অন্তর লইযা অত্যাচার ও পীড়ন সহ্য করিতে লাগিল, অন্যদিকে হিংস্র দুরাত্মার দল পীড়ন ও শাসনের দম্ভে মত্ত হইযা উঠিল।

বরদৌলীর করুণ ও বীরত্বপূর্ণ কাহিনী সমগ্র ভারতবর্ষকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। ভারতের কোটি কোটি জনসাধারণ নিপীড়িত ভাই-ভগিনীদের জন্য ব্যাকুল ও চঞ্চল হইযা উঠিলেন। অবশেষে অহিংসা ও সংযমের অস্ত্রে সরকারের আগ্নেয়াস্ত্র পরাজিত হইল, চাষী-ভাইদের মৃত্যুপণ-সঙ্কল্পের কাছে সরকার নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। সরকার বিব্রত হইয়া গ্রামবাসী-দের করভার রহিত করিলেন। গান্ধীজীর অহিংসার ক্ষমতা যে শোষণকারী সরকার অপেক্ষাও শক্তিশালী ইহা আর একবার নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল। ব্যথিত গান্ধীজী চাষীদের দুঃখ কতকটা দূর হইল দেখিযা তৃপ্ত ও তুষ্ট হইলেন।

এই সব ছোটখাট স্থানীয় বিষযে আপোষ করিলেও সরকার ভারতের মূল ও বৃহত্তর বিষয়ে কোন প্রতিকার করিলেন না। সরকার কোন সদিচ্ছার আগ্রহই দেখাইলেন না। বরং সদম্ভে প্রচার করিলেন, সাইমন কমিশনের

রিপোর্ট অনুসারে পার্লামেণ্ট যে শাসন-সংস্কার ঘোষণা করিবেন, ভারতবাসীগণকে উহাই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার বেশী সরকার আর কিছু করিতে পারিবেন না।

কিন্তু সরকার কিছু করিতে না পারিলেও ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত প্রতীক ভারতের জাতীয় মহাসভা একটা কিছু করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সরকারের সিদ্ধান্ত জানিতে পারিয়া মহাসভা ১৯২৮ সালে কলিকাতায় একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিলেন। ঐ অধিবেশনে 'নেহেরু রিপোর্টকে'ই ভারতবাসীর একমাত্র দাবী বলিয়া পুনরায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল এবং 'নেহেরু রিপোর্ট' অনুসারে অবিলম্বে ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দিবার জন্য ইংরাজ-সরকারের নিকট দাবী করা হইল।

কলিকাতার প্রস্তাবে সরকারকে জানাইয়া দেওয়া হইল—"রাষ্ট্রিক অবস্থার গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যদি ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে এই গঠনতন্ত্রে (নেহেরু রিপোর্ট) সম্পূর্ণ সম্মতিদান না করেন, তাহা হইলে কংগ্রেস ইহাকে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু এই তারিখে বা ইহার পূর্ব্বে যদি এই গঠনতন্ত্র অগ্রাহ্য করা হয়, তাহা হইলে কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সুরু করিয়া ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিতে বা অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিতে দেশবাসীকে নির্দ্দেশ দিবেন।"

কিন্তু এই সময়ে এই সঙ্গে জাতীয় মহাসভা আরও কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিলেন, যাহার জন্য এবার আর বামপন্থীদল বিশেষ কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলেন না, বরং তাঁহারাও এবার সমবেতভাবে মহাসভার প্রস্তাবকে সমর্থন করিলেন। মহাসভা বামপন্থী দলের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শকেও স্বীকার করিলেন এবং সিদ্ধান্ত করিলেন, নেহেরু রিপোর্টের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রয়োজন হইলে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রচারকার্য্যের পক্ষেও কোন বাধা সৃষ্টি করা হইবে না।

স্বাধীনতার সঙ্কল্প ছাড়াও মহাসভা আরও কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

প্রস্তাবে মহাসভা দেশবাসীগণকে মাদকদ্রব্যাদি বর্জ্জন করিতে অনুরোধ করিলেন, বিদেশী দ্রব্যাদি ত্যাগ করিযা স্বদেশী গ্রহণ করিতে, খদ্দর প্রচার করিতে, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিতে জনসাধারণকে অনুরোধ করিলেন। দেশের সেবাকার্য্যের জন্য কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে অর্থসাহায্য করিতেও তাঁহারা আবেদন করিলেন।

এইরূপে বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক দল শেষ পর্য্যন্ত গান্ধীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইযা উঠিলেন, বিভিন্ন দলে গঠিত জাতীয মহাসভা সম্পূর্ণভাবে গান্ধীজীর কর্ম্মসূচী গ্রহণ করিলেন। ইংরাজের কাছে চরম পত্র দেওয়া হইল, কিন্তু তাহার ফলের জন্য গান্ধীজী ও নেতাগণ অপেক্ষা করিযা কালহরণ করিতে চাহিলেন না। তাঁহারা সময থাকিতেই দেশকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিযা তুলিতে লাগিলেন। বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের ভিতর দিয়া—স্বদেশী, ও খাদি প্রচারের ভিতর দিযা ভারতের মন যেন ভাবী সংগ্রামের জন্য তৈযারী হইতে লাগিল।

সরকার ভারতের জাতীয মহাসভার প্রস্তাবের কোন জবাব ত দিলেনই না, অধিকন্তু শাসন ও পীড়নের গতিকে আরো বাড়াইযা তুলিলেন। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ সৃষ্টি করিয়া বহু গণ্যমান্য নেতার গৃহ খানাতল্লাসী করা হইতে লাগিল, বহু নেতাকে কারারুদ্ধ করা হইল। সরকার বহু ষড়যন্ত্র মামলার সৃষ্টি করিলেন। অনেক দেশব্রতী যুবককে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত করিযা তাহাদের মৃত্যুদণ্ড দিতে লাগিলেন।

লাহোরে ভগৎ সিং প্রভৃতি কয়েকজন বিপ্লবী মৃত্যুদণ্ড লাভ করিলেন। ভারতের যুবকদল চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। গান্ধীজী বিশেষ বিনীতভাবে এইসব যুবকদের ক্ষমা করিবার জন্য বড়লাটকে পত্র দিয়া অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বড়লাট এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসী হইয়া গেল।

সরকারের এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে গান্ধীজী যেন সরকারের প্রতি শেষ বিশ্বাস-

টুকুও হারাইযা ফেলিলেন, অত্যন্ত বেদনার সহিত অথচ স্থির সঙ্কল্পের সহিত আপনার সত্য পথে চলিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

এই সময়ে আর একটি এমন ঘটনা ঘটিল, যাহার ফলে গান্ধীজীর ও ভারতের জনসাধারণের ইংরাজের প্রতি বিশ্বাসের ক্ষীণ রশ্মিটুকুও চিরতরে নিভিয়া গেল।

১৯২৯ সালের মধ্যভাগে ভারতবাসীগণকে শান্ত করিবার জন্য বড়লাট আরউইন ঘোষণা করিলেন, ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য শীঘ্রই ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এক স্বায়ত্তশাসনমূলক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু স্বয়ং ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট বড়লাটের এই ঘোষণার প্রতিবাদ করিয়া জানাইলেন, ভারতের জন্য শীঘ্র তাঁহাদের কোন শাসনতন্ত্র রচনা করিবার ইচ্ছা নাই।

ইংরাজের ধাপ্পায় ভারতের আত্মা যেন 'মরিযা' হইয়া উঠিল। ভারতের ক্রোধের এই অভিব্যক্তি ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় মহাসভার লাহোর অধিবেশনে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইল। জাতীয় মহাসভা এই অধিবেশনে স্বায়ত্তশাসনের আপোষমূলক প্রস্তাবকে পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। লাহোর অধিবেশনের সভাপতি তরুণ নেতা পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু খোলাখুলিভাবে জানাইলেন, ভারতবর্ষ অহিংসার প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বাস রাখিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য দাবী করিতেছে। এই দাবী পূর্ণ না হইলে জাতীয় মহাসভা ১৯২৮ সালের কলিকাতা অধিবেশনের প্রস্তাব অনুসারে অবিলম্বে বিরাট, ব্যাপক ও চরম অহিংস সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে।

জাতীয় মহাসভা আরো স্থির করিলেন যে, এই আইন-অমান্য সংগ্রামের কর্ম্মসূচী রচনা করিবার জন্য সমস্ত ভার ও দায়িত্ব গান্ধীজীর উপর সমর্পণ করা হইল এবং এই আইন-অমান্য পরিচালনার সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকার গান্ধীজীর উপর প্রদান করা হইল। দেশবাসী তাঁহার সত্য ও অহিংসাকে অনুসরণ করিতে আগ্রহান্বিত জানিয়া গান্ধীজীও জাতীয় মহাসভা প্রদত্ত এই দায়িত্ব প্রশান্তমনে

গ্রহণ করিলেন। তিনি আইন-অমান্য বিষয়ে আরো গভীরভাবে চিন্তা করিয়া উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ১৯৩০ সালের ১৪ই, ১৫ই ও ১৬ই তারিখে তাঁহার আমেদাবাদের সবরমতী আশ্রমে জাতীয় মহাসভার কার্য্য-পরিচালক সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিলেন।

ইতিমধ্যে জাতীয় মহাসভার অনুজ্ঞামত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আড়ম্বরের সহিত প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হইল। প্রত্যেকটি স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী গান্ধীজীর ও নেতাগণের রচিত স্বাধীনতার সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করিল অন্তরকে ও বিবেককে সত্য অধিকারের জন্য সজাগ ও প্রস্তুত করিয়া তুলিলেন।

মহাসভার কার্য্যকরী সমিতির সভ্যবৃন্দ গান্ধীজীর বিনীত আহ্বানমত সবরমতীতে মিলিত হইলেন। বিশেষ পরামর্শ ও আলোচনার পর স্থির হইল—গান্ধীজী তাঁহার আশ্রমবাসী সত্যাগ্রহীগণকে লইয়া সর্ব্বপ্রথমে আইন অমান্য করিবেন। পরে প্রয়োজন হইলে সমগ্র দেশবাসী এই আইন-অমান্যে যোগদান করিবেন। গান্ধীজী ও কার্য্যকরী সমিতি তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত জাতীয় মহাসভাকে জানাইলেন। ইহার সঙ্গে আরো জানাইলেন, জনসাধারণ যেন পরিপূর্ণভাবে এই আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। ভারতবাসীগণ যেন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলি হইতে পদত্যাগ করেন, সমস্ত সরকারী কর্ম্ম ও পদ পরিত্যাগ করেন।

ভারতীয় মহাসভা গান্ধীজীর কর্ম্মসূচী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিলেন, আবার বিশেষ প্রস্তাব দ্বারা গান্ধীজীকে আইন-অমান্য সংগ্রাম পরিচালনা করিবার অধিকার প্রদান করিলেন।

পঞ্চাশ

- ১৯৩১-এর আইন-অমান্য সংগ্রাম

সত্যাগ্রহী মহামানব শত্রুকে···প্রতিদ্বন্দ্বীকেও অকপটভাবে হৃদয়ের সত্য ও সঙ্কল্পকে জানাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ১৯৩০-এর ২রা মার্চ্চ গান্ধীজী বড়লাট লর্ড আরউইনকে পত্র দ্বারা জানাইলেন—"ইংরাজ সরকারের শোষণ ও বঞ্চনা সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়কে নৈরাশ্যে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। ভারতবাসী মনে করে, তাহাদের দেশকে পরিচালনা করিবার যোগ্যতা তাহারা অর্জ্জন করিয়াছে, আর সেই যোগ্যতাবলেই তাহারা বিদেশী সরকারকে তাহাদের দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। আত্মশাসনাধিকার লাভ করিবার জন্য তাহারা আজ সকল দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা হাসিমুখে বরণ করিতে প্রস্তুত আছে। আর দমনের যন্ত্রণা তাহাদিগকে বেশী কি পীড়ন করিবে ? কারণ, দৈনন্দিন শাসনের অত্যাচার ও অনাচারের মধ্য দিয়া তাহারা যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে তাহার তুলনায় তাহারা জেলখানার শাস্তিকেও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করিতেছে। তাহারা আজ বুঝিয়াছে যে সমস্ত দেশটাই একটা জেলখানা। আইনবলে এদেশে যাহা চলে, তাহা বৃটিশ শাসকদের ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়।

"ভারতবাসীগণ তাই আজ আত্মশাসনাধিকার লাভের জন্য ইংরাজের গঠিত শান্তি ও শৃঙ্খলাকে ভঙ্গ করা এবং আইন-অমান্য করাকে একটা নৈতিক ও পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। ভারতবাসীর হইয়া এই কর্ত্তব্যকে আজ আমি আপনার নিকট জ্ঞাত করিলাম।"

অতঃপর কোন্ বিষয় লইয়া আইন-অমান্য করিবেন তাহা গান্ধীজীই স্থির করিলেন। বিশেষ চিন্তার পর তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তিনি সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজ সরকারের রচিত লবণ আইন ভঙ্গ করিবেন।

এখন আমাদের মনে হয়ত প্রশ্ন জাগিতেছে—ইংরাজ সরকারের বিধিবদ্ধ

এত আইনের মধ্যে তিনি শেষ পর্য্যন্ত লবণ আইনকে অমান্য করিতে উদ্যত হইলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিবার আগে আমরা লবণ আইনের ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে প্রথমে জানিয়া লইব। ইংরাজ শাসনের প্রথম যুগে ইংরাজ বণিকগণ ভারতের জিনিস বিলাতের এবং পৃথিবীর বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য জাহাজ বোঝাই করিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু মাল নামাইয়া জাহাজ যখন আবার ভারতে যাত্রা করিত, তখন প্রায়ই খালি জাহাজ লইয়া আসিতে হইত। কিন্তু খালি জাহাজ আনিতে অর্থের বিশেষ ক্ষতি হইত। অগত্যা বণিকগণ আসিবার জাহাজে মাটি ভর্ত্তি করিয়া আনিত। ঐ মাটি দ্বারা কলিকাতার একটি খাল ভরাট হইল এবং ঐ খাল ভরাট করিয়া একটি রাস্তা প্রস্তুত করা হইতে লাগিল (ঐ রাস্তাটি রেড রোড্ নামে কথিত)। কিন্তু বণিকগণ বুঝিতেছিলেন, ঐ মাটি আনয়ন করা বাণিজ্য-জাহাজের কাজও নয় বা উহাতে কোন লাভেরও আশা নাই। তখন বণিক-সম্প্রদায় যুক্তি করিয়া স্থির করিল, আসিবার সময়ে জাহাজে করিয়া এমন কিছু আনিতে হইবে, যাহা এই ভারতবর্ষে বিক্রয় করা চলিবে এবং যাহা দ্বারা বণিকগণ লাভবান হইবে। তখন স্থির হইল যে, বিলাতী লবণ জাহাজে ভর্ত্তি করা হইবে এবং উহা ভারতে আনিয়া সস্তায় বিক্রয় করা হইবে।

বাণিজ্য জাহাজে করিয়া লবণ আনিয়া ভারতের বাজারে সস্তায় উহা বিক্রয় করা হইতে লাগিল। যাহাতে ভারতীয়গণ বিলাতী লবণ কিনিতে বাধ্য হয়, সেইজন্য ভারতের দেশীয় লবণের উপর কর বসান হইল। ফলে দেশী লবণের মূল্য বিলাতী লবণ অপেক্ষা বাড়িয়া গেল, আর দরিদ্র ভারতবাসী বাধ্য হইয়া বিলাতী লবণ কিনিতে লাগিল।

এখন আমরা লবণ আইন রচনার এই ঐতিহাসিক তথ্যের দ্বারাই জানিতে পারিতেছি, গান্ধীজী কেন লবণ আইন অমান্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

গান্ধীজী বলিলেন—অন্ন, বস্ত্র ও জলের মত লবণ মানুষের নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রী। ইহা মানুষের প্রতিদিন প্রয়োজন, কিন্তু এই দরিদ্র দেশের দরিদ্র

মানুষের এই প্রতিদিনের অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর কর ধার্য্য করা চরম অমানুষিক আচরণ। অতএব আমি দরিদ্র ভারতবাসীর প্রতিনিধিস্বরূপ এই মিথ্যা ও অন্যায় শোষণমূলক আইনকে সর্ব্বাগ্রে অমান্য করিব। এই আইন-অমান্যের কাজকে দারিদ্র্য-মোচনের একটা অন্যতম উপায় বলিযা গণ্য করিব।

গান্ধীজী প্রস্তুত হইলেন, গান্ধীজীর আদর্শের অনুগামী হইবার জন্য ভারতের জনসাধারণও প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। গান্ধীজী সহকর্ম্মীগণের সহিত আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন, ডাণ্ডীর সমুদ্রোপকূলে যাইয়া সমুদ্রজল ফুটাইয়া লবণ প্রস্তুত করিবেন, সাধারণের প্রতি সরকার-কর্ত্তৃক লবণ প্রস্তুতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিবেন।

সবরমতী হইতে ডাণ্ডীর উপকূল প্রায় দুইশত মাইল। গান্ধীজী এই বিরাট পথ অতিক্রম করিবার জন্যও এক নূতন আদর্শ অবলম্বন করিবেন বলিযা সিদ্ধান্ত করিলেন। তিনি স্থির করিলেন, তিনি সঙ্গী সত্যাগ্রহীদের সহিত পদব্রজে যাত্রা করিবেন। দীর্ঘপথ অতিক্রম করিবার সময়ে পথপ্রান্তের গ্রামগুলিতে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম লইবেন, গ্রামের দরিদ্র ও শান্ত গ্রামবাসীদের নিকট অহিংসা, প্রেম ও চরকার বাণী প্রচার করিবেন, সত্যাগ্রহের আদর্শ শিক্ষা দিবেন, গ্রাম ও সমাজ-সংগঠনের বিষযে পরামর্শ দিবেন।

শুভ-যাত্রার দিন নির্দ্ধারিত হইল।

১২ই মার্চ্চ প্রাতঃকাল। সূর্য্য তাহার সোনালী কিরণধারা আশ্রমের চারিদিকে ঢালিয়া দিয়াছেন। আশ্রমে মঙ্গলশঙ্খ বাজিযা উঠিল। শুভ্র খদ্দরে মণ্ডিত মুণ্ডিতমস্তক অহিংসার পূজারী মুক্তি-সংগ্রামের সেনাপতি, ধীরে ধীরে আশ্রমের বাহিরে আসিলেন। মুখে তাঁহার মৃদু হাসি, অঙ্গে তাঁহার সংযমের জ্যোতি।

তাঁহার পিছনে আসিলেন ঊনআশীজন আশ্রমবাসী সত্যাগ্রহী, চক্ষে তাঁহাদের আনন্দের আলো, বক্ষে তাঁহাদের দুর্জ্জয সঙ্কল্প!

ঊনআশীজন আশ্রমিকের সহিত গান্ধীজী যাত্রা করিলেন সুদূর ডাণ্ডীর উপকূলে।

সত্যাগ্রহীর দল অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে পড়িল কত গ্রাম। প্রতিটি গ্রামের লোক কাতারে-কাতারে পথের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, অহিংসার বাণী শুনিল, সত্যের মন্ত্র শুনিল, সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের কৌশল জানিতে চাহিল।

হাসিমুখে গান্ধীজী বলিলেন—'ইংরাজের গড়া অন্যায় আইনকে মানিবেন না, কিন্তু ইংরাজকে ভালবাসিবেন। কর্ত্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা মান্য করিবেন না, কিন্তু কর্তৃপক্ষকে শ্রদ্ধা করিবেন। যে শাসন আমাদের শোষণ ও পীড়ন করিতেছে সেই শাসনকে উচ্ছেদের জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিবেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিবেন, অহিংস-প্রতিরোধের দ্বারা, অহিংস-অবজ্ঞার দ্বারা এই শাসনকে ধ্বংস করিবেন। সংগ্রাম করিবার জন্য সত্যের অস্ত্রে সজ্জিত হইবেন। মনে রাখিবেন সত্য, ন্যায় ও ধর্ম্মই শেষ পর্য্যন্ত মিথ্যা, অন্যায় ও অধর্ম্মের উপর জয়লাভ করিবে। শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া নিজে যন্ত্রণাকে, দুঃখকে, কষ্টকে সর্ব্বাগ্রে বরণ করিবেন, যন্ত্রণা সহ্য করিয়া অধিকতর যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবেন, বিশুদ্ধ ও অকপট অন্তর লইয়া নিজ আদর্শে ও কর্ম্মে অটল ও অচল থাকিবেন। তবেই জগতের পাশবিক শক্তি আপনাদের আত্মার কাছে পরাজিত হইবে, আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে।'

অপূর্ব্ব এই উপদেশ। মধুর এই বাণী। রাজনীতির সহিত ধর্ম্মের এই সংমিশ্রণ গান্ধীবাদকে জগতের চক্ষে মহান ও অভিনব করিয়া তুলিয়াছে। আমরা বলিব, গান্ধীজীর শ্রেষ্ঠত্বই এইখানে, রাজনীতির সহিত ধর্ম্মের এই অপূর্ব্ব অথচ স্বাভাবিক মিলনের পন্থায়।

ভারত যখন হিংসার অস্ত্রে বিদেশী-শাসন-মুক্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, সেই অন্ধকার মুহূর্ত্তে ভারতের বুকে এই মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। তিনি ভারতবাসীকে শুনাইয়াছিলেন, হিংসা দ্বারা শাসককে দূর

করিতে গেলে শাসকও হিংসাত্মক অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া প্রতিশোধ লইবে। কিন্তু অহিংস শক্তি দ্বারা, সত্য ও ধর্ম্মের দ্বারা শাসককে আঘাত করিলে, শাসকের হাতের ধাতুর অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, হিংসার অস্ত্র আপনা হইতে খসিয়া পড়িবে, শাসক অস্ত্রাঘাত করিতে করিতে অবসন্ন ও ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, ভারতবাসীকে দুঃখ দিয়া শাসকের মনে দুঃখ জাগিবে। তখন শাসকদল স্বেচ্ছায় পরাজয় বরণ করিয়া ভারত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। কি অপূর্ব্ব ভবিষ্যদ্বাণী লুক্কায়িত ছিল তাঁহার সাধনার মধ্যে—তাঁহার আদর্শের মধ্যে, ভারতবাসী আজ তাহা বুঝিতে পারিতেছে।

রাজনীতির মধ্যে এই ধর্ম্মভাব সঞ্চার করার জন্যই অসংখ্য ইংরাজ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমন দেখা যাইত, একদিকে ইংরাজ সরকার তাঁহাকে দমন করিবার জন্য আয়োজন করিতেছেন, আবার সেই সময়েই বেসরকারী ইংরাজ সুধী ও মনীষীগণ তাঁহার দর্শনলাভের জন্য, তাঁহার বাণী শুনিবার জন্য ভারতবর্ষে ছুটিয়া আসিতেছেন, বিলাতে ফিরিয়া সরকারের দমন নীতির প্রতিবাদ করিতেছেন।

গান্ধীজীর রাজনীতির সহিত ধর্ম্মনীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। তাই তাঁহার রাজনীতি বিশ্ববাসীর বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার এই অভিনব রাজনীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মনীষী রোঁমা রোঁলা লিখিয়াছেন—'তিনি রাজনীতিক, নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই'।

মহাত্মা তাঁহার রাজনীতিকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান করিয়া প্রত্যেকটি গ্রামবাসীকে, প্রত্যেকটি ভারতবাসীকে প্রস্তুত হইবার জন্য আহ্বান জানাইলেন।

গ্রামের লোক তাঁহাদের ধার্ম্মিক সেনাপতিকে বরণ করিবার জন্য, অভিনন্দন জানাইবার জন্য শঙ্খ বাজাইলেন, ফুলের মালা উপহার দিলেন, সমবেত কণ্ঠে রব তুলিলেন—'গান্ধীজীকি জয়'।

হাসিমুখে গান্ধীজী মাথা নত করিলেন। অভিনন্দনের উত্তরে বলিলেন—'বলুন ভারতবর্ষের জয়, আর এই জয় শুধু সমবেত-কণ্ঠে ঘোষণা করিলেই আমরা

স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব না। এই স্বাধীনতা-লাভের জন্য আমাদের সমবেত-ভাবে পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতে হইবে, আমাদের গ্রামের সংগঠনের জন্য অগ্রসর হইতে হইবে, সমাজের জঘন্য অস্পৃশ্যতা পাপ দূর করিতে হইবে, ঘরে ঘরে চরকা ও খাদির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ভারতের উৎপন্ন দ্রব্যে আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, আমাদের সনাতন ধর্ম্মকে আবার গৌরবের আসনে স্থাপিত করিতে হইবে।'

ভারতবাসীগণ পবিত্র হইলেন, পথ পাইলেন, শক্তি পাইলেন, সেনাপতির আদেশ পালনের জন্য দিকে দিকে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

ধর্ম্মের সঙ্গে পাশবিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হইল। এই সংঘর্ষে ধর্ম্ম আরো উজ্জ্বল ও শক্তিশালী হইতে লাগিল। গান্ধীজীর ভ্রান্তিহরা বাণীতে সকলের আত্মচেতনা-বোধ জাগিতে লাগিল।

সত্যপথের পরিব্রাজক গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলেন। পঁচিশ দিন ভ্রমণের পর ৫ই এপ্রিল ডাণ্ডীর সাগরতীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

গান্ধীজী বলিলেন—"বৃটিশ শাসন সকল দিক হইতে ভারতভূমির সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে,—আমাদের নীতি, আমাদের শিক্ষা, আমাদের জাতীয়তা, আমাদের ধর্ম্মবাদ, সমস্ত কিছুই ধ্বংস করিতে বাকী রাখে নাই। আজ এই শাসনকে আমি একটি অভিশাপ বলিযা মনে করি। সেইজন্য ভারতের জাতীযতার পক্ষে ক্ষতিকর এই অভিশাপকে ভারতের ক্ষেত্র হইতে মুছিযা ফেলিবার জন্য আমি পথে বাহির হইয়াছি, আমি সত্যাগ্রহীর জীবন গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের এই আইন-অমান্যের সংগ্রাম এই অভিশাপ-মোচনের সংগ্রাম।"

* * *

গান্ধীজী সকলের আগে সাগরে নামিলেন, পাত্রে করিয়া জল ভরিয়া উপরে আসিলেন। আগুন জ্বালিযা লবণ প্রস্তুত করিলেন। উনআশীজন সত্যাগ্রহীও লবণ প্রস্তুত করিলেন।

১৯৩১-এর আইন-অমান্য সংগ্রাম

স্বাধীনতা-যুদ্ধের সেনাপতি সর্ব্বপ্রথম আইন-অমান্য সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন।

এইবার সেনাপতির আদর্শে ভারতের সর্ব্বত্র আইন-অমান্য সংগ্রাম সুরু হইয়া গেল। ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশের কোটি কোটি জনসাধারণ দিকে দিকে লবণ-আইন ভঙ্গ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র উৎসাহ, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষার পরীক্ষা সুরু হইল। বাংলাদেশেও উৎসাহ ও উদ্যমের বাণ ডাকিল। দেশের নারীগণ পর্য্যন্ত সংগ্রামে অবতীর্ণা হইলেন, লবণ প্রস্তুত করিয়া ঘরে ঘরে বিতরণ ও বিক্রয় করিতে লাগিলেন।

নেতারা একে একে গ্রেপ্তার হইলেন। পণ্ডিত মতিলাল, পণ্ডিত জহরলাল, পণ্ডিত মালব্য, সর্দ্দার বল্লভভাই, শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীরাজাগোপাল আচারী, শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি শাসকের লৌহকারার অন্তরালে প্রেরিত হইলেন। সাধারণ লোকের উপর অত্যাচার চলিতে লাগিল। সত্যাগ্রহীরা প্রহার লাভ করিল, বেয়নেটের আঘাত পাইল, পদাঘাত বরণ করিল। স্ত্রীলোকগণ অপমানিতা হইলেন, প্রহৃতা হইলেন। কিন্তু ভারতবর্ষ অহিংসার আদর্শে অচল ও অটল রহিল। ভারতবর্ষ আরো দৃঢ় সঙ্কল্পে লবণ-আইন অমান্য করিতে লাগিল।

লবণ আইন ভঙ্গ হইল।

এইবার গান্ধীজী আরো ব্যাপক সংগ্রামের পন্থা গ্রহণ করিলেন। তিনি স্থির করিলেন, তিনি সরকারের লবণের গোলার লবণ অধিকার করিবেন, কারণ লোকের নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রী দখল করিয়া লোককে শোষণ করিবার নৈতিক অধিকার সরকারের নাই।

নির্দ্দিষ্ট দিনে গান্ধীজী গুজরাটের ধরসনা ও চরসদা নামক দুইখানি গ্রামের সরকারী লবণ-গোলা আক্রমণ করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু আক্রমণের আগে তিনি আবার অহিংস সত্যাগ্রহীর ধর্ম্ম পালন করিলেন। বড়লাটকে তাঁহার আক্রমণের উদ্দেশ্য ও সময় পত্রদ্বারা স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দিলেন।

গান্ধীজী প্রস্তুত হইলেন। ব্যবস্থা করিলেন, যদি সরকার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন, তাহা হইলে সত্যাগ্রহের কাজ বন্ধ থাকিবে না। নূতন নেতা আসিয়া সংগ্রাম পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবেন।

সরকারও এবার তাঁহাদের মনস্থির করিলেন। লবণ-গোলা আক্রমণের পূর্ব্বেই ৫ই মে তারিখে ভারতের সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের সর্ব্বাধিনায়ক গ্রেপ্তার হইলেন।

কিন্তু সত্যাগ্রহ বন্ধ হইল না।

শ্রদ্ধেয় নেতা আব্বাস তায়েবজী গান্ধীজীর স্থান অধিকার করিলেন। সত্যাগ্রহীদের লবণ-গোলা অভিযানে আদেশ দিলেন।

সত্যাগ্রহীরা মুক্তির গান গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইলেন। শ্রদ্ধের তায়েবজীও গ্রেপ্তার হইলেন। তথাপি অভিযান বন্ধ হইল না। শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু আসিয়া অভিযান পরিচালনা করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী নাইডুও গ্রেপ্তার হইলেন। কিন্তু সত্যের অভিযান, অহিংসার অভিযান পূর্ণ গতিতে চলিতে লাগিল।

সত্যাগ্রহীর দল নূতন নূতন নেতা বাছিয়া লইতে লাগিলেন। নবীন উৎসাহে দুর্ব্বার বেগে অগ্রসর হইলেন।

পুলিশ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, চরম হইয়া উঠিল। সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করিল। দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া লাঠি চালাইতে লাগিল, বেয়নেটের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল।

সত্যের সেবকগণ প্রহৃত হইলেন, আহত হইলেন, কিন্তু নিজেরা আঘাত করিলেন না। হাস্যমুখে, নির্ব্বিকার ভঙ্গিতে, নির্ভীক হৃদয়ে 'বন্দে মাতরম্' গান গাহিতে গাহিতে লবণ গোলার দিকে চলিতে লাগিলেন।

অহিংসার—সত্যের এই অপূর্ব্ব সংগ্রামের কাহিনী শুনিয়া সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হইল, বিস্মিত হইল।

জগতের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীগণ এই সংগ্রাম দেখিবার জন্য ধরসনায়

ছুটিয়া আসিলেন। বিদেশী সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ এই দৃশ্য দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের রিপোর্ট...সত্যাগ্রহের কার্য্য ও মাহাত্ম্য সমগ্র জগতের অধিবাসী আগ্রহের সহিত পড়িতে লাগিলেন।

ইংরাজ রিপোর্টার 'ওয়েব মিলার' এই দৃশ্য দেখিয়া এই সম্বন্ধে লিখিলেন— 'ধরসনার সামনে দাঁড়াইয়া লবণ-গোলা আক্রমণের দৃশ্য দেখিতেছি, মাঝে মাঝে উহা এতই বেদনাদায়ক হইয়া উঠিতেছে যে আর দেখিতে পারিতেছি না, অন্তদিকে মুখ ফিরাইয়া লইতেছি। স্বেচ্ছাসেবকেরা পুলিশের হাতে মার খাইতেছে, কিন্তু তাহারা ইহাতে এতটুকু ক্রোধ বা হিংসা প্রকাশ করিতেছে না। গান্ধীজীর অহিংস নীতিতে ইহাদের বিশ্বাস দেখিয়া আমি হতবাক হইয়া যাইতেছি।'

জর্জ শ্লোকাম্ব নামক একজন রিপোর্টার লিখিয়াছেন,—"ওয়াদালার চারপাশ ঘিরিয়া যে পাহাড়ের সারি আছে, তাহারই একটির উপর হইতে আমি দেখিতেছিলাম। আমার আশেপাশে আরও অনেক ভারতীয় দাঁড়াইয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মুখের দিকে তাকাইতে আমার লজ্জা করিতেছিল। আমার দেশের লোকেরা শাসনের নামে যে ব্যাপার চালাইতেছে, তাহা দেখিয়া নিজেকে ইংরাজ মনে করিয়া আমার মাথা হেঁট হইয়া যাইতেছে।'

ইংরাজ সরকার করিতেছে অত্যাচার, কিন্তু সাধারণ ইংরাজের মাথা লজ্জায় নত হইতেছে। অহিংসা মানুষের হৃদয়ে তাহার প্রভাব বিস্তার করিতেছে।"

ধরসনার শক্তি সমগ্র ভারতবর্ষকে শক্তিমান করিয়া তুলিল। অত্যাচার বরণ করিয়া কর্ম্ম করিবার সাধনা জয়যুক্ত হইল। অহিংস উপায়ে আইনকে অমান্য করিবার ঝোঁক যেন সমগ্র ভারতবাসীকে পাইয়া বসিল। বাংলাতেও মহিষবাথান, মেদিনীপুর ও অন্যান্য অনেক স্থানে লবণ তৈয়ারী হইতে লাগিল। আর শুধু লবণ-আইন নহে, এবার জাতীয় মহাসভার পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুসারে ভারতবাসী অন্যান্য আইন এবং আদেশ অমান্যের কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইলেন।

সর্ব্বত্র স্বেচ্ছাসেবকগণ দলে দলে বিলাতী বস্ত্রের দোকানে, বিলাতী মদের দোকানে পিকেটিং করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসীগণ খাজনা ও চৌকিদারী ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করিলেন। বোম্বাই, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অধিবাসীগণ প্রতিজ্ঞা করিলেন, এক কপর্দ্দকও খাজনা বা চৌকিদারী ট্যাক্স সরকারকে দিব না। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্র, ও পাঞ্জাবের প্রজারা শপথ গ্রহণ করিলেন—অত্যাচারী সরকারকে ভূমিকর দিবেন না। বেরার ও আসামের গ্রামবাসীগণ বন-আইন অমান্য করিয়া সরকারের সংরক্ষিত অরণ্য হইতে গাছ কাটিয়া আনিতে লাগিলেন। আইন-অমান্যের তরঙ্গ সমস্ত ভারতে ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত হইল। কারাগারগুলি সত্যাগ্রহী দ্বারা পূর্ণ হইয়া গেল। মানুষ ধন হারাইল, প্রাণ হারাইল, মানুষ অত্যাচারিত হইল, লাঞ্ছিত হইল। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের যে উদ্দীপনা গান্ধীজী ভারতবাসীর মধ্যে জাগাইয়াছিলেন তাহা শত লাঞ্ছনা নির্য্যাতনেও নির্ব্বাপিত হইল না।

একান্ন

গান্ধী-আরউইন চুক্তি

আন্দোলন দমন করিবার জন্য বড়লাট আরউইন একটার পর একটা অর্ডিন্যান্স জারি করিতে লাগিলেন পর পর তিনি তের দফা অর্ডিন্যান্স ঘোষণা করিলেন। ভারতে সাধারণ শাসন লোপ পাইয়া অর্ডিন্যান্সের রাজত্ব চলিতে লাগিল।

বড়লাট জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিলেন। ভারতের ১৩১খানি সংবাদপত্রের নিকট হইতে দুইলক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা জামিন আদায় করা হইল। সরকার জাতীয় মহাসভার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। জাতীয় মহাসভার সমস্ত অফিস দখল করিলেন, অফিসে তালা লাগাইয়া দেওয়া হইল।

কিন্তু অহিংস-সংগ্রামে জাতি প্রতিহত হইল না।

সীমান্ত প্রদেশের পাঠানগণের হৃদযেও এই অহিংসা তাহার প্রভাব বিস্তার করিল। পাঠানগণ গান্ধীজীর অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন, দলে দলে আইন-অমান্য সংগ্রামে ঝাঁপ দিলেন, দলে দলে অত্যাচারী ও বর্ব্বর সরকারের ক্রোধবহ্নিতে আত্মাহুতি দিলেন।

ক্রমশঃ সরকারের ভারতীয সৈন্যগণও যেন অহিংসার প্রভাবে বিচলিত হইল। কর্ত্তৃপক্ষ একবার নিরস্ত্র ও অহিংস পাঠানদের এক সভায একদল ভারতীয সৈন্যকে গুলি চালাইতে আদেশ দিলেন, কিন্তু সৈন্যদল বাঁকিয়া বসিল। তাহারা বলিল, নিরীহ জনতাকে আমরা গুলি করিতে পারিব না,··· ইহার পরিবর্ত্তে আদেশ অমান্যের জন্য সরকারের শাস্তি আমরা গ্রহণ করিব।

সরকার যেন দিশাহারা হইয়া গেলেন,···বিভ্রান্ত হইযা পড়িলেন।

এত গ্রেপ্তার—এত আঘাত—এত হত্যা······তথাপি ইহারা কিসের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠিতেছে ?···

যুক্তিহারা সরকার ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন।

শেষ পর্য্যন্ত অস্ত্র-শক্তি অহিংসা শক্তির সহিত আপোষ করিতে চাহিল, পশুবল আত্মার বলের নিকট পরাজয় বরণ করিল।

বড়লাট বিশেষ প্রতিনিধি পাঠাইয়া গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আপোষের আলোচনা চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু গান্ধীজী এবং নেতাগণ বলিলেন, "মাত্র একটি সর্ত্তে আপোষ হইতে পারে। আমাদের দেশের শাসন ক্ষমতা আমাদেরই দিতে হইবে, এই যুক্তিকে স্বীকার করিয়া লইয়া কার্য্য করিতে হইবে।'

কিন্তু সরকার ক্ষমতা ত্যাগে সম্মত হইলেন না। বরং স্বাধীনতা দিবার ধোঁকা দিযা, সৎবুদ্ধি ও সদিচ্ছার ভান করিয়া জনসাধারণকে প্রতারণা করিতে চেষ্টা করিলেন। লাটসাহেব ঘোষণা করিলেন, ভারতবাসীগণকে কিরূপ ও কত বেশী শাসনাধিকার দেওয়া হইবে, সেই সমস্যা সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা করিবার জন্য সরকার ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি 'গোলটেবিল বৈঠকে'র ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বৈঠকের প্রতিনিধি মনোনয়ন ব্যাপারে সরকার সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দান করিলেন। জাতীযতাবাদী ভারতীযদিগকে বাহিরে রাখিয়াই বৈঠক গঠিত হইল।

১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর বিলাতে প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন বসিল। দীর্ঘ নয়টি সপ্তাহ ধরিযা বৈঠকে আলাপ-আলোচনা চলিল, কিন্তু কোন মীমাংসা হইল না।

মীমাংসা করিবে কাহারা?

সরকারের অনুগত ক্ষমতালোভী প্রতিনিধির দল? কে সাহস করিয়া, আত্মবিশ্বাস লইয়া বলিবে, ভারতবর্ষ আত্মমর্য্যাদা চাহে, স্বাধীনতা চাহে।

আলোচনা ব্যর্থ হইয়া গেল।

ভারতের আন্দোলন ও সংগ্রামের বেগ তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি

অতঃপর সরকার দায়ে পড়িয়া কারারুদ্ধ নেতাদের ও গান্ধীজীর শরণাগত হইলেন। নেতারা বলিলেন, কারাগারের বদ্ধ বাতাসের মধ্যে সন্ধির আলোচনা চলিতে পারে না। অগত্যা বিব্রত সরকার গান্ধীজীকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি প্রদান করিলেন, গান্ধীজীর সহিত আরও অনেক নেতা মুক্তিলাভ করিলেন।

গান্ধীজী বাহিরে আসিলেন। বলিলেন, 'অহিংস সত্যাগ্রহী অনুতপ্তকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছে। আমি দেখিব সরকারের মনের কতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে।'

বড়লাট আপোষ আলোচনা চালাইবার জন্য গান্ধীজীকে তাঁহার প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিলেন। শান্তির অগ্রদূত অশান্তির মধ্য হইতে শান্তি আনিবার জন্য বড়লাটের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। ১৯৩১ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী বড়লাটের প্রাসাদে গমন করিলেন।

পনর দিন ধরিয়া ইংরাজের প্রতিনিধির সহিত ভারতবর্ষের প্রতিনিধির আলোচনা চলিল। গান্ধীজী বলিলেন, শাসন-সমস্যার সমাধান করিবার আগে সরকারকে তাহার সকল প্রকার দমননীতি ও কুশাসন প্রত্যাহার করিতে হইবে। সরকারকে সদ্‌বুদ্ধি ও সদিচ্ছাব ভণ্ডামী পরিত্যাগ করিযা প্রকৃত সদিচ্ছার আগ্রহ দেখাইতে হইবে।

বড়লাট গান্ধীজীর সর্ত্ত অনুসারে কাজ করিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু সরকারপক্ষ হইতে তিনি জানাইলেন, জাতীয মহাসভা ও গান্ধীজীকে আইন-অমান্য-আন্দোলন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

গান্ধীজী জানাইলেন, জাতীয় মহাসভার নিকট তিনি এই বিষযে অনুরোধ করিবেন। তিনি আশা করেন, মহাসভা তাঁহার অনুরোধ পূর্ণ করিবেন। তিনি ইহাও জানাইলেন যে, মহাসভা তাঁহাকে যে সর্ব্বাধিনাযকত্বের ক্ষমতা দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাবলে তিনি বড়লাটের সহিত সন্ধি করিবেন। পরে ইহা তিনি মহাসভায পেশ করিবেন।

উভয় পক্ষই আপোষে স্বীকৃত হইলেন। উভয়ের মতামত অনুসারে ১৯৩১ সালের ৪ঠা মার্চ্চ সন্ধিপত্র রচিত হইল।

সর্ত্ত অনুসারে সরকার দমননীতি প্রত্যাহার করিলেন, অর্ডিন্যান্সগুলি প্রত্যাহার করিলেন। নেতাগণকে ও সত্যাগ্রহীগণকে মুক্তি দিলেন। জাতীয় মহাসভার সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইলেন। ভারতে শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলেন।

সর্ত্ত অনুসারে সরকার আরও জানাইলেন, সমুদ্রের উপকূলের অধিবাসীগণ লবণ প্রস্তুত করিতে বা বিক্রয় করিতে পারিবেন, এবং সাধারণ ভারতবাসী নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য লবণ প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

এইরূপে দরিদ্র ভারতবাসীর লবণ সংগ্রহের দাবীটুকু বিদেশী সরকার পূর্ণ করিলেন,······গান্ধীজীর লবণ-সত্যাগ্রহের মর্য্যাদা রক্ষিত হইল।

গান্ধীজীর প্রাণ ছিল যেন দরিদ্রদের জন্যই। স্বাধীনতা লাভের পরেও ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে তিনি স্বাধীন ভারত-সরকারকে দরিদ্রের নিত্য প্রয়োজনীয় লবণ হইতে সমস্ত কর তুলিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত দরিদ্র ভারতবাসীর নিকট সুলভে অন্ন, বস্ত্র ও লবণ সরবরাহের কথা তিনি ভুলেন নাই। নেতাগণকে মুক্তি দিযা সরকার জাতীয় মহাসভাকে জানাইলেন, শাসন-বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহারা আর একটি সম্মিলিত 'গোলটেবিল বৈঠকে'র ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করেন এবং ইহাতে মহাসভার প্রেরিত প্রতিনিধিকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

ইংরাজের প্রস্তাব সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্য যথাসময়ে জাতীয় মহাসভার কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন বসিল। মহাসভা বিশেষ বিবেচনা করিবার পর গান্ধীজীর আপোষের সর্ত্ত অনুমোদন করিলেন এবং দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান-বিষয়ক সরকারী প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। মহাসভা মহাত্মা গান্ধীকে জাতীয় মহাসভার একমাত্র প্রতিনিধিরূপে মনোনীত করিলেন এবং তাঁহাকে

মহাসভার পক্ষ হইতে গোলটেবিলের আলোচনায় যোগদান করিতে অনুরোধ করিলেন।

গান্ধীজী মহাসভার প্রতিনিধি হইয়া বিলাতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ইতিমধ্যে জাতীয় মহাসভার বামপন্থী দল গান্ধীজী কর্ত্তৃক আইন-অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার জন্য গান্ধীজীর আপোষ নীতির তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন।

স্বভাবসিদ্ধ প্রশান্ত ধৈর্য্যের সহিত তাঁহার আপোষ-পন্থার কারণ গান্ধীজী তাঁহাদের জানাইলেন। তিনি বলিলেন—দেশ দরিদ্র, প্রায় দুইশত বৎসরের বিদেশী শাসনে শোষিত ও সর্ব্বস্ববঞ্চিত। বর্ত্তমান সত্যাগ্রহের জন্য দেশের অধিবাসীগণ আজ বিশেষভাবে পীড়িত। যদি আপোষের দ্বারা, আলাপ-আলোচনার দ্বারা, দেশবাসীর রক্তপাত না করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অহিংসসেবীর পক্ষে সেই পন্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তবে সত্যাগ্রহীর নিকট তাহার সত্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। তাই যদি দেখা যায়, সরকার প্রকৃত শান্তি চাহেন না, ভারতবাসীদিগকে অধিকার দান করিতে চাহেন না, তাহা হইলে আবার সত্যাগ্রহ করিতে ইতস্ততঃ করা হইবে না।

সত্যাগ্রহী হিসাবে তিনি এই সময়ে আর একটি পথ অবলম্বন করিবেন জানাইলেন। তিনি ইংলণ্ডের জনসাধারণের নিকট ভারতের বাণী শুনাইবেন, ভারতের দাবী জানাইবেন, সরকারের মিথ্যা ও অন্যায় অত্যাচারের কথা ইংলণ্ডে প্রচার করিবেন। সত্যের দ্বারা সেখানকার জনসাধারণকে সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকার করার জন্য আবেদন করিবেন।

বামপন্থীদল নীরব হইলেন। গান্ধীজীর অবলম্বিত প্রণালীর পরিণতি দেখিবার জন্য তাঁহার সমালোচনা বন্ধ করিলেন।

গান্ধীজী ১৯৩১ সালের আগষ্ট মাসের শেষে বোম্বাই বন্দরে জাহাজে উঠিলেন, বিলাতের পথে যাত্রা করিলেন।

বাহান্ন

গোলটেবিলের ফাঁকি

বিশ্বের জনগণ শুনিয়াছিল ভারতের ঋষির অহিংসার বাণী, শুনিয়াছিল সত্যাগ্রহের অপূর্ব্ব সংগ্রামের কথা, শুনিয়াছিল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথা। সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত জনসাধারণ গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের মধ্যে মুক্তির সন্ধান লক্ষ্য করিয়াছিল, দেখিয়াছিল আশার আলো!

তাই গান্ধীজীর জাহাজ যখন বন্দরে বন্দরে থামিতেছিল, তখন প্রত্যেক দেশের অধিবাসীগণ কাতারে কাতারে বন্দরে ছুটিয়া আসিল, লক্ষকণ্ঠে জয়ধ্বনি তুলিল, 'জয়তু অসহযোগের নেতা···জয়তু গান্ধীজী'!'

প্রাচ্যের শান্তি এবং বিনয়ের মূর্ত্ত প্রতীক স্নিগ্ধ আননে নত মস্তকে করজোড়ে অভিবাদন জানাইলেন বিরাট জনসঙ্ঘকে।

জাহাজ মিশরের বন্দরে থামিল।

মিশরের অধিবাসীগণ খিলাফতের সমর্থনকারী এবং সাহায্যকারী সাধারণের প্রিয় নেতাকে অভিনন্দন জানাইবার আয়োজন করিলেন। মিশরের সর্ব্বজনমান্য নেতা নাহাস পাসা জনসাধারণের পক্ষ হইতে জাহাজে আসিয়া সত্যের দূতকে অভ্যর্থনা করিলেন। অভিনন্দনে সঙ্কুচিত গান্ধীজী হাত দুইটি জোড় করিয়া বার বার ক্ষমা চাহিলেন। বলিলেন, 'আমি সাধারণের সেবক মাত্র, আমি ইহার যোগ্য নহি।'

জাহাজ থামিল মার্সাই বন্দরে। গান্ধীজী জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন। ফরাসী দেশের নেতা ও মনীষীগণ ছুটিয়া আসিলেন মহাত্মাকে দর্শন করিতে। ফরাসী দেশের বিশিষ্ট ও মহাজ্ঞানী পণ্ডিত, জগৎপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রোমাঁ রোলাঁ আসিয়া শ্রদ্ধাবনত চিত্তে প্রশস্তি-বচন উচ্চারণ করিলেন —'তুমি সেই মানুষ, যিনি ত্রিশকোটি মানুষকে কর্ম্ম প্রেরণায় জাগাইয়া তুলিয়াছেন, যিনি সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে কম্পমান করিয়া দিয়াছেন, যিনি

মানবের রাজনীতির মধ্যে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন প্রায় দুই হাজার বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান এক নীতির আন্দোলন আদর্শ।' মনীষী রোমাঁ রোলাঁ গান্ধীজীর আদর্শে ও প্রণালীতে বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গান্ধীজী পরে তাঁহার সহিত কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন এবং দুই মহাপুরুষই দুইজনকে চিনিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। গান্ধীজী সহাস্যমুখে রোলাঁকে আলিঙ্গন করিলেন।

ষ্টেশনে মহামতি এণ্ড্রুজ সাহেবও গান্ধীজীকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতে আসিয়াছিলেন। এই মহামতি এণ্ড্রুজ গান্ধীজীর আফ্রিকা-সংগ্রামের সাথী ছিলেন। ভারতেরও অনেক গঠনমূলক কাজে তিনি গান্ধীজীকে সাহায্য করিয়াছিলেন। মালাবার বিদ্রোহের সময় তিনি গান্ধীজীর পরামর্শে ও উপদেশে মালাবারের নিপীড়িত হিন্দু-মুসলমানদের যথাসাধ্য সেবা করেন। গান্ধীজী সম্বন্ধে মহামতি এণ্ড্রুজের বাণী, ভারতের মহামানবের সম্বন্ধে সৎ ও সভ্য ইংরাজগণের শ্রদ্ধার নিদর্শন!……এণ্ড্রুজ বলিয়া গিয়াছেন—"আমার মনোজগতে মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দুই মহাপুরুষের সমাবেশ কিরূপে ঘটিল? তাহার কারণ এই যে ইঁহাদের উভয়ের মধ্যেই দরিদ্রের, অভাবগ্রস্ত ও নির্য্যাতিতের প্রতি, দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানবের প্রতি সুগভীর আন্তরিকতার প্রচুর নিদর্শন পাইযাছি।

"মহাত্মা গান্ধীর জীবনের প্রথম ও গভীরতম অনুভূতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত দারিদ্য-পীড়িতকে কেন্দ্র করিয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার সহিত দক্ষিণ আফ্রিকায প্রবাসকালে তাঁহার এই মহতী সহানুভূতির পরিচয় পাইয়াছি। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে দরিদ্রের প্রতি তাঁহার করুণা সমভাবে প্রবাহিত দেখিয়াছি। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বহুবার দেখিয়াছি তামিল শিশু ও নারী পরিবৃত হইয়া তিনি অবস্থান করিতেছেন। চালানী চুক্তিবদ্ধ হতভাগ্য মজুরদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক প্রীতি কত গভীর আমি তাহা স্পষ্ট বুঝিয়াছি। আর্ত্ত মানব-মাত্রের প্রতিই তাঁহার করুণা বিদ্যমান। দারিদ্র্য-পীড়িতের প্রতি তাঁহার অনুকম্পা ও নিষ্ঠার নিদর্শন প্রকৃতপক্ষেই অতীব বিস্ময়জনক।

ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াই তিনি ইহার 'পরিচয় নিঃশব্দে অবিরত দিয়াছেন। বাক্যাপেক্ষা কার্য্য দ্বারাই পীড়িত, নির্য্যাতিত, অক্ষম,রুগ্ন ও অসহায়ের প্রতি তাঁহার অপার করুণা প্রকটিত করিয়াছেন।

"অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ তিনি সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য বলেন কেন? মাদকদ্রব্য ও পানীয় বর্জ্জনের জন্য তিনি সাতিশয় নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করেন কেন? চরকায় সুতাকাটা ও বস্ত্রবয়নের ব্যবস্থা প্রতি কুটীরে প্রচলনের প্রচেষ্টাই তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতির শীর্ষে স্থানলাভ করিয়াছে কেন? এই জন্য অর্থনীতির দোহাই তিনি দেন নাই, রাজনৈতিক কারণও তাঁহার নিকট সর্ব্বপ্রকৃষ্ট নহে। বস্তুতঃ তাঁহার নিকট ইহার প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে ধর্ম্মমূলক। প্রাথমিক কর্ত্তব্য হিসাবে তিনি এইগুলি গ্রহণ করিয়াছেন শুধু এই কারণেই যে, দরিদ্রতম ভারতীয় গ্রামবাসীকে দারিদ্র্যের পাশমুক্ত করিতে হইলে, ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। এই উপায়ে তাহারা স্বীয় পরিবারবর্গের প্রয়োজনমত খাদ্যবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারিবে, অর্দ্ধভুক্ত বা দুর্ভিক্ষাবস্থায় সম্পূর্ণ অনাহারী থাকিয়া বৎসরের পর বৎসর আজীবন দুঃখ, দারিদ্র্য ও ঋণের নিষ্পেষণ হইতে অব্যাহিত লাভ করিবে।

"একদা মহাত্মা গান্ধীকে পত্রযোগে আমি জানাইয়াছিলাম যে, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন যেরূপ প্রাধান্য পাওয়া উচিত তাহা না হইয়া জাতীয় আন্দোলন মুখ্য উদ্দেশ্যে পরিণত হইতে চলিযাছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই ক্রমশঃ তৎপরিবর্ত্তে মুখ্য প্রতিভাত হইতেছে। মহাত্মাজী ঐ পত্রের উত্তরে লিখেন যে, যতদিন তিনি এই আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবেন ততদিন আমার এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। কেননা, তাঁহার জীবনের গূঢ়তম সত্তা এই সমস্যা-কেন্দ্রিক। বস্তুতঃ এই বিষয়ে তাঁহার নিজের অনুভূতির সুগভীরত্বের জন্যই তিনি এই বিষয়ে সমধিক বাগবিন্যাস করিতে পারেন না।

"উক্ত পত্রে আমি আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলাম—মাদকদ্রব্য ও সুরাপানের সম্বন্ধে। মহাত্মা গান্ধী পানদোষ বর্জ্জনের উপরেও সমতুল্য গুরুত্ব আরোপ করেন। সুরা ও মাদকদ্রব্য ব্যবহারের ফলে ভারতবর্ষ অতি

দ্রুতভাবে অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছে। মহাত্মা গান্ধী যথাসাধ্য এই দুর্দশা হইতে মুক্তির প্রচেষ্টা করিতেছেন। কেবলমাত্র এই পানদোষ ও মাদক-দ্রব্যের নেশার জন্য দরিদ্র লোকে কোনমতেই দুঃখদৈন্য হইতে অব্যাহতি লাভের নিমিত্ত প্রকৃষ্ট প্রচেষ্টা করিতে পারে না। মহাত্মা গান্ধী আধুনিক যুগের এই দুরপনেয় কলঙ্কের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিরুদ্ধপন্থী। আমার জ্ঞাতসারে অদ্যকার দিনে মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় সমগ্র জগতে দরিদ্রবন্ধু অপর কেহ নাই। দরিদ্রের জন্য তাঁহার মত আজীবন কঠোর ত্যাগ-স্বীকার কেহ করেন নাই।" (গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মহামতি এণ্ড্রুজের রচনা।)

জনসাধারণের ও মনিষীগণের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য লইয়া গান্ধীজী ট্রেণে উঠিলেন! ট্রেণ চলিতে চলিতে যে যে ষ্টেশনে থামিতে লাগিল, ফরাসী দেশের জনসাধারণ সেইসব স্থানে ভীড় করিয়া দাঁড়াইলেন। গান্ধীজীকে উচ্ছ্বাসভরে অভিনন্দন জানাইলেন। ট্রেণ বোলোঁ ষ্টেশনে আসিল। গান্ধীজী 'ইংলিশ চ্যানেল' পার হইবার জন্য গাড়ী হইতে নামিলেন। যুবক, বৃদ্ধ, শিশু ও নারীর দল তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা জানাইল।

অবশেষে ভারতের শান্তির প্রতিনিধি ১২ই সেপ্টেম্বর বিলাতের মাটিতে পদার্পণ করিলেন।

অত্যাচারী শাসকের দল নহে, সহানুভূতিশীল ইংরাজ জনসাধারণের দল আসিয়া জড় হইলেন গান্ধীজীর চারিদিকে, গান্ধীজী স্নিগ্ধ আননে তাঁহাদের প্রতি অন্তরের প্রীতি নিবেদন করিলেন।

ধনী ইংরাজ……সম্ভ্রান্ত ইংরাজ-দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হইয়া গেল, কে গান্ধীজীকে লইয়া যাইবেন, নিজের বিরাট বাসভবনে আতিথ্য প্রদান করিবেন।

কিন্তু সকলকে নিবৃত্ত করিবার জন্য গান্ধীজী জানাইলেন, 'আমার ভারতবর্ষ আজ শোষিত হইয়া দারিদ্র্যদশায় উপনীত হইয়াছে, আমি সেই দরিদ্র ভারতের দরিদ্র প্রতিনিধি। আমার দরিদ্র দেশবাসীর অভাব-অভিযোগের কথা আমি

আপনাদের জানাইতে আসিয়াছি, অতএব আমার দেশকে ভুলিয়া অপনাদের প্রাসাদের ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের মধ্যে আমি বাস করিতে পারিব না। আমি দরিদ্র ইংরাজ ভ্রাতা ও ভগিনীগণের মধ্যে বাস করিব।'

গান্ধীজী তাঁহার সঙ্কল্প বিনীতভাবে জানাইয়া ইংলণ্ডের সাধারণ লোকের পল্লীতে বাস করিবার জন্য গমন করিলেন। মিস্ মুরিয়েল লিষ্টার নামে এক গুণমুগ্ধ ইংরাজ মহিলার 'কিংসলে হল' নামক গৃহে তিনি শেষ পর্য্যন্ত আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

গান্ধীজীর স্বভাবে···আচরণে···কথাবার্ত্তায় ইংলণ্ডের পল্লীবাসী মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহারা গান্ধীজীকে তাঁহাদের আপনার জনের মত দেখিতে লাগিলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভালবাসিত, আশপাশের পল্লীর ছোট ছোট শিশুগণ সকল সময়ে তাঁহার কাছে আসিয়া গল্প শুনিত। শিশুর মত সরলমনা গান্ধীজী শিশুদের দলে প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন।

মিস্ মুরিয়েল লিষ্টারের 'কিংসলে হলে' পিতামাতাদের সহিত তাঁহাদের পুত্রকন্যারাও আসিত। উহারা গান্ধীজীকে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা দেখাইবার জন্য দুই-একটি বিষয়ের অবতারণা করিব।

গান্ধীজীকে দেখার পর হইতেই তাঁহার চিন্তায় ছেলেদের মন ভরিয়া থাকিত। একবার একটি ছেলে বাড়ীতে আসিয়া তাহার মাকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা মা, গান্ধী কি খান?···উনি জুতা পরেন না কেন?'

তাহার গান্ধী গান্ধী কথা শুনিয়া মা বলিলেন, 'শোনো, আর কখনও গান্ধী বলিয়া ডাকিও না। তোমরা জানো, গান্ধী খুব ভাল লোক'।

ছেলেটি বলিল, 'আচ্ছা মা, এবার হইতে তাঁহাকে আমি গান্ধী-কাকা বলিয়া ডাকিব'।

এইরূপে মহাত্মা গান্ধী বিলাতের শিশুমহলে 'গান্ধী-কাকা' বলিয়া পরিচিত হইলেন।

গান্ধীজীর জন্মদিনে বালক ও বালিকাগণ তাঁহাকে নানারূপ উপহার পাঠাইয়া দিল। কেহ দিল মিষ্টান্ন, কেহ দিল খেলনা, কেহ বলিল, 'গান্ধী-কাকা, তোমার জন্মদিনে আমরা তোমাকে গান শুনাইব, মোমবাতি জ্বালাইয়া উৎসব করিব।' কিন্তু সব চেয়ে মজা করিয়াছিল একটি ছেলে। সে একদিন তাহার মাকে কিল-ঘুষি মারিতে লাগিল। মা বাধা দিতে গেলে বলিল, 'মা, আমাকে মারিও না, কারণ গান্ধী সেদিন বলিয়াছেন, মার খাইয়া মার ফিরাইয়া দিও না'।

তাঁহার জন্মদিনে একটি ছোট ছেলে একটি রচনা লিখিয়াছিল, উহাতে সে লিখিল—'মিঃ গান্ধী একজন ভারতবাসী······রাঁউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সে যোগ দেওয়ার জন্ত তিনি ইংলণ্ডে আসিয়াছেন। ভারতের ব্যবসা ফিরিয়া পাওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিযাছেন এবং দরিদ্রতম ভারতবাসীদের একজন হইতে চেষ্টা করিতেছেন।···তাঁহার খাদ্য হইতেছে ছাগলের দুগ্ধ ও ফল। গান্ধীজী মাছ বা মাংস খান না, কারণ জীবন গ্রহণে তিনি বিশ্বাস করেন না। মনে হয, গান্ধী একজন ভাল খৃষ্টান। গান্ধীজী ভারতবাসীর জন্ত বিলাসের এবং সুখের জীবন ত্যাগ করিযাছেন'।

এইরূপে মহাত্মা কি যেন এক যাদুদণ্ড-স্পর্শে বিলাতের শিশুদের মনেও তাঁহার ভালবাসার মন্ত্র প্রযোগ করিয়াছিলেন।

গান্ধীজীর আবাস ইংলণ্ডের জনসাধারণের তীর্থস্থান হইয়া উঠিল। সাধারণ ইংরাজগণ ভুলিয়াই গেলেন, এই সদাপ্রশান্ত মিষ্টভাষী মানুষটিই ভারতের মাটি হইতে ইংরাজের শাসনের শিকড় উচ্ছেদ করিবার জন্ত তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন, এই শীর্ণকায় অর্দ্ধনগ্ন সাধারণ ভারতবাসীটিই অসাধারণ কর্ম্মপন্থা লইয়া ইংরাজকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিবার জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা গান্ধীজীর কাছে আসিলেন, গান্ধীজীর মুখ হইতে ভারতের দুঃখদারিদ্র্যের বাণী শুনিলেন, ভারতের মহত্ত্বের ও শ্রেষ্ঠত্বের ইতিহাস শুনিলেন। তাঁহারা

ভারতের সুখ-দুঃখের শ্রোতা হইলেন, সাধারণ দুঃখী ও নিপীড়িত ভারতবাসীর কল্যাণ কামনা করিলেন।

মহামানবের এই মহত্ত্বের কথা বাকিংহাম প্রাসাদের লৌহতোরণ অতিক্রম করিয়া ব্রিটিশ সম্রাটের কর্ণগোচর হইল।

সম্রাট বিস্মিত হইলেন—কৌতূহলী হইলেন। কি শক্তি নিহিত আছে ঐ মানুষটির মধ্যে যাহার বলে তিনি ভারতের কোটি কোটি জনসাধারণকে পৃথিবীব্যাপী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছেন? কি ক্ষমতা আছে তাঁহার অহিংসা ও অসহযোগের মন্ত্রে, যাহার যাদুতে ব্রিটিশের কামান-বন্দুক নীরব হইতে বাধ্য হয়? কি ঐশ্বর্য্য লুক্কায়িত আছে ঐ আড়ম্বরশূন্য ক্ষুদ্র মানুষটির ভিতর—যাহার লোভে ইংরাজ জনসাধারণ তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়াছে! সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ তাঁহার বিস্ময় ও কৌতূহল নিবারণ করিবার জন্য ভারতের অর্দ্ধনগ্ন ফকিরকে নিমন্ত্রণ করিলেন তাঁহার রাজ-প্রাসাদে।

গান্ধীজী সম্রাটের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। রাজপ্রাসাদে গমন করিলেন।

ভারতের দরিদ্রদিগের মূর্ত্ত প্রতীক সম্রাটের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। চরণে চটি, কোমরে লজ্জা নিবারণের বস্ত্রখণ্ড, দেহে শুভ্র চাদর, নগ্ন মস্তক!

কিছুই নাই—কিন্তু যেন সবই আছে।

রিক্ত নিঃস্ব মূর্ত্তি—তথাপি যেন রাজ-ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত! মৃদু মৃদু প্রশান্ত হাসি, মুখে স্বর্গের জ্যোতি!

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী তাঁহার সহিত প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হইলেন। অগ্রসর হইয়া আসিয়া মহামানবের হস্ত ধারণ করিলেন। শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিলেন। ভারতের স্বাত্ত্বিক আত্মার প্রতিভূ ব্রিটেনের তামসিক ও রাজসিক আত্মার উপর জয়স্তম্ভ স্থাপন করিলেন।

গান্ধীজীর সহিত মধ্যে মধ্যে ইংলণ্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণেরও সাক্ষাৎ

হইতে লাগিল। স্বনামখ্যাত লেখক ও মনীষী জর্জ্জ বানার্ড শ তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। মহামতি শ গান্ধীজীর মহান্ প্রচেষ্টায় আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। বিখ্যাত লেখক ও শ্রমিক নেতা হ্যারল্ড্ ল্যাস্কি আসিয়া তাঁহার সহিত ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে বহু আলোচনা করিলেন। এমন কি অনেক বিশিষ্ট আমেরিকান ও জার্ম্মানগণও আসিয়া তাঁহার সহিত বিবিধ আলোচনা করিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন। গান্ধীজী তাঁহার মধুর ও অকপট ব্যবহারে সকলকেই মোহিত করিলেন।

কিন্তু সাধারণ অসাধারণ সমস্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার অন্তরালে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর কূট ও কৌশলপূর্ণ চাল ফল্গুনদীর গুপ্তধারার মত প্রবাহিত হইয়া চলিল।

শাসক ইংরাজ বৈঠকের আয়োজন করিলেন। সেপ্টেম্বরের শেষে বৈঠক বসিল। গান্ধীজী ব্যতীত বেসরকারী ভারতবাসীর পক্ষ হইতে শ্রদ্ধেয় মদনমোহন মালব্য এবং শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুও এই বৈঠকে যোগদান করিলেন। পণ্ডিত মালব্য হিন্দু-সাধারণের বিশেষ প্রতিনিধিরূপে এবং শ্রীযুক্তা নাইডু নারীজাতির প্রতিনিধিরূপে আগমন করিয়াছিলেন।

বৈঠকে বৃটিশ প্রতিনিধি এবং ভারতের সরকারী ও বেসরকারী দল সমবেত হইলেন। দীর্ঘ একাদশ সপ্তাহ ধরিয়া আলাপ-আলোচনা চলিল। গান্ধীজী মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্রিটিশের শুভ-বুদ্ধির নিকট আবেদন করিলেন। তিনি জানাইলেন, 'প্রায় দীর্ঘ দুইশত বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিয়া আপনারা ভারতের অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছেন, ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেক কিছু জানিয়াছেন। আমরাও আপনাদের অনেক কিছু জানিয়াছি। তাই আজ বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি, ভারতের কল্যাণের জন্য ভারতকে আপনারা মুক্তি দিন, স্বাধীন ও শক্তিশালী ভারতের সদিচ্ছা, স্নেহ ও প্রীতি লাভ করিয়া লাভবান হইবার জন্যও ভারতকে স্বমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করুন। ভারত আপনাদের কথা চিরকাল স্মরণে রাখিবে, চিরকাল আপনাদের বন্ধুত্ব

কামনা করিবে, চিরকাল আপনাদের সাহায্য করিবে। ভারতের এই বন্ধুত্ব আপনারা অবহেলা করিবেন না।'……

গান্ধীজী গোল টেবিল বৈঠকের বিবিধ অধিবেশনে বক্তৃতাবলী প্রদান করিয়াছিলেন। সেগুলির মধ্য হইতে বিশেষ বিশেষ অংশ আমরা এখানে প্রদান করিতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন - "গোড়াতেই বলিয়া রাখিতে চাই যে, ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির অবস্থার কথা আপনাদের কাছে ব্যক্ত করিতে আমি যথেষ্ট উদ্বেগ অনুভব করিতেছি। আরও বলিতে চাই যে, পরিপূর্ণ সহযোগিতার ভাব লইয়া উপযুক্ত সময়ে এই গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্যই আমি লণ্ডনে আসিয়াছি এবং মিটমাটের পথ যাহাতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় তাহার জন্যই আমি সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিব। তাহা ছাড়া সম্রাটের এই গভর্ণমেণ্টকে আমি এ আশ্বাসও দিতে চাই যে, এই অধিবেশনের কোনো অবস্থাতেই কর্ত্তৃপক্ষকে বিব্রত করিয়া তুলিবার অভিপ্রায় আমার নাই এবং যাঁহারা আজ এখানে আমার সহযোগী হইয়া আসিয়াছেন তাঁহাদিগকেও আমি এই আশ্বাস দান করিতেছি। আমাদের মনের মধ্যে যতই পার্থক্যের সৃষ্টি হোক না কেন, আমি তাঁহাদিগকে কোন ভাবেই বাধা দান করিব না।……যদি কখনো দেখিতে পাই যে আমি কনফারেন্সের সত্যকার কোন কাজে লাগিতেছি না, তখন আমি নিজেকে কনফারেন্স হইতে সরাইয়া লইতে অনুমাত্রও দ্বিধাবোধ করিব না। তাই এই কনফারেন্সের পরিচালনা-ভার যাঁহাদের হাতে ন্যস্ত, তাঁহাদিগকে আমি এই অনুরোধই করিতেছি যে, সেরূপ ক্ষেত্রে তাঁহারা যেন আমাকে কেবল বুঝিতে দেন—আমার উপস্থিতি অনাবশ্যক। যে মুহূর্ত্তে সে কথাটি আমি বুঝিতে পারিব, সেই মুহূর্ত্তে আমি বিনা দ্বিধায় নিজেকে সরাইয়া লইয়া যাইব।

"আমার একথা বলার কারণ—আমি জানি যে, গবর্ণমেণ্ট এবং কংগ্রেসের মতের ভিতর মূলগত পার্থক্য আছে। এবং আমার সহযোগীদের সহিত আমার নিজের মতেরও খুব বড় গরমিল থাকাও অসম্ভব নহে। তাহা ছাড়া যাহা খুসি

করিবার স্বাধীনতাও তো আমার নাই। ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির আমি একজন ক্ষুদ্র প্রতিভূ মাত্র। কংগ্রেস কি চায় কংগ্রেস কি—এইখানেই সে কথাটাও বলিয়া রাখা ভাল। কারণ তাহা হইলে হয়তো আমি আপনাদের সহানুভূতি লাভেও সমর্থ হইব। যে ভার আমার উপরে চাপানো হইয়াছে তাহা সত্যসত্যই যে অত্যন্ত গুরু তাহাতে তো কিছুমাত্র ভুল নাই।

"......যাঁহারা কংগ্রেসের দাবী সম্বন্ধে উদাসীন নহেন তাঁহারা হয়তো বুঝিতে পারিবেন যে, কংগ্রেস যাহা দাবী করিয়াছে তাহার যোগ্য হইবারও চেষ্টা করিয়াছে। দাবীর অনুযায়ী কাজ করিতে গিয়া বহু সময় সে ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু এ কথাও আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে, যদি আপনারা কংগ্রেসের ইতিহাস ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন তবে দেখিতে পাইবেন, তাহার ইতিহাসে সাফল্যের পরিমাণই বেশী। ব্যর্থতা নহে—ধীরে ধীরে সে সাফল্যের দিকেই আগাইয়া চলিয়াছে। সর্ব্বোপরি কংগ্রেস সত্যসত্যই প্রতিনিধিত্ব করে সেইসব লক্ষ লক্ষ লোকের—যাহারা মূক, যাহারা বুভুক্ষু,—ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রামে যাহারা ছড়াইয়া পড়িয়া আছে।

তাহারা ব্রিটিশ ভারতের লোক, কি ভারতীয় সামন্তরাজ্যের লোক—সে দিকে সে কিছুমাত্র খেয়াল করে নাই। কংগ্রেসের মতে কেবল সেই সকল স্বার্থই রক্ষা করার উপযুক্ত যাহা এই লক্ষ লক্ষ মূক-মৌন জনসাধারণের স্বার্থের পরিপোষক। বাহ্যিকভাবে কতকগুলি স্বার্থের ভিতর সংঘাত হামেসাই চোখে পড়ে। এই সংঘাত যদি প্রকৃত সংঘাত হয়, তবে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—কংগ্রেস এইসব মূকমৌনের স্বার্থের জন্য সমস্ত স্বার্থই বিসর্জ্জন দিতে দ্বিধা করিবে না। .....কংগ্রেসের নির্দ্দেশ যখন আমি আপনাদের কাছে পাঠ করিব আপনারা সম্ভবতঃ আশ্চর্য্য হইবেন না। আশা করি, আপনাদের কানে তাহা বিসদৃশ বলিয়াও ঠেকিবে না। আপনারা অবশ্য মনে করিতে পারেন—কংগ্রেস যে দাবী পেশ করিতেছে তাহা টিকিতে পারে না। সে যাহা হউক, আমি কিন্তু অত্যন্ত মৃদু ভাষায় অথচ অত্যন্ত

দৃঢ়তার সঙ্গেই কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই দাবীগুলি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব। যদি আপনারা আমার ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন, ভারতের লক্ষ লক্ষ মূক জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন, আমি আমার মত পরিবর্ত্তন করিতে রাজি আছি। কিন্তু তাহা হইলেও কোন পরিবর্ত্তন স্বীকার করিয়া লওয়ার পূর্ব্বে যাঁহারা আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের সম্মতি লইতে হইবে।...এইবার আমি কংগ্রেসের নির্দ্দেশ আপনাদের কাছে পাঠ করিতে চাই। 'ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির' করাচি অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহা এইরূপ—

"গভর্ণমেণ্ট এবং কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সহিত সাময়িক মিটমাটের যে ব্যবস্থা পরিগৃহীত হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া কংগ্রেস স্পষ্টভাবে এইকথা বলিতে চান যে, কংগ্রেসের পূর্ণ স্বরাজের আদর্শ অব্যাহত রহিয়াছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের সহিত কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা যদি কোন বৈঠকে বসেন, কংগ্রেসের প্রতিনিধিকে তবে এই আদর্শ লাভের জন্যই চেষ্টা করিতে হইবে।......তরবারির জোরে ভারতবর্ষকে পরাধীন করিয়া রাখা সম্ভব ...এ কথা সত্য। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনের উন্নতির পক্ষে,—গ্রেট ব্রিটেনের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষে কি বেশী আবশ্যক? পরাধীন বিদ্রোহী ভারত না শক্তিশালী অংশীদাররূপ ভারত—যে তাহার দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে চায়, তাহার দুর্ভাগ্যে যে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে চায়?"

সাম্রাজ্য ও শোষণের মোহে অন্ধ মদগর্ব্বী ইংরাজ শাসকগোষ্ঠীর কঠোর অন্তর শান্তিকামী মহাত্মা ও মহামানবের অনুরোধে বিগলিত হইল না।

রসহীন প্রস্তরস্তূপ কি জলসিঞ্চনে সিক্ত হইতে পারে? স্বার্থপর শাসক-গোষ্ঠীর দল কেবল নিজেদের কৌশল ও কূটবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া নিজেদের ইচ্ছাকে আপাত-মধুর কথার দ্বারা আবৃত করিয়া ভারতের উপর চাপাইতে চাহিল—মহামানবের বাণীকে প্রত্যাখ্যান করিল, মহামানবকে

প্রত্যাখ্যান করিয়া ভারতের কোটি কোটি জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করিল।

ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ভারত-শাসনের জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করিল। কেন্দ্রীয় শাসনাধিকার সমেত সমগ্র প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন রচনার কথা ঘোষণা করিল। কিন্তু সমস্ত কিছুর উপরে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বজায় রাখিবার চক্রান্ত করিল। গভর্ণর ও গভর্ণর-জেনারেলের আধিপত্য কায়েম রাখিবার নীতি গ্রহণ করিল। ইহা ছাড়া হিন্দু ও মুসলমানের অধিকার-অনধিকারের প্রশ্ন তুলিয়া সাম্প্রদায়িক ভেদের আগুনে ঘৃত ঢালিবার সঙ্কল্প করিল···এমন কি হিন্দুর মধ্যেও কল্পিত উন্নত ও অনুন্নত শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়া অখণ্ড হিন্দু সমাজের মধ্যেও বিবাদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিল।

গান্ধীজী ক্ষুব্ধ হইলেন। বুঝিতে পারিলেন, ভারতকে প্রকৃত স্বাধীনতা দিবার কোন ইচ্ছাই ইংরাজ সরকারের নাই। তাঁহারা শুধু গোলটেবিল আর কন্‌ফারেন্সের ধূয়া তুলিয়া সময় কাটাইতে চাহেন, আর মিষ্ট বাক্য দ্বারা নিজেদের শাসনাধিকারকেই রকমফের করিয়া আবার উগ্র ভারতের স্কন্ধে চাপাইতে চাহেন। বৃটিশ সদিচ্ছার উপর গান্ধীজীর অনাস্থা ও অবিশ্বাস আরও বাড়িয়া গেল।

সত্যাগ্রহী মহাত্মার সত্যের কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গেল ··বিলাতের কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গেল। তিনি ইংলণ্ডের জনসাধারণকে জানাইলেন—আমি বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু বড় বেদনা লইয়া ফিরিয়া যাইতেছি। তথাপি আমি সত্যাগ্রহীর ন্যায্য ও সত্য ধর্ম্ম বিলাতের মাটিতে পালন করিয়াছি, আবার ভারতের ক্ষেত্রেও উহা পালন করিতে যাইতেছি। গান্ধীজী দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ডিসেম্বর মাসে বিলাত হইতে ভারতের পথে ফিরিয়া চলিলেন।

কিন্তু অহিংস ব্রতধারী মহামানব ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের উপর বিশ্বাস হারাইলেও ব্রিটিশ জনসাধারণের উপর বিশ্বাস হারাইলেন না। তাই তিনি বিলাত ত্যাগ করিবার সময়ে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে স্নেহভরা বিদায়বাণী জানাইলেন—

"মানুষের চরিত্রের উপর আমার যে অপরিসীম বিশ্বাস আছে, ইহা আমার সেই বিশ্বাসকেই গভীরতর করিয়া তুলিয়াছে। আপনাদের সংবাদপত্রে সংবাদ নানাভাবে বিকৃত হইয়া উঠে, আর ইংরাজ নরনারী তাহা পাঠ করেন, তবুও তাঁহারা আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করেন নাই।......ভারতকে বিলাতি বস্ত্র বর্জ্জন করিবার পরামর্শ দিয়া আমি রিলাতের কলের শ্রমিকদের বেকার করিয়াছি। সংবাদপত্র তাঁহাদের ইহা দ্বারা উত্তেজিত করা সত্বেও শ্রমিকেরা আমার প্রতি কখনো রাগ করেন নাই। বরং শ্রমিক নরনারী আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, নিজের লোকের মত তাঁহারা আমার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন। আমি বিলাত ত্যাগ করিবার কালে এই কথা কখনো বিস্মৃত হইব না।".....

জাতির পিতা জাতিকে পথ দেখাইবার জন্য ভারতের মাটিতে আবার ফিরিয়া আসিলেন।

তিপ্পান্ন

গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ

ইংরাজের কূটচক্রান্তে ব্যর্থকাম হইয়া গান্ধীজী দেশে ফিরিয়া আসিলেন। ইংরাজের সততায় বিশ্বাস করিয়া তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে গিয়াছিলেন। আশা করিয়াছিলেন যে ভারতের স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হইবে। কিন্তু নিরাশ হইয়া শূন্যহস্তে তিনি দেশে ফিরিলেন।

দেশে ফিরিয়া তিনি দেখিলেন যে ভারত-সরকার ইতিমধ্যে প্রত্যাহৃত অর্ডিন্যান্সসমূহ পুনর্বহাল করিয়াছেন। ১৯৩১ সালে 'গান্ধী আরউইন চুক্তির' ফলে যে সকল অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহৃত হইয়াছিল সেগুলি বাঙ্গলা, যুক্তপ্রদেশ, সীমান্ত-প্রদেশ প্রভৃতিতে পুনরায় জারি করা হইয়াছে। দেশে স্বেচ্ছাচারীর শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ভারত সরকারের আচরণে গান্ধীজী ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু তখনই তিনি তাঁহার কার্য্যধারা নিরূপণ না করিয়া একবার বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া অর্ডিন্যান্সসমূহের পুনর্বহালের কারণ জানিতে চাহিলেন। কিন্তু বড়লাট তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন না।

অতঃপর কংগ্রেসের এক অধিবেশন হইল এবং সেই অধিবেশনে স্থির হইল যে মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধ সম্বন্ধে বড়লাটকে পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করা হউক। বড়লাট গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাতে অসম্মত হইলে এবং অর্ডিন্যান্স দ্বারা দেশ-শাসনের উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দিতে না পারিলে, জাতিকে পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলনে আহ্বান করা হইবে।

জাতীয় মহাসভার এই সিদ্ধান্তে ভারত-সরকার প্রমাদ গণিলেন। নিজের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে ভারত সরকার অবহিত ছিলেন। তাই অর্ডিন্যান্সের বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হইল এবং তাঁহাকে যারবদা জেলে লইয়া যাওয়া হইল।

ইতিমধ্যে ইংরাজ সরকার এক নূতন শাসন-তন্ত্র রচনা করিয়া ভারতের উপর তাহা চাপাইয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিলেন। ইহাই ম্যাকডোনাল্ড বাঁটোয়ারা নামে কুখ্যাত। এই নূতন শাসনতন্ত্রের মর্ম্ম গান্ধীজীর কাছে যখন পৌঁছিল তখনই তিনি শাসক সম্প্রদায়ের গূঢ় অভিসন্ধি ধরিয়া ফেলিলেন। বুঝিলেন যে, ভারতের জনসাধারণকে বিভক্ত করিয়া দিবার জন্য, ভারতকে দুর্ব্বল করিবার জন্য এই নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছে।

গান্ধীজী চিরকাল ভারতের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী ছিলেন। হিন্দু মুসলমান, উন্নত অনুন্নত সকল সম্প্রদায়কে মিলিত করিয়া অখণ্ড অবিভক্ত এক স্বাধীন ভারত রচনার স্বপ্ন তিনি দেখিযাছিলেন। কিন্তু ম্যাকডোনাল্ড বাঁটোয়ারায় হরিজনদিগের জন্য পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায় সাম্রাজ্যবাদীদিগের কূটচক্রান্তে বিভক্ত হইয়া ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। এক্ষণে ভারতবর্ষের জনসাধারণকে আরও বিভক্ত করিয়া দিবার এই ষড়যন্ত্র লক্ষ্য করিয়া গান্ধীজী ইহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাইলেন এবং কারাগারে অবরুদ্ধ অবস্থায়ই অনশন সুরু করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, "আমার দেশের দুর্গতদিগের বিভক্ত করার চেষ্টার বিরুদ্ধে আমি উপবাসে মৃত্যুপণ করিলাম।"

গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্তে সমস্ত ভারতবাসীর দৃষ্টি যেন খুলিযা গেল। সকলেই ম্যাকডোনাল্ড বাঁটোয়ারার সাম্প্রদায়িকতা ও অনুন্নতদের পৃথকী-করণের বিরুদ্ধে সচেতন হইয়া উঠিলেন। ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগরীতে ও পল্লীতে যেন এক নবজাগরণের সাড়া লক্ষিত হইল। যাহাদের অস্পৃশ্য বলিয়া এতদিন দূরে অবহেলা করিয়া সরাইয়া রাখা হইয়াছিল তাহাদের সমাদর করিয়া সমাজে গ্রহণ করিবার জন্য, তাহাদিগকে মর্য্যাদা দান করিবার জন্য সর্ব্বত্র একটা সাড়া পড়িয়া গেল। শেষ পর্য্যন্ত গান্ধীজীর এই অনশনের ফলেই অনুন্নতদের পৃথকীকরণের ব্যবস্থা ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি ২০শে সেপ্টেম্বর

বেলা ১২টার সময়ে উপবাস সুরু করিয়াছিলেন। দেশের নেতাগণ ম্যাকডোনাল্ড বাঁটোয়ারা অনুশীলন করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া একমত হইয়াছিলেন যে অনুন্নতদের পৃথিকীকরণ হইলে জাতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। সরকারও জাতিকে পৃথিকীকরণের এই নীতি অপসারিত করিলেন। তখন দেশবাসীর ও নেতাগণের অনুরোধে সত্যের পূজারী গান্ধীজী ২৬শে সেপ্টেম্বর সৌন্দর্য্যের পূজারী রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে তাঁহার উপবাস ভঙ্গ করিলেন।

গান্ধীজী তাঁহার উপবাস ভঙ্গ করিলেন বটে, অস্পৃশ্যদের পৃথকীকরণের সরকারী নির্দ্দেশ প্রত্যাহৃত হইল সত্য, কিন্তু তখনও ভারতের সর্ব্বত্র অস্পৃশ্যদিগকে সম্পূর্ণ মর্য্যাদা দান করিয়া হিন্দুসমাজের মধ্যে গ্রহণ করা হইতেছিল না। ইহাতে গান্ধীজীর অন্তর পুনরায় ব্যথাতুর হইয়া উঠিল। ১৯৩৩ সালের ১লা মে তিনি ঘোষণা করিলেন যে আত্মশুদ্ধির জন্য এবং সহকর্ম্মীদিগের শুদ্ধির জন্য তিনি ৮ই মে উপবাস আরম্ভ করিবেন এবং ঐ উপবাস তিনি একুশ দিন পালন করিতে কৃতসঙ্কল্প।

হরিজন উন্নয়ন সম্পর্কে তাঁহার এই উপবাস করার সিদ্ধান্তে সরকার ৮ই মে তারিখেই তাঁহাকে মুক্তি দান করিলেন।

মুক্তিলাভ করিয়াই তিনি তিন সপ্তাহের জন্য আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখিতে বলেন। পরবর্ত্তী ২৯শে মে তারিখে গান্ধীজী যথারীতি তাঁহার উপবাস ভঙ্গ করিলেন। এই একুশ দিনের মধ্যে ভারতের দিকে দিকে হরিজন উন্নয়নকার্য্যে খুবই সাড়া পড়িয়া যায়। গুরুভায়ুর মন্দির প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরসমূহের দ্বার হরিজনদের জন্য উন্মুক্ত হয়। জায়গায় জায়গায় সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুদিগের মধ্যে পংক্তিভোজনও অনুষ্ঠিত হইল।

এইবারকার এই উপবাসের প্রথমে তিনি আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত করায় দেশের অনেক নেতা অসন্তুষ্ট হন। বিঠলভাই প্যাটেল ও সুভাষচন্দ্র বসু তখন অসুস্থতার জন্য ভিয়েনা নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারাও গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন করেন নাই এবং তাঁহার কার্য্যের তীব্র

নিন্দা করিয়া এক বিবৃতি প্রদান করেন। কিন্তু গান্ধীজীর ও সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও কর্ম্মপন্থা ভিন্নমুখী হইলেও, গান্ধীজীর প্রতি সুভাষচন্দ্রের ছিল অবিচলিত শ্রদ্ধা। সুভাষচন্দ্র যখন ভারতের বাহিরে গিয়া ভারতের মুক্তিসাধনের জন্য আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করেন, তখন সিঙ্গাপুর হইতে এক বক্তৃতায় তিনি গান্ধীজীর প্রতি তাঁহার সেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। আমরা এখানে সেই বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম:—

ভারত ও ভারতের স্বাধীনতার জন্য মহাত্মা গান্ধী যে সংগ্রাম করিয়াছেন তাহা এমন অসাধারণ ও অতুলনীয় যে, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

প্রথম মহাসমরের অবসানে ভারতীয় নেতৃবর্গ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি মত স্বাধীনতা দাবী করিতে গিয়া সর্ব্বপ্রথম অনুভব করিলেন যে, ইংরাজ তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। তাঁহাদের এই দাবীর উত্তরে আসিল ১৯১৯ সালের রাউলাট আইন। যেটুকুও বা স্বাধীনতা ছিল—এই আইনের ফলে তাহাও তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইল। জনসাধারণ তাহার প্রতিবাদ করিলে তাহার উত্তরে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল! প্রথম মহাসমরে ভারতবাসীর অভূতপূর্ব্ব আত্মত্যাগের প্রতিদান হইল রাউলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড।

১৯১৯ সালের এই সকল মর্ম্মান্তিক ঘটনার পর ভারতবাসীরা কিছু-কালের জন্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। স্বাধীনতা অর্জ্জনের সমস্ত প্রচেষ্টা বৃটিশের সামরিক শক্তিদ্বারা দলিত হইল। শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন, বৃটিশ পণ্য-বর্জ্জন, সশস্ত্র-বিপ্লব প্রভৃতি সমস্ত উপায়ই স্বাধীনতা আনয়নে ব্যর্থ হইল। কোনদিকে আশার কোন চিহ্ন থাকিল না। ভারতবাসীরা আন্দোলনের নূতন অস্ত্র আবিষ্কারের জন্য অন্ধকারে পথ খুঁজিতে লাগিল। ঠিক এমনি সন্ধিক্ষণে ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার নূতন অস্ত্র—অসহযোগ, সত্যাগ্রহ ও আইন-অমান্য আন্দোলন লইয়া আবির্ভূত হইলেন। মনে হইল,

ঈশ্বর যেন ভারতবাসীকে পথ দেখাইবার জন্য তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন! দেখিতে দেখিতে সমস্ত জাতি তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইল। ভারত রক্ষা পাইল। প্রতি ভারতবাসীর মুখমণ্ডল আশা ও বিশ্বাসের আলোতে দীপ্ত হইয়া উঠিল। চরম বিজয় সম্বন্ধে তাহারা নিশ্চিন্ত হইল।

বিশ বৎসরাধিকাল মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জনগণ ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। একথা বলিলে কোনক্রমে অত্যুক্তি করা হইবে না যে, গান্ধীজী যদি তাঁহার নূতন অস্ত্র লইয়া আগাইযা না আসিতেন তাহা হইলে ভারত আজও হয়ত ধূল্যবলুণ্ঠিত থাকিত। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁহার অবদান অভূতপূর্ব্ব ও অতুলনীয়। অনুরূপ অবস্থায় আর কোন লোকই স্বীয জীবদ্দশায এতখানি সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই।

১৯২০ সাল হইতে ভারত গান্ধীজীর নিকট হইতে এমন দুইটি জিনিস শিক্ষা করিয়াছে যাহা স্বাধীনতা অর্জ্জনের পক্ষে অপরিহার্য্য। তাহারা শিক্ষা করিযাছে জাতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে এবং নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে। ইহার পরিণতিক্রমেই আজ তাহাদের হৃদয়ে বিপ্লবের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইযাছে। দ্বিতীয়তঃ আজ তাহারা যে প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিযাছে ভারতের সুদূরতম পল্লীর নিভৃত কোণেও তাঁহার বাণী পৌছিযাছে।

মহাত্মা গান্ধী আমাদিগকে স্বাধীনতার রাজপথে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন।......

আমরা আবার আমাদের পূর্ব্ব প্রসঙ্গে ফিরিয়া যাই। গান্ধীজীর উপবাস-ব্রত উদ্‌যাপিত হইবার পর কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি মিঃ আনে আরও ছয় সপ্তাহের জন্য আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখেন এবং কারাগারের বাহিরে যে সকল দেশনেতা ছিলেন তাঁহাদের লইয়া কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নিরূপণ করিবার জন্য পুনার তিলক মন্দিরে এক সম্মেলনের আহ্বান করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে দেশনেতাগণ আসিয়া এই

সম্মেলনে যোগদান করেন। মহাত্মা গান্ধীর সহিত নেতাগণ এই সম্মেলনে মিলিত হইয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, গণ-সত্যাগ্রহ বা ব্যাপক আইন-অমান্য আন্দোলন অতঃপর বন্ধ থাকিবে। তবে যোগ্য লোকেরা ব্যক্তিগত দায়িত্বে ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্য করিতে পারিবেন। কংগ্রেসের কার্য্যে গোপনীয়তার রীতি পরিত্যাগের নির্দ্দেশও এই সময়ে দেওয়া হইল।

এই সম্মেলনের পর মহাত্মাজী বড়লাট লর্ড উইলিংডনের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎকারের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু আইন-অমান্য আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয় নাই বলিয়া তিনি গান্ধীজীর প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন না, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না।

অতঃপর গান্ধীজী ব্যক্তিগতভাবে আইন-অমান্যের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি তাঁহার বড় সাধের সবরমতী আশ্রম ভাঙ্গিয়া দিয়া, তথাকার গ্রন্থাগার আসবাবপত্র সমস্তই হরিজন সেবক-সঙ্ঘকে দান করিলেন। অনাসক্ত যোগী-পুরুষ তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় প্রতিষ্ঠানটি হইতে এইরূপে নিজেকে নিমেষে বিচ্ছিন্ন করিযা দেশের সেবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। দেশের সেবার জন্য সকল কিছুই ত্যাগ করিয়া তিনি সর্ব্বরিক্ত সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করিতে দ্বিধাপ্রকাশ কোন দিন করেন নাই।

গ্রামবাসীদের মধ্যে নির্ভীকতার বাণী প্রচার করিবার জন্য, তাহাদিগকে ব্যক্তিগত আইন-অমান্য আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গান্ধীজী বরদৌলি তালুকের অন্তর্গত রাসগ্রাম অভিমুখে রওনা হইলেন শ্রীমতী কস্তুরবাঈ এবং বত্রিশ জন আশ্রমিক তাঁহার সঙ্গী হন। কিন্তু তাঁহারা ধৃত হইয়া এক বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে দেশে ব্যক্তিগত আইন-অমান্য আন্দোলনের সাড়া পড়িয়া গেল। চারিদিকে ধরপাকড়ও সুরু হইল। শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারী, মিঃ আনে প্রভৃতিও গ্রেপ্তার হইলেন। ব্যক্তিগত আইন-অমান্য আন্দোলনের মধ্যেও যে কি

অসীম শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে, দেশবাসী তাহা লক্ষ্য করিয়া নূতন সংগ্রাম-পদ্ধতিতে দীক্ষালাভ করিল।

অবরুদ্ধ হইয়া গান্ধীজী সরকারের কাছে হরিজন সেবার কাজ করিবার সুযোগ প্রার্থনা করেন। ইতিপূর্ব্বেও বহুবার কারাগারের ভিতর হইতে হরিজন উন্নয়ন-কার্য্য চালাইবার জন্য সরকার তাঁহাকে কিছু কিছু সুযোগ দান করিয়াছিলেন। কিন্তু এবার সরকার কারাগারের মধ্য হইতে হরিজন সেবাকার্য্য করার জন্য তাঁহাকে অনুমতি দিলেও এমন কতকগুলি বিধিনিষেধ আর সর্ত্ত আরোপ করিলেন যে তাহাতে তাঁহার স্বাধীন আত্মা বিদ্রোহী হইল। তিনি ইহার প্রতিবাদে পুনরায় অনশন সুরু করিলেন। সরকার বেগতিক দেখিয়া তাঁহাকে মুক্তি দিলেন।

অতঃপর গান্ধীজী হরিজন উন্নয়ন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করার সঙ্কল্প করিয়া ভারত পরিভ্রমণ করার সিদ্ধান্ত করেন···

মহাভারতের যুগ···

সত্যাশ্রয়ী যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতেছেন···সেই যজ্ঞে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিয়াছেন জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমাগত অতিথিবৃন্দের পদযুগল ধৌত করিবার কার্য্য।

এই দৃষ্টান্ত যেমন মহৎ, বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ মানব, মানবোত্তর ঋষির হরিজন উন্নয়নকার্য্যের সঙ্কল্প-গ্রহণ এবং সত্যসত্যই তাহাদের উন্নয়ন ও মর্য্যাদা-দানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টাও তদ্রূপ মহান্।

সে যুগের মহামানবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই এ যুগের মহামানব সমাজের লাঞ্ছিত, ঘৃণিত, অবহেলিত ও পদদলিত জনগণকে মর্য্যাদা দান করিবার মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

৭ই নভেম্বর (১৯৩৩) তাঁহার এই সফর সুরু হয়। তিনি মাঠের পর মাঠ পার হইয়া, গ্রামের পর গ্রাম পার হইয়া গ্রামোন্নয়ন, কুটীর-শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের উপদেশ দিয়া ফিরিতে লাগিলেন। তাঁহার

উৎসাহ, উদ্যম এবং উদ্দীপনাময়ী বাণী ভারতের গ্রামে গ্রামে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নবজাগরণের সাড়া জাগাইল। স্বাধীনতা অর্জ্জনের পূর্ব্বে ভারতে গঠনমূলক কার্য্যের কতখানি প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, গান্ধীজীর এই সফরে ও তাঁহার বাণীতে তাহা যেন স্পষ্টীকৃত হইল।

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে আরম্ভ করিয়া গান্ধীজী ব্যাপক আইন-অমান্য আন্দোলনকে স্থগিত রাখার পরামর্শ দিয়া আসিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি বারংবার একথাটা অনুভব করিতেছিলেন যে, কোন নির্দ্দিষ্ট অভিযোগের বা অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য ব্যক্তিগত আইন-অমান্য করা যাইতে পারে। কিন্তু স্বরাজ লাভের জন্য ব্যাপক আইন-অমান্য আন্দোলন না করিয়া বরং জাতিগঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করিলে তাহা ভারতের পক্ষে অধিকতর কল্যাণপ্রসূ হইবে। এই ভাবে ভাবিত হইয়াই তিনি এই সময়ে এক বিবৃতিতে আইন-অমান্য স্থগিত রাখার প্রস্তাব করেন এবং উহাতেই কংগ্রেসের দুর্নীতি দূর করার কতকগুলি নির্দ্দেশ দান করেন। ভারতের স্বাধীনতার জন্য গঠনমূলক কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াই তিনি কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়া দেশ-শাসনের যেটুকু ক্ষমতা পাওয়া গিয়াছিল তাহার সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দান করেন এবং নিজে জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে, জাতির গঠনমূলক কার্য্যে, বিশেষতঃ হরিজনদের উন্নয়ন ও হিন্দুমুসলমান মিলনের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৩৪ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে কংগ্রেসের ৪৮তম অধিবেশনে গান্ধীজী কংগ্রেস হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি আর কংগ্রেসের চার আনার সদস্যও রহিলেন না। তাঁহার এই সিদ্ধান্তে সমগ্র জাতি স্তম্ভিত হইয়া যায়। কারণ তিনি ছিলেন বর্ত্তমান জাতীয় মহাসভার স্রষ্টা ও পরিচালক। তাঁহারই অধিনায়কত্বে কংগ্রেস ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের পরিচালনা করিয়া আসিতেছিল। সুতরাং তাঁহার এই সিদ্ধান্তে সকলে

মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু গান্ধীজী তাঁহার সিদ্ধান্তে অটল রহিলেন। তিনি তাঁহার দেশবাসীকে জানাইলেন যে কংগ্রেসের বাহিরে থাকিলেও তিনি দেশকে সেবা করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহার এই সিদ্ধান্তে দেশবাসীর বিচলিত হইবার কিছুই নাই।

কংগ্রেসের সদস্যপদ পরিত্যাগ করিলেও কংগ্রেসের সহিত গান্ধীজীর অন্তরের যোগ অক্ষুণ্ণ রহিল। অতঃপর তিনি কংগ্রেসের একজন প্রধান পরামর্শদাতারূপে কাজ করিতে থাকেন। তাঁহারই পরামর্শে কংগ্রেসের ইতিহাসে এই সময়ে একটি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিল।

কংগ্রেস বহুদিন হইতে জনসাধারণের প্রতিনিধি হইয়াছিল সত্য। কিন্তু গ্রামের মাটির সঙ্গে কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক যোগসাধন তখনও তেমন হয় নাই। গান্ধীজীর পরামর্শে গ্রামবাসীর সঙ্গে কংগ্রেসের এই যোগসাধন ঘটিল ১৯৩৬ সালে। সাধারণ দেশবাসীর সঙ্গে কংগ্রেসের আঙ্গিক যোগসাধনের আকাঙ্ক্ষায় গান্ধীজী গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করার পরামর্শ দান করেন। ১৯৩৬ সালের ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত ফৈজপুর গ্রামে মহাত্মাজীর পরামর্শ অনুসারেই কংগ্রেসের এক অধিবেশন হইল। অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিলেন পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু।

রাজনীতির সঙ্গে দেশের মাটির, জনসাধারণের যোগসাধন এই প্রথম স্থাপিত হইল। লক্ষাধিক গ্রামবাসী মাটিতে বসিয়া নীরবে কংগ্রেসের কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করিতেছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা নেতাগণের বিতর্ক ও বক্তৃতা মন দিয়া শুনিতেছেন—এ দৃশ্য কংগ্রেসের ইতিহাসে সত্যসত্যই অভিনব।

গ্রামাঞ্চলের এই প্রথম কংগ্রেসের প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন গান্ধীজীই। 'ঝাণ্ডাচকে' জাতীয় পতাকাকে তিনি বন্দনা করিলেন, যেন তাহারই মধ্য দিয়া তিনি সারা ভারতের গ্রামবাসীদের প্রণতি জানাইলেন।

গান্ধীজীর নির্দ্দেশে এই যে কংগ্রেসের অধিবেশন গ্রামাঞ্চলে আহূত হইয়া-

ছিল—ইহা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ বলিয়াই মনে হয়। যে গ্রামোন্নয়নের কার্য্যে তিনি তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহারই পরিপোষক হিসাবে তাঁহার দ্বারা এই নীতি উদ্ভাবিত হইয়াছিল। তিনি কল্পনা করিয়াছিলেন যে, প্রতি বৎসর যদি এইরূপে পল্লীতে পল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে পল্লীর নিভৃত কোণে পর্য্যন্ত জাতীয়তাবোধ জাগিবে, পল্লীবাসীগণও নূতন জীবন লাভ করিয়া সমৃদ্ধ হইযা উঠিবে। গান্ধীজীর মধ্যে দ্রষ্টার দূরদৃষ্টি ছিল বলিয়াই তিনি দেশকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য এইরূপ কত অভিনব উপায়ই না উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন!

চুয়ান্ন

বন্দী-মুক্তি আন্দোলনে ও সত্যের মর্য্যাদা-রক্ষায়

১৯৩৭ সালের পয়লা এপ্রিল তারিখে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইলে দেশে রাজনৈতিক বন্দীদিগের মুক্তির জন্য এক তুমুল আন্দোলন সুরু হয়। দেশবাসী এই সময়ে এই জিনিসটি উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়বোধ করিতে থাকে যে দেশকে ভালবাসার অপরাধে কেন অসংখ্য ভারতবাসী কারাগারের লৌহদ্বারের অন্তরালে অবরুদ্ধ থাকিবে? রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য এই সময়ে দেশের মধ্যে একটা আন্দোলন সুরু হয়। এই মুক্তি-আন্দোলনে গান্ধীজী অগ্রণী হন। তিনি বাংলা-সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে কথাবার্ত্তা চালাইতে আরম্ভ করেন এবং এই সম্পর্কে ১৯৩৭ সালের ২৬শে অক্টোবর কলিকাতায় এক অনশন ব্রত পালন করেন। কলিকাতায় অবস্থান-কালে তিনি বাংলার তদানীন্তন গবর্ণর সার জন এণ্ডারসনের সহিত রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ঐ সময়েই তিনি আলীপুরের সেণ্ট্রাল জেল, প্রেসিডেন্সী জেল ও হাওড়া জেলে গমন করিয়া রাজনৈতিক বন্দীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

যাঁহার আদর্শে, যাঁহার মহাবাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশের জনসাধারণ অসত্য, অন্যায়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সত্যের পূজারীর সাক্ষাৎলাভ করিয়া নূতন শক্তি ও কর্ম্মপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহারই প্রভাবে, তাঁহারই যুক্তিতে শেষ পর্য্যন্ত বাংলা-সরকার ১,১০৭ জন রাজবন্দীকে মুক্তিদান করিলেন।

পুনরায় রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি-সম্পর্কে কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য ১৯৩৮ সালে গান্ধীজী আর একবার কলিকাতায় আসেন। কারাগারের লৌহদ্বারের অন্তরাল হইতে কি এক আমোঘ অকর্ষণে তাঁহারই মন্ত্র-দীক্ষিত

সত্যাগ্রহীগণ যেন তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতেছিল। তিনি সেই আহ্বান, সেই আকর্ষণ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।

এবার মাসাধিক কাল কলিকাতায় থাকিয়া তিনি বাংলার গবর্ণর লর্ড ব্রেবোর্ণের সহিত বন্দীমুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

বন্দীমুক্তির জন্য আন্দোলন করার সঙ্গে সঙ্গে এই সময়ে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যও গান্ধীজীকে এক অনশন-ব্রত পালন করিতে হয়। রাজকোট রাজ্যের শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে সর্দ্দার প্যাটেলের সহিত ঠাকুর সাহেবের এক চুক্তি হইয়াছিল। কিন্তু ঠাকুর সাহেব সেই চুক্তি পালন না করায় ঠাকুর সাহেবের প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্তের জন্য গান্ধীজী অনশন করেন। শেষ পর্য্যন্ত রাজকোট সমস্যার মীমাংসা সম্পর্কে বড়লাটের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি পাইযা গান্ধীজী তাঁহার অনশন ভঙ্গ করেন।

সত্যের পূজারী যেখানেই সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে দেখিযাছেন সেইখানেই বিদ্রোহ করিয়াছেন, অথবা অনুতপ্ত হৃদযে অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। এই অনশন ব্রত পালনের দ্বারা তিনি নিজের শুদ্ধি করিয়াছেন, বিরুদ্ধপক্ষেরও অজ্ঞানতা, অন্ধতা দূর করিযা তাহাদিগের সম্বিৎ ফিরাইযা আনিয়াছেন।

পঞ্চান্ন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও গান্ধীজীর কংগ্রেস-নেতৃত্ব

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সমস্ত ইউরোপে দ্বিতীয় মহাসমরের দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। একে একে ইউরোপের সকল দেশ এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লিপ্ত হইয়া পড়িল।

পরাধীন দেশ ভারতবর্ষ···তাই তাহার মতামতের কোন মূল্য ছিল না সাম্রাজ্যবাদী সাম্রাজ্যলোলুপ স্বার্থান্বেষী ইংরাজের কাছে। সুতরাং দুর্ভাগা ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধে লিপ্ত বলিযা ঘোষণা করিল—যুদ্ধের দুর্ভোগের মধ্যে ভারতবর্ষকে টানিয়া নামান হইল। এ বিষয়ে ভারতের কোন মতামতই লওয়া হইল না।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধে যোগদান করিবার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই ভারতবর্ষে ভারতরক্ষা আইনের প্রবর্ত্তন হইল। বিশেষ ক্ষমতার সাহায্যে ভারতের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবার সঙ্কল্প ভারত-সরকার গ্রহণ করিলেন। যুদ্ধের অনুকূল নহে এমন সকল প্রচেষ্টা বা আন্দোলনকে দমন করার দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন ভারত-সরকার।

ভারত-সরকারের এই স্বেচ্ছাচারিতায় গান্ধীজী বিক্ষুব্ধ হইলেন, চঞ্চল হইলেন। তিনি এই সময়ে পুনরায় কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহারই নির্দ্দেশে বলপূর্ব্বক যুদ্ধের বোঝা ভারতের উপর চাপানোর প্রতিবাদে কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রিত্বভার পরিত্যাগ করিল। গান্ধীজী নিজে তখন সত্যাগ্রহ করিয়া যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য্য সুরু করিবার পরামর্শ দান করিলেন।

এই সময়ে ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে বৈঠক হইল, তাহাতে গান্ধীজীর নির্দ্দেশেই স্থির হয় যে, ব্যাপকভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন না করিয়া যুদ্ধের বিরুদ্ধে জাতির প্রতিবাদ প্রচারের জন্য একক সত্যাগ্রহ প্রবর্ত্তন

করিতে হইবে। স্থির হয় যে, গান্ধীজী নিজে যাঁহাদিগকে সত্যাগ্রহীরূপে মনোনীত করিবেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই সত্যাগ্রহ করিতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত বিনোবা ভাবেকে গান্ধীজী প্রথম সত্যাগ্রহীরূপে ঘোষণা করেন। বিনোবা যুদ্ধ-বিরোধী বক্তৃতা দিয়া সত্যাগ্রহ সংগ্রাম সুরু করেন। ফলে তিনি গ্রেপ্তার হন। অতঃপর দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী হন পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু। তিনিও গ্রেপ্তার হইলেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যুদ্ধ-বিরোধী বক্তৃতা করিয়া বন্দী হইলেন।

অতঃপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সহযোগিতা না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া পরিব্রাজক সত্যাগ্রহীদল দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া গেলেন। ফলে একে একে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণসহ বহু কংগ্রেস-নেতা ও বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী কারারুদ্ধ হইলেন। মহাত্মা গান্ধীর মতানুসরণ করিয়া ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ, রাষ্ট্রীয়-পরিষদ, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সদস্যগণ, মন্ত্রীগণ ও পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীবর্গ যুদ্ধের বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করিয়া কারাবরণ করিলেন। ইহার ফলে সমগ্র বিশ্বের নিকট এই কথাটি বেশ স্পষ্টভাবেই প্রচারিত হইল যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ভারতের জনগণের কোন সহানুভূতিই নাই।

ঘটনার আবর্ত্ত এইভাবে চলিয়াছিল। ইতিমধ্যে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথমভাগে জাপান যুদ্ধে যোগদান করিল। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের অবস্থা অতিশয় সঙ্কটময় হইয়া উঠিল। ব্রিটিশ শক্তি ইউরোপে জার্ম্মানীর আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইতেছিল। এক্ষণে প্রাচ্যে জাপান তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায় ব্রিটিশ শক্তির সম্মুখে যুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধি পাইল। ঝড়ের মত দুর্ব্বার বেগে ইণ্ডোচীন, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশগুলি জাপান কর্ত্তৃক কবলিত হইল। জাপান বর্ম্মা দখল করিয়া একেবারে ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে আসিয়া হানা দিবার উপক্রম করিল।

এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এমন কি চার্চ্চিলের

মত সাবধানী রক্ষণশীলদেরও টনক নড়িল। এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারত যাহাতে আন্তরিকতার সহিত ব্রিটিশ জাতির সমরের উদ্যমে সহায় হয় সেজন্য তাঁহারা সচেষ্ট হইলেন। ভারতের সহিত একটা আপোষের জন্য ব্রিটিশ সরকার উন্মুখ হইলেন। তাঁহারা স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী ভারতের কাছে এক শাসন-সংস্কার প্রস্তাব করিয়া স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস্‌কে ভারতে পাঠাইযা দিলেন।

মিঃ ক্রিপস্ ভারতে আসিযা স্বাধীনতাকামী ভারতকে যে শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব দান করিলেন তাহাতে স্বাধীনতার আভাসমাত্রও ছিল না, ভারত-বাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোন সুদূর উদ্দেশ্যও তাহাতে ছিল না। ছিল কেবল ভবিষ্যতের সম্বন্ধে নানান্ স্তোকবাক্য। এই প্রস্তাবে দেশরক্ষা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইংরাজদের হাতেই ন্যস্ত রাখার সিদ্ধান্ত ছিল। আর কংগ্রেস যে হিন্দু-মুসলমানের অখণ্ড ভারতের কথা এতদিন বলিযা আসিতেছিলেন, প্রস্তাবে তাহাও স্বীকার করা হয় নাই। সুতরাং গান্ধীজী ঘৃণাভরে ক্রীপসের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিযা বলিলেন, ইহা হইল দেউলিযা ব্যাঙ্কের উপর মেযাদী চেক, যাহা হইতে কিছু পাওযার আশা নাই কোনকালেই।

ক্রীপস্ সাহেব দেশে ফিরিলেন। তাঁহার দৌত্য ব্যর্থ হইল। এইবার ভারতীয় কংগ্রেসের সহিত ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু হইল।

গান্ধীজী তাঁহার 'হরিজন' পত্রিকায ব্রিটিশ শাসকদিগকে উদ্দেশ্য করিযা লিখিলেন—হে ইংরাজ—তোমরা ভারত ত্যাগ কর। ইহাতে তোমাদেরও মঙ্গল, ভারতেরও মঙ্গল।

ভারতের নিভৃততম অঞ্চলেও গান্ধীজীর এই স্পষ্ট নির্ভীক উক্তি সাড়া পাইল। সর্ব্বত্র তাঁহার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইযা ভারতবর্ষময ধ্বনিত হইতে লাগিল, 'হে ব্রিটিশরাজ! তোমরা ভারত ত্যাগ কর!'

কংগ্রেস বলিল, "ইংরাজ তাহার এই ঘোর দুর্দ্দিনে ভারতের সাহায্য চায়। কিন্তু তাহা ক্রীতদাসের সাহায্য। ভারত এই ক্রীতদাসত্ব বরণ করিয়া যুদ্ধে ইংরাজের সহাযতা কিছুতেই করিবে না।"

ছাপ্পান্ন

আগষ্ট বিপ্লব বা ভারত-ছাড় আন্দোলন

সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের পীড়ন ও শোষণ লক্ষ্য করিয়া, ভারতের স্বাধীন সত্তাকে অস্বীকার করিয়া তাহার উপর যুদ্ধের ভার চাপাইয়া দিবার দৃষ্টান্ত দেখিয়া গান্ধীজী যেরূপ দৃঢ়তার সহিত ইংরাজকে ভারত ত্যাগ করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, সেইরূপ অনুভূতি বহু পূর্ব্বকাল হইতেই ভারতের মাটিতে ধূমায়িত হইতেছিল। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে বাংলার প্রাদেশিক কনফারেন্সে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজকে ছয় মাসের মধ্যে ভারত ত্যাগ করিবার দাবী জানান হইয়াছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে। ইহার পর বৎসর সুভাষচন্দ্র যখন ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতিরূপে 'ভারত ত্যাগ কর' এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন তখনও ইংরাজদের সদিচ্ছার উপর গান্ধীজী ও ভারতের কোন কোন নেতার বিশ্বাস ছিল। তাই তখন সুভাষচন্দ্র কর্ত্তৃক উত্থাপিত 'ভারত ত্যাগ কর' এই প্রস্তাব গান্ধীজী প্রমুখ দেশনেতাগণ সমর্থন করেন নাই। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষা, ভারতের স্বাধীনতার সাধনাকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ ক্রমাগতই পদদলিত করিতেছে ইহা লক্ষ্য করিযা গান্ধীজী ইংরাজের উপর সমস্ত আস্থাটুকু হারাইয়া ফেলিলেন। গান্ধীজী পৃথিবীকে দেখাইলেন যে ভারতীয়গণ চরম ধৈর্য্যের সহিত, সহনশীলতার সহিত ইংরাজের শুভবুদ্ধির ও সদ্‌বুদ্ধির প্রত্যাশা করিযা আসিয়া পরিশেষে নিতান্ত বাধ্য হইযাই 'ভারত ত্যাগ কর' এই চরম নির্দ্দেশ ইংরাজকে দান করিয়াছে।

১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট তারিখে কংগ্রেস গান্ধীজীর এই 'ভারত ত্যাগ কর' প্রস্তাব সমর্থন করিয়া দাবী জানাইলেন যে, হয় ইংরাজ ভারতবাসী ও পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য ভারতের স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করিবে, নতুবা ভারতবর্ষ স্বাধীনতার জন্য ব্যাপক সংগ্রাম সুরু করিবে। দেশের নেতাগণের সহিত গান্ধীজীর বহু আলাপ-আলোচনা হইল। সকল সংগ্রামের অধিনায়ক

গান্ধীজীকেই কংগ্রেস পুনরায় সেনাপতি পদে বরণ করিলেন। বহুদিন হইতেই তিনি ভারতীয়দিগকে স্বাধীনতা সংগ্রামে নিয়ন্ত্রিত করিতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগাইয়াছিলেন—স্বাধীনতার জন্য গঠনমূলক কার্য্যাবলীর প্রযোজনীয়তা ভারতীয়দিগকে উপলব্ধি করাইয়াছিলেন। সুতরাং এই চরম মুহূর্ত্তেও তিনি জাতির কর্ত্তব্য-নিরূপণের, সংগ্রামের পদ্ধতি স্থিরীকরণের ভার পাইলেন।

গান্ধীজী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, এবারকার এই স্বাধীনতার সংগ্রামে হয় কংগ্রেস জয়লাভ করিবে, নতুবা মৃত্যু বরণ করিবে। জগতের রক্তচক্ষু দেখিয়া ভারত পিছাইবে না, অগ্রসর হইয়া যাইবে। গান্ধীজীর এই ঘোষণায় ভারতীয়দের মধ্যে পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের আকাঙ্ক্ষা দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল।

ভারত তাঁহার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সংগ্রামের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। দীর্ঘকাল দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া, সাম্রাজ্যবাদী সরকারের চরম অত্যাচারে ও নিষ্পেষণে নিপীড়িত হইয়া দেশবাসীর দেহ তখন জর্জ্জরিত অবসন্ন। কিন্তু মানসিক শক্তি তখনও দুর্জ্জয—শক্তিশালী। তাই গান্ধীজীর বজ্রকণ্ঠ-সমুত্থিত 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব ভারতবাসীর মনে যেন আগুনের পরশমণি ছোঁযাইল। ভারতবাসী অসীম শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। ভারতবাসীর মধ্যে ঘুমন্ত শক্তির জাগরণ ও উল্লাস গান্ধীজী অনতিকালমধ্যেই উপলব্ধি করিলেন।

গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্তে বৃটেন ও আমেরিকা ক্রোধে ও বিরক্তিতে কংগ্রেসকে অনেক ভয দেখাইতে লাগিল। কিন্তু গান্ধীজী বলিলেন, 'কংগ্রেস এসব হুমকীতে ভয পাইবে না। ইহা হইল হিষ্টিরিযা রোগীর আক্ষেপ ও চীৎকার, এ চীৎকার আর এ হুমকী ভারতের বুকে স্বাধীনতালাভের যে অনির্ব্বাণ দীপশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহাকে নিভাইতে পারিবে না। স্বাধীন ভারত এ বিশ্বযুদ্ধে এক গৌরবময় ভূমিকাই গ্রহণ করিবে।'

গান্ধীজী আগষ্ট প্রস্তাবের মর্ম্ম ভারত সরকারকে জানাইয়া দিলেন।

তাহাতে স্পষ্ট নির্দ্দেশ ছিল—ইংরাজকে ভারত ছাড়িতে হইবে। ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। এই দাবী পূরণ না হইলে দেশময় ব্যাপক অহিংস গণ-আন্দোলনের সুরু করা হইবে এবং সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব করিবেন তিনি নিজে।

গান্ধীজীর এই আহ্বানে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ বিচলিত হইল। ৮ই আগষ্ট রাত্রি দশটায় কংগ্রেস কমিটির সভা শেষ হইয়াছিল। কিন্তু সেই রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হইলেন, আর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ভারত-রক্ষা আইনের বলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সকল সভ্যই বন্দী হইলেন।

৯ই আগষ্ট সকাল হইতেই সুরু হইল সরকারী চণ্ডনীতি। দেশকে ভারতরক্ষা আইনের নাগপাশে বাঁধা হইল। কংগ্রেসী নেতাগণ একে একে বন্দী হইতে লাগিলেন। বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো ভাবিলেন, কংগ্রেসী নেতাদিগকে বন্দী করিলেই বুঝি বা জাগ্রত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের তরঙ্গকে প্রতিহত করা সম্ভব হইবে। কিন্তু মুক্তিপিপাসু ভারত শাসনশক্তির শত অত্যাচারেও হতোদ্যম হইল না। তাহারা গান্ধীজীর মন্ত্র কণ্ঠে লইয়া 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতনে'র জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল।

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার মূলোৎপাটন করিবার জন্য সুরু হইল অমানুষিক নির্য্যাতন। সমস্ত কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক বে-আইনী ঘোষিত হইল। সংবাদপত্রের উপর অনেক রকমের বিধিনিষেধ আরোপিত হইল। প্রতিবাদে কত সংবাদপত্র বন্ধ হইয়া গেল। তথাপি স্বাধীনতালাভের জন্য যে দুর্জ্জয় শক্তিতে দেশবাসী উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিল তাহা হ্রাস প্রাপ্ত হইল না। বরং সরকারী নির্য্যাতন এবং বন্ধন যত কঠিন হইতে লাগিল, দেশবাসীর অন্তরে সেই নির্য্যাতন হইতে মুক্তিলাভ করিবার, সেই বন্ধন ছিন্ন করিবার বাসনা তত প্রবল হইতে লাগিল।

মহাত্মাজীর নির্দ্দেশ অনুসারে ভারতবাসীগণ অহিংস উপায়েই 'ভারত ছাড'

আন্দোলন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু বিনা বিচারে অকস্মাৎ দেশনেতাগণের গ্রেপ্তারে এবং এখানে-ওখানে সরকারের অহেতুক অত্যাচারে ভারতবাসীরা রোষে ক্ষোভে অপমানে গর্জ্জিযা উঠিল। বিদেশী-শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের বুকে এক বিক্ষোভ তিল তিল করিয়া পুঞ্জীভূত হইযা উঠিয়াছিল। এই সময়ে তাহা আগ্নেয়গিরির মত অগ্ন্যুদ্‌গারী হইয়া উঠিল।

ভারত হইতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য সমস্ত ভারতে এক তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হইল। ভারতের ইতিহাসে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর সমগ্র দেশ জোড়া এত বড় গণবিপ্লব আর কখনও হয় নাই।

বহুস্থানে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিল। বাংলায় মেদিনীপুরের কোন কোন অঞ্চলে, যুক্ত প্রদেশের বালিযায, ছত্রপতি শিবাজীর লীলাভূমি সাতাবায সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের অবসান সত্যই ঘটিল। সেই সকল স্থানে ইউনিযন জ্যাকের পরিবর্ত্তে উড্ডীন হইল ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা এবং সেইসকল স্থানে প্রায় দুইবৎসরকাল ধরিযা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকিল।

সরকার জাতির এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে দমন করার জন্য নানারকম অত্যাচার করিতে সুরু করিল। লাঠির আঘাত করিযা, গুলি চালাইযা, লোকের ঘরে আগুন জ্বালাইযা দিযা, লোকের বাস্তুভিটা লাঙ্গল দিযা চষিযা সমভূমি করিযা দিযা, নারীদিগের উপর নির্ম্মম অত্যাচার করিয়া, শিশুদিগকে প্রহার করিযা সরকার ভারতে ব্রিটিশ শাসন কায়েমী রাখার জন্য তৎপর হইল। কোথাও কোথাও জনতার উপর বিমান হইতে বোমা বর্ষিতও হইল।

কিন্তু সরকারের অত্যাচারের মাত্রা যত বাড়িতেছিল, ভারতের জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লবের বহ্নি ততই প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। বিপ্লবীরাও সরকারী থানা, ডাকঘর, অফিস-আদালাত, রেলগাড়ী, রেলষ্টেশন পুড়াইযা

দিল, রেলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিল। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ-সরবরাহকে অচল করিল। অমানুষিক অত্যাচারেও মুক্তিকামী ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দমন করা সম্ভব হইল না সরকারের পক্ষে। এই আন্দোলনের সময়ে আবালবৃদ্ধবনিতা সামরিক সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণকেও উপেক্ষা করিয়া বীরদর্পে সরকারের হাত হইতে ক্ষমতা কড়িয়া লইতে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ইহাতে শত সহস্র দেশপ্রেমিককে মৃত্যু বরণ করিতে হইযাছে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের নেশায় হাসিমুখেই দেশবাসী মৃত্যু বরণ করিয়াছে।

গান্ধীজীর দেওয়া স্বাধীনতা-মন্ত্রে দীক্ষিত বহু দেশপ্রেমিক বীর ও বীরাঙ্গনা আত্মাহুতি দিযা দেশের সকলকে দেখাইযা দিলেন স্বাধীনতা লাভের স্বর্ণপথ।

যেসকল স্থান কংগ্রেস-পন্থীরা দখল করিয়া লইযাছিলেন সেই সকল স্থানে স্থাপিত হইল জাতীয়-সরকার। এই-জাতীয় সরকার পরিচালনার জন্য নিযুক্ত হইলেন একজন সর্ব্বাধিনাযক। তাঁহার অধীনে আইন ও শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, শাসন বিচার, কৃষি ও প্রচার বিভাগের জন্য মন্ত্রীরা নিযুক্ত হইলেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার জাতীয়-সরকারই করিতে লাগিলেন। জাতীয়-সরকারের নিজস্ব সামরিক বাহিনীও গঠিত হইল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দেশে দেশে কেবল বিদ্রোহের আগুন জ্বালিযাই স্বাধীনতাকামী ভারতীয়েরা ক্ষান্ত হয় নাই। বিদেশী শাসন-ব্যবস্থা অচল করিয়া দিযা তাহারা গঠনমূলক কার্য্যেও মনোনিবেশ করিযাছিল। দেশের আইন, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শাসন, কৃষি ও প্রচার-সকল কার্য্যের প্রতিও তাহারা মনোযোগী হইয়াছিল।

এই আন্দোলনে দেখা গেল গান্ধীজী ভারতে কেবল স্বাধীনতা লাভের উদ্দীপনা প্রদীপ্ত করেন নাই, স্বাধীনতা লাভ করিয়া সেই স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রেরণাও তিনি দেশের মধ্যে জাগাইয়াছেন।

এই যে বিরাট আন্দোলনের সুচনা হইয়াছিল ১৯৪২ সালে—ইহা ছিল

শিবহীন যজ্ঞের মত গান্ধীবিহীন—নেতাবিহীন আন্দোলন। ইহাতে স্থানে স্থানে যে সকল ঘটনা ঘটিল তাহার জন্য সরকার দায়ী করিলেন—গান্ধীজীকে ও কংগ্রেসেকে। অহিংসার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া তিনি নাকি এতদিন দেশে বিদ্রোহের বীজ বপন করিতেছিলেন—এমনি কথা সরকার রটনা করিলেন।

সরকারের এইরূপ মিথ্যা প্রচারে গান্ধীজী কারাগারের অন্তরাল হইতে ইহার বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলেন—অসত্য প্রচারের বিরুদ্ধে তাঁহার সত্যাশ্রয়ী অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তিনি তখন অসুস্থ। কিন্তু সেই অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি বন্দীনিবাস আগা খাঁ প্রাসাদে একুশ দিনের জন্য উপবাস আরম্ভ করিলেন, এবং সরকারী চণ্ডনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার নিমিত্ত অনশন পালনের পূর্ব্বে বড়লাটকে এক পত্র দিয়া তিনি জানাইয়াছিলেন যে উনিশ শত বিয়াল্লিশ সালের স্বতঃস্ফূর্ত্ত গণ-অভ্যুত্থানের জন্য স্বেচ্ছাচারী ব্রিটিশ সরকারই দায়ী।

ঐ সময়ে ভারত-সরকার কতকগুলি সর্ত্তাধীনে তাঁহাকে মুক্তি দিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন।

১৯৪৪ সালের ৬ই মে তারিখে তিনি বিনা সর্ত্তে মুক্তিলাভ করিলেন। ইতিমধ্যে কারাগারে অবস্থানকালে তিনি তাঁহার পত্নী কস্তুরবাঈকে এবং প্রিয়তম ভক্ত ও অনুগত শিষ্য মহাদেব দেশাইকে হারাইয়াছিলেন।

গান্ধীজীর মুক্তিলাভের পর একে একে অন্যান্য দেশনেতারাও মুক্তিলাভ করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কারামুক্ত হইযাই আগষ্ট বিপ্লবী-দগকে অভিনন্দন জানাইয়া বলিলেন—"১৯৪২ সালের ঘটনাবলীর জন্য আমি গর্ব্ববোধ করি। নেতাবিহীন হইয়া লোকেরা যদি নতি স্বীকার করিত সরকারের কাছে, তাহা হইলে আমি খুব দুঃখিতই হইতাম। কেননা তাহাতে কাপুরুষতার পরিচয়ই দেওয়া হইত। নেতা নাই, সংগঠন নাই, নাই কোন উদ্যোগ-আযোজন, কোন অস্ত্রবল, কোন সাজসজ্জা, অথচ একটা অসহায় জাতি

স্বতঃস্ফূর্ত্ত কর্ম্মশক্তি দ্বারা একটা প্রবল পরাক্রান্ত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। ইহা সত্যই বিপুল বিস্ময়ের ব্যাপার।"

বাস্তবিক পক্ষে গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের পরবর্ত্তী অধ্যায়ই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সফলতার অধ্যায়। ইহার ফলেই ভারতে দীর্ঘ দুইশত বৎসরের ব্রিটিশ শাসনের দৃঢ় ভিত্তি শিথিল হইল। আজ ভারত যে স্বাধীনতাটুকু লাভ করিয়াছে তাহার মূলে প্রধানতঃ এই উনিশ শ' বিয়াল্লিশ সালের 'ভারত-ছাড়' আন্দোলন রহিয়াছে একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় ভারতীয়দিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ সংগ্রাম, অসহযোগ আন্দোলন ও আইন-অমান্য আন্দোলন এবং এই বিরাট ও ব্যাপক 'ভারত-ছাড়' আন্দোলন—এ সমস্তই গান্ধীজীর বিশেষ দান। পরাধীন জাতির মর্য্যাদা ও স্বাধীনতালাভের জন্য গান্ধীজী কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত এই সকল উপায় বিশ্বের সকল জাতির বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। ভারতীয়েরা তাহাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অধিনায়কের এই সকল অবদানের কথা কোনদিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

সাতান্ন

আগষ্ট আন্দোলনের পর

আগষ্ট বিপ্লবের বহ্নি তখনও সম্পূর্ণরূপে নির্ভিয়া যায় নাই। বিপ্লবের আগুন তখনও কোথাও কোথাও দেখা যাইতেছিল। সরকারের অত্যাচারে ও নিপীড়নে দেশবাসী তখনও মৃতবৎ। দেহ তাদের অবসন্ন, কিন্তু মানসিক শক্তি তখনও অক্ষুণ্ণ। সেই মনোবলকে নষ্ট করিবার জন্য সরকার নানারকম কূট-চক্রান্ত করিতেছিলেন। জাপানের আর সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর আশঙ্কায় সরকার দেশের খাদ্যশস্য কোথায় যেন সব গোপন করিলেন। দেশের মাটিতে চোরাকারবারের জন্মলাভ হইল। সরকারী দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইয়াই চলিল। তাহার সহিত মিলিত হইল বাংলার মেদিনীপুর অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ। ফলে বাংলায় এক ভীষণ মন্বন্তরের আভাস দেখা গেল। সরকার পূর্ব্বাহ্নে এবিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিলেন না। ফলে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ঘটিল। সরকারী দুর্নীতিতে পঞ্চাশের (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) মহামন্বন্তর আসিল। ইহাতে অনাহারে ও আধিব্যাধিতে লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেল। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা এক অতিশয় ভীষণ আকার ধারণ করিল। দুর্ভিক্ষের ও সাম্প্রদায়িকতার পৈশাচিক নৃত্যে দেশ কলঙ্কিত হইয়া উঠিল।

তখনও কংগ্রেস নেতারা সকলেই কারাবদ্ধ। তাই তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে মুসলিম লীগ কর্ত্তৃক দুই জাতির নীতি ভারতময় প্রচারিত হইতেছিল। প্রচারিত হইতেছিল যে, কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান এবং হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই কংগ্রেসের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং মুসলমানদের জন্য পাকিস্থান বা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার বিশেষ প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন, মুসলমানদিগের স্বার্থ-রক্ষার আর অন্য কোন উপায়ই নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীগণ ভারতের উপর তাঁহাদের অধিকার কায়েমী রাখিবার জন্যই দেশের মধ্যে এমনিতর বিভেদ

অতিশয় সাবধানতার সহিত সৃষ্টি করিলেন। এই বিভেদ সৃষ্টির পটভূমিকার অন্তরালে তাঁহারা রহিয়া গেলেন। আপাতঃদৃষ্টিতে তাঁহাদের দুরভিসন্ধিমূলক কার্য্যকলাপ ধরা পড়িল না।

দেশের এমনি সঙ্কটজনক পরিস্থিতি যখন, তখন গান্ধীজী কারামুক্ত হইলেন। ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া তিনি কারামুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু মুক্তিলাভ করিয়া দেশের কালিমাময় দৃশ্য দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। আগষ্ট বিপ্লবে, ব্রিটিশ সরকারের দানবীয় অত্যাচারে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে ভারত জর্জ্জরিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছিল সাম্প্রদায়িক কলহ। সুতরাং তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সরকারী দুর্নীতিমূলক কার্য্যকলাপের দ্বারা কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইযাছে তাহা লক্ষ্য করিযা গান্ধীজী মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইলেন। অন্যান্য কংগ্রেস নেতাগণ মুক্তিলাভ করিয়া আগষ্ট বিপ্লবের জন্য দেশবাসীকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর অন্তর চিরকালই হিংসার পরিপন্থী ছিল। তাই তিনি জনগণের হিংসামূলক কার্য্যের সমর্থন করিলেন না এবং অবিলম্বে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে প্রতিরোধ করিয়া দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে পুনরায় শক্তিশালী ও হিংসার কলুষতা মুক্ত করিবার জন্য তিনি সচেষ্ট হইলেন।

ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়াই তিনি কাজে নামিলেন। আজীবনের অক্লান্ত সাধনায স্বাধীন ভারতের যে স্বপ্নসৌধ তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা সাম্রাজ্যবাদী কূটনৈতিকগণের চক্রান্তে ধূলিসাৎ হইবার উপক্রম হইয়াছে লক্ষ্য করিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না।

ভারতের বড়লাট তখন লর্ড ওয়াভেল। আশার আলোকবর্ত্তিকা অন্তরে জ্বালিয়া লইয়া ওয়াভেলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি ভারত-সমস্যার আলোচনা করিতে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল। অতঃপর সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসাকল্পে তিনি জিন্না সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সে আলোচনাও ব্যর্থ হইল। মিঃ জিন্না দুই জাতির যে নীতি

উত্থাপন করিলেন, গান্ধীজী তাহাতে সায় দিতে পারিলেন না। কারণ চিরদিনই তিনি ছিলেন অখণ্ড ভারতে বিশ্বাসী।

১৯৪৫ সালের মে মাসে কংগ্রেস কমিটির সভ্যেরা মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিযাছে। যুদ্ধের পরে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য গান্ধীজী এক পরিকল্পনা রচনা করেন। 'গান্ধী পরিকল্পনা' নামে পরিচিত এই খসড়ার লক্ষ্য হইল গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি যাবতীয় বিষযের উন্নতিসাধন।

১৯৪৫ সালে কংগ্রেসী নেতাগণের মুক্তির পর হইতে ভারত ইতিহাসের দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। '৪৫ সালের জুন মাসে লর্ড ওয়াভেল ভারতের অচল অবস্থার অবসানকল্পে সিমলায দেশনেতাদের এক সম্মেলন আহ্বান করিলেন। ব্রিটিশ প্রস্তাব সম্পর্কে সেখানে আলোচনা করা হয, কিন্তু প্রতিক্রিযাশীল শক্তির চক্রান্তে এই আলোচনা ব্যর্থ হয। মহাত্মা গান্ধী বৈঠকের সমযে সিমলায উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের ব্যর্থতায় ভারত সাম্রাজ্যবাদীদিগের শোষণ হইতে মুক্ত হইল না লক্ষ্য করিযা তিনি ব্যথিত হইলেন। কিন্তু তিনি পথভ্রান্ত হইলেন না। ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয জুড়িযা রহিল।

এই বৎসরের ২৪শে ডিসেম্বর তিনি মেদিনীপুর সফরের উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইযা মেদিনীপুর গমন করেন। কলিকাতায বাংলার তৎকালীন গভর্ণর মিঃ আর জি কেসী ও বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের সহিত গান্ধীজীর সাক্ষাৎকার ঘটে এবং ইঁহাদের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হয়।

মেদিনীপুরে গিয়া গান্ধীজী ডায়মণ্ডহারবার, তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করেন এবং সেই সঙ্গে তথাকার আগষ্ট আন্দোলনকে, স্বাধীনতার আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য সরকার যে ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহাও প্রত্যক্ষ করেন।

গান্ধীজী তাঁহার এই মেদিনীপুর সফরের সময়েই সর্ব্বপ্রথম প্রার্থনা সভার

প্রবর্ত্তন করেন। তিনি চিরদিনই মানুষের জীবনে প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া আসিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রার্থনার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিতেন, সঙ্কটকালে ঈশ্বরের নির্দ্দেশ অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অনুভব করিয়া নিজের কর্ম্মপদ্ধতি নিরূপণ করিতেন। কিন্তু এই সময় হইতে প্রার্থনার দ্বারা যে সম্পদের অধিকারী তিনি নিজে হইয়াছিলেন, জনসাধারণকে—তাঁহার দেশবাসীকেও তিনি সেই সম্পদে সমৃদ্ধ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন।

মানুষের জীবনে প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি বলিতেন যে, "প্রার্থনার দ্বারা মানুষের জীবন শান্ত হইয়া আসে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় যে বিরাট শক্তি রহিয়াছে মানুষ তাহার শান্ত অবস্থায় সেই শক্তির সহিত ঐক্য উপলব্ধি করে।"

বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে যেসকল শ্রেষ্ঠ বাণী রহিয়াছে তিনি সেইসকল সংগ্রহ করিয়া প্রার্থনা সভায় পাঠ করিতেন। সঙ্কীর্ণচেতা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণ অন্য ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে শ্রেষ্ঠ বাণী পাঠে আপত্তি অনেকবার জানাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ ভুলিযা এইরূপ সঙ্কীর্ণচিত্ততার পরিচয় দিতেন। হিন্দু-ধর্ম্মে ভগবানের বিভূতি যেখান হইতেই প্রকাশ পায় তাহাকে গ্রহণ করিবার বিধান রহিয়াছে। অন্ধত্ব বা গোঁড়ামি যে প্রাণবান্ জীবনের কথা নহে, একথা সঙ্কীর্ণচেতা হিন্দুগণ বুঝিতেন না। গোঁড়ামির মধ্যে সচলতা বা সক্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায় না। উহাতে স্থাণুত্বের পরিচয় পাওযা যায়, উহাতে ধ্বংসের বীজ থাকে। কিন্তু গান্ধীজীর মধ্যে কোনপ্রকার সঙ্কীর্ণতার পরিচয় কোনদিনই পাওয়া যায় নাই।

তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়াই সপ্তাহে একদিন মৌনব্রত অবলম্বন করিতেন। ধ্যানস্থ হইয়া প্রার্থনা করিতেন। ইহার দ্বারা তিনি শান্ত জীবনের সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন এবং গীতার নির্দ্দেশিত স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থায় পৌঁছিয়াছিলেন।

প্রার্থনা সভার অন্তে তিনি সমবেত জনগণের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়বোধ জাগ্রত করিবার জন্য, সত্য-অসত্যের বোধ জাগাইবার জন্য, রাজনীতি-ক্ষেত্রে

উচিত-অনুচিত নীতি সম্পর্কে তাঁহার অমূল্য বাণী প্রচার করিতেন। এ সকলের সূত্রপাতও এই মেদিনীপুর সফরের সময় হইতেই হইয়াছিল।

মেদিনীপুর সফর শেষ করিয়া গান্ধীজী কলিকাতা হইয়া আসাম প্রদেশে গমন করেন। আসাম হইতে পুনরায় কলিকাতা হইয়া তিনি মাদ্রাজ গমন করেন এবং তথাকার এক শ্রমিক-সভায় বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, শ্রমিকেরাই কারখানার প্রকৃত মালিক। এই উক্তি করিয়া গান্ধীজী সেদিন নিপীড়িত মানবের হইযা তর্জনী তুলিযা পুঁজিবাদী লক্ষপতিদিগকেই শাসাইযাছিলেন।

ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলে রক্ষণশীল দলের পরাজয ঘটে এবং শ্রমিকদল গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হন। এই নূতন গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে-সকল আইন ছিল তাহা প্রত্যাহার করিয়া কংগ্রেসকে বৈধ বলিয়া স্বীকার করেন এবং বড়লাট লর্ড ওয়াভেলকে ভারতীয সমস্যার সমাধানের জন্য পরামর্শ করিতে বিলাতে আহ্বান করেন। ভারতের সর্ব্বত্র ব্যবস্থাপক সভারও নূতন নির্ব্বাচনের আদেশ বাহির হয়।

ভারতের এই নূতন নির্ব্বাচনে কংগ্রেস অনাযাসে আটটি প্রদেশে সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়া মন্ত্রীসভা গঠন করিল।

অতঃপর ১৯৪৬ সালে মার্চ্চ মাসের শেষের দিকে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ্যাটলীর ঘোষণা-মত এক মন্ত্রী-মিশন ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র রচনা করিবার উদ্দেশ্যে ভারতে আসিলেন। এই দলে ছিলেন ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ আর মিঃ এ. ভি. এ্যালেকজাণ্ডার। এই মন্ত্রীমিশন ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারতীয নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করিবার জন্য আসিযাছিলেন।

সিমলায় মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের সহিত বড়লাট ও বৃটিশ মন্ত্রীসভার সদস্যদিগের সভা হইল। মহাত্মাজী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উদারতার সহিত এবার ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উদারতা ও সদিচ্ছার ভূয়সী প্রশংসা করেন

এবং 'হরিজনে' এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ভারতবাসী গর্ব্ব বোধ করিতে পারে।

দীর্ঘকাল ধরিয়া মন্ত্রী-মিশনের সহিত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যে আলোচনা হইল তাহাতে তিনি উপদেষ্টারূপে কার্য্য করিলেন। মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব তিনি মোটামুটিভাবে সমর্থন করিলেন। তবে 'হরিজনে' এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে ভারত হইতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণের দাবী তিনি জানান। ইহার দ্বারা তিনি ভারতীয়দিগের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারই দাবী করিলেন।

মন্ত্রীমিশনের সহিত আলোচনায় ভারতের দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী লীগ একমত হইতে পারিলেন না। কংগ্রেসের তথা গান্ধীজীরও আদর্শ ছিল অখণ্ড-ভারত রচনা করাব। ভারতবর্ষকে হিন্দু মুসলমান শিখ পার্শী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মিলনতীর্থে পরিণত করিবার জন্য আজীবন সাধনা করিয়াছিলেন গান্ধীজী এবং কংগ্রেসও।

যাহা হউক, মে মাসে মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব ঘোষিত হইল। ইহাতে মুসলিম লীগের দুই জাতিত্ব নীতি প্রত্যক্ষভাবে মানা হইল না বটে, কিন্তু পরোক্ষভাবে উহা স্বীকার করা হইল। এ ছাড়া ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার জন্য গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাব করা হইল এবং নূতন শাসনতন্ত্র রচনা না হওয়া পর্য্যন্ত অন্তর্ব্বর্ত্তী কালের জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে মিলিতভাবে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠন করিতে অনুরোধ জানান হইল।

গান্ধীজীর পরামর্শে কংগ্রেস স্বাধীনতা বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতি লইয়া পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠন করিলেন। লীগদল প্রথমে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে যোগদান করেন নাই। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা ইহাতে যোগদান করিলেন। কিন্তু ক্ষমতা দখলের জন্য সুরু হইল মনোমালিন্যের ইহাই একদিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারত-ব্যবচ্ছেদের পথ প্রস্তুত করিল। কলিকাতা, নোয়াখালি, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সুরু হইল। পৃথিবীকে হিংসা-উন্মত্ত দেখিয়া গান্ধীজী বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

আটান্ন

শান্তি-অভিযানে

মহামানব মহাত্মা গান্ধী যখন দিল্লীতে থাকিয়া স্বাধীনতার দ্বারদেশে উপনীত জাতির পথ-নির্দ্দেশ করিতেছিলেন সেই সময়ে ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য এমন এক আকার ধারণ করিল যাহাতে মহাত্মাজীর আজীবনের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হইবার উপক্রম হইল। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট মুসলিম লীগ কর্ত্তৃক ঘোষিত 'প্রত্যক্ষ-সংগ্রামে'র দিনে কলিকাতা মহানগরীর বুকে যে নারকীয় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সূত্রপাত হইল, তাহা গান্ধীজীকে ব্যথিত করিয়াছিল। কিন্তু গান্ধীজী চিরদিনই ছিলেন আশাবাদী। অন্যায়, অসত্য, অশান্তি, অত্যাচার-অবিচারের ভিতর হইতে ন্যায়, সত্য, শান্তি, শৃঙ্খলা প্রভৃতি উদ্ভূত হইবে ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। তিনি বহুদিন হইতেই বলিয়া আসিতেছিলেন যে—জাতি যখন স্বাধীনতার আলোকরশ্মি দেখিবে তখন এই আত্মঘাতী হানাহানি আর থাকিবে না। স্বাধীন ভারতে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা-বুদ্ধি হইতে উদ্ভূত হিংসার উন্মত্ততা আর থাকিবে না। তখন সকল বিরোধ, সকল প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ বিস্মৃত হইয়া মিলনের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এক জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া সকলে মাতৃভূমির সেবায়ই আত্মনিয়োগ করিবে।

কিন্তু কলিকাতার পরেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হইল নোয়াখালির বিস্তৃত অঞ্চলে। কলিকাতার দাঙ্গা মহানগরীর সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু নোয়াখালির হাঙ্গামা সমগ্র নোয়াখালি জেলায় ছড়াইয়া পড়িল। এই বিস্তৃত অঞ্চলে সংখ্যালঘু হিন্দু-সম্প্রদায়ের উপর দুর্ব্বৃত্ত হিংসাপরায়ণ ধর্ম্মান্ধগণ অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়ন করিল, সংখ্যালঘু হিন্দু-সম্প্রদায়ের বহু নরনারী ও শিশু হিংসার অনলে হতাহত হইল; বহু নারী অপহৃতা হইল, বহু নরনারী বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত হইল, দুর্ব্বৃত্তদের অত্যাচারে বহু গৃহ ভস্মীভূত হইল।

ইহাতে চারিদিকে একটা আতঙ্ক ও ত্রাসেরও সঞ্চার হইল। বিস্তৃত

নোয়াখালি জেলা হইতে দলে দলে সংখ্যালঘু-সম্প্রদায় প্রাণ ও মান রক্ষার জন্য নানাস্থানে আশ্রয়প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল।

মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের এমনিতর পাশব হিংসার তাণ্ডবলীলার কাহিনী শুনিয়া—মানবতার এই জঘন্য অপমানে গান্ধীজীর অন্তরাত্মা কাঁদিয়া উঠিল। অপমানিতা, লাঞ্ছিতা নারীগণের ব্যথাতুর অশ্রুসজল মূর্ত্তি তাঁহার মানসচক্ষে যেন ভাসিয়া উঠিল। ব্যথিতের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ কি এক অব্যক্ত আকর্ষণে যেন তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

দিল্লীতে এক প্রার্থনা-সভায় তিনি বলিলেন, "যেদিন হইতে আমি নোয়াখালির সংবাদ শুনিয়াছি, সেদিন হইতে আমি আমার কর্ত্তব্যের কথা ভাবিতেছি। ঈশ্বর আমাকে পথ দেখাইবেন।"

ঈশ্বরের প্রতি চিরনির্ভরশীল এই মহামানব চিরদিনই তাঁহার অন্তরের অন্তঃকর্ণে ঈশ্বরের নির্দ্দেশ অনুভব করিয়া আসিয়াছিলেন। তাই ভারতের জাতীয় জীবনের এই সঙ্কটকালেও তিনি ঈশ্বরের নির্দ্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন।

২৭শে অক্টোবর (১৯৪৬) গান্ধীজী তাঁহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে নোয়াখালি গমনের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। বক্তৃতায় তিনি বলিলেন, "আমি আগামীকাল সকালে কলিকাতা রওয়ানা হইব, সেখান হইতে নোয়াখালি যাইব মনস্থ করিয়াছি।"

গান্ধীজীর শরীর তখন সুস্থ ছিল না। কাজেই এই দুরূহ ব্রত পালনে ও দীর্ঘপথ ভ্রমণে তাঁহাকে তাঁহার জনৈক বন্ধু নিবৃত্ত করিতে চাহিযাছিলেন। গান্ধীজী তাঁহাকে বলিলেন—জানিনা, বাংলায় গিয়া আমি কি করিতে পারিব। তবে এইটুকু জানি যে, বাংলায় না গেলে আমি আমার অন্তরে একটুও শান্তি পাইব না।

প্রার্থনান্তিক ভাষণে তিনি বলিলেন - আমার যাত্রাপথ মোটেই সহজ অথবা সুগম নয়। আমার স্বাস্থ্যও খারাপ। কিন্তু আমার কর্ত্তব্য আমাকে পালন করিতেই হইবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিতে হইবে, তাহা হইলেই তিনি

কঠোর পরিশ্রম করার মত শক্তি দিবেন। কাহারও বিচার করিতে আমি বাংলায় যাইতেছি না। বাংলায় আমি যাইতেছি জনগণের সেবক হিসাবে। সেখানে গিয়া আমি হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়েরই লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। আমি আমার ১৭ বৎসর বয়স হইতেই এই শিক্ষালাভ করিয়াছি যে, জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল দেশের লোকই আমার আত্মীয়। ঈশ্বরের সেবক হইতে হইলে আমাদের তাঁহার সৃষ্ট জীবের সেবক হইতে হইবে। সেই সেবকের অধিকার লইয়াই আমি বাংলায় যাইতেছি। সেখানে গিয়া আমি হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের কথাই প্রচার করিয়া বলিব, হিন্দু মুসলমান কেহ কারও শত্রু হইতে পারে না। একই দেশে এই দুই সম্প্রদায় লালিত-পালিত হইয়াছেন, একই দেশে তাঁহারা জীবনযাপন করিবেন, একই দেশে তাঁহারা দেহত্যাগ করিবেন।...পূর্ব্ব-বাংলার নারীগণের দুর্দ্দশার কাহিনী শুনিয়া আমার হৃদয় বিগলিত হইয়াছে। আমি তাঁহাদের চোখের জল মুছাইতে যাইতেছি, তাঁহাদের ভগ্ন নিরুৎসাহ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিতে যাইতেছি।"

এইরূপ কঠোর সঙ্কল্প এবং দুর্জ্জয় অধ্যাত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়াই মহাত্মাজী আজীবন অসত্য, অন্যায়, অধর্ম্মের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। এইরূপ অটুট বিশ্বাসের উপর দাঁড়াইয়াই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছেন, দুর্নিবার গতিতে ডাণ্ডি অভিযানে অগ্রসর হইয়াছেন, চম্পারণের সত্যাগ্রহ পরিচালনা করিয়াছেন। সেই বিশ্বাসবোধই তাঁহাকে নোয়াখালির নিভৃততম পল্লীপ্রান্তে অভিযান চালাইবার প্রেরণা জোগাইল।

ইতিপূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী যদিও অন্যায়, অসত্যের বিরুদ্ধে অভিযান অনেকবারই করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সকল অভিযানের সহিত এই নোয়াখালির শান্তি-অভিযানে খানিকটা পার্থক্য ছিল। দেশবাসীর প্রতি সরকারের অবিচারের প্রতিকারের জন্য তিনি পূর্ব্বে অনেকবার অহিংসার অস্ত্র লইয়া সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তখন প্রতিপক্ষের অন্যায়ের

রূপ তাঁহার নিকট বেশ স্পষ্ট ছিল। ইতিপূর্ব্বে দেশবাসীর প্রতি কোন অন্যায বা অবিচার করা হইলে, তিনি সেই বিশেষ অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য অহিংসার সকল শক্তি প্রযোগ করিযা তাহার প্রতিবিধান করিবার জন্য চেষ্টা করিযা আসিয়াছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর এবারকার অভিযান দেশবাসীর প্রতি সরকারের কোন অবিচারের প্রতিবাদে নয়। এবার তিনি অহিংসার চরম পরীক্ষায় চলিযাছেন। এ অভিযানের তাৎপর্য্য অসীম। এবারকার এই অভিযান সম্পর্কে তিনি বলিয়া গিয়াছেন—"এবার আমার পরীক্ষা কঠোর; আমার দাযিত্ব অসীম। পূর্ব্বে আমি, যতবার সত্যাগ্রহ করিযাছি, প্রতিবারই আমার সম্মুখে একটা সুস্পষ্ট অন্যাযের প্রতিমূর্ত্তি ছিল। সরকারের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ ছিল। আমি সেই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যই অহিংস সংগ্রাম করিয়াছি। সেই সংগ্রামে আমি পুরোভাগে গিয়া দাঁড়াইলেও আমার পাশে চতুর্দ্দিক হইতে আমার নিগৃহীত দেশবাসীরা আসিয়া দাঁড়াইযাছে।

"আমি ভগবানের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিলেও ইহাদের সান্নিধ্য আমাকে অনেক সান্ত্বনা ও শক্তি যোগাইয়াছে। কিন্তু আজ আমি যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছি তাহার রূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি সরকার-অনুষ্ঠিত কোন অবিচারের প্রতিকার করিতে যাইতেছি না। কাহারও বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নাই। আমি পরীক্ষা করিযা দেখিব আমি সারাজীবন যে অহিংসার সাধনা করিযা আসিযাছি, সেই অহিংসা দ্বারা আমি মানুষের মনের অমানুষিকতা দূর করিতে পারি কি না। মানুষে মানুষে যে হানাহানি, মানুষে মানুষে যে হিংসাদ্বেষ, মানুষ হইতে মানুষের যে ভয়-বিরাগ, সেই বিকার মানুষের মন হইতে দূর করিতে আমার অহিংসা কতটা কার্য্যকরী, আমার জীবনসায়াহ্নে আমি তাহাই যাচাই করিয়া লইব। এ কাজ বহুতে মিলিয়া করার নয়, কাজেই আমাকে একাই এই পরীক্ষা করিতে হইবে। আমি আজ একা চলিযাছি, আজ আমার পাশে, আমার পশ্চাতে শতসহস্র

অনুচরের প্রয়োজন নাই, কেবলমাত্র ঈশ্বরের দেওয়া শক্তির উপর আমার নির্ভর করিতে হইবে। আমাকে জনসাধারণের মধ্যে অগ্রসর হইতে হইবে হিংসাদ্বেষ-বিমুক্ত অন্তর লইয়া। আমার অন্তরে কোন কলুষ থাকিলে আমার সাধনা ব্যর্থ হইবে। তাই আমি দীনভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যেন আমার মন হইতে সকল কালিমা দূর করেন, আমায় যেন তিনি শক্তি দান করেন।

"ইহাই আমার তীর্থযাত্রা। সকল সংস্কারমুক্ত হইয়া সর্ব্বস্ব দান করিতে করিতে দীনভাবে নগ্নপদে তীর্থস্থানের দিকে অগ্রসর হওয়াই ভারতের তীর্থযাত্রীর আদর্শ। তাই আজ আমি নগ্নপদে চলিযাছি আমার তীর্থ পরিক্রমায।"

মানুষের ন্যায-অন্যাযবোধের উপর এবং নিজের অন্তরের শক্তির উপর অবিচলিত বিশ্বাস না থাকিলে মহাত্মাজীর এই নোযাখালি অভিযান সম্ভব হইত না। যে মনুষ্যত্ব পশুত্বে নামিযা গিয়াছে তাহাকে মনুষ্যত্বের স্তরে পুনরায উন্নীত করা যায কি না, ইহাই ছিল নোয়াখালি-পরিক্রমাকালে মহাত্মাজীর পরীক্ষা। এই পরীক্ষাকে তিনি তাঁহার 'হরিজন' পত্রিকায 'অহিংসার কঠোরতম অগ্নি-পরীক্ষা' বলিযা অভিহিত করিয়াছিলেন। মানুষের নীতিবোধের উপর মহাত্মার যে অবিচলিত শ্রদ্ধা ছিল, তাহার উপরে নির্ভর করিয়া, তাঁহার সেই বিশ্বাস পরীক্ষাসহ কি না তাহা পরখ করিবার বাসনা লইযা—অহিংসার এই কঠোরতম অগ্নি-পরীক্ষায তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নোয়াখালির পল্লী-পরিক্রমা কালে এই প্রচেষ্টার সম্ভাব্য সঙ্কট সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে সতর্ক করিযা বলিযাছিলেন যে, 'গান্ধীজী যুক্তির দ্বারা হিংস্র মানবের অন্তরে ন্যায়-অন্যায়বোধ জাগাইযা তুলিতে যাইতেছেন। কিন্তু যাহারা রক্তলোলুপ নরহন্তা, যুক্তির প্রভাবে তাহাদের অন্তরের কোন পরিবর্ত্তন ঘটান সম্ভবপর নহে। কারণ, যুক্তির তাহারা কোন ধারই ধারে না।' সে সম্ভাবনা স্বীকার করিযা লইযাই মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন যে, মানুষের

সেই জিঘাংসাপ্রবৃত্তি জয় করার জন্যই তাঁহার এই অভিযান, সেই প্রবৃত্তি দমন করার জন্যই তাঁহার এই সাধনা। এই সাধনাকে তিনি ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে অনুকূল ও পরিপূরক বলিয়া মনে করেন।

পূর্ব্ববঙ্গের এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যে সমস্যা উদ্ভূত হইয়াছিল, গান্ধীজী তাহাকে স্থানীয় সমস্যা বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি ইহাকে নিখিল ভারতের সমস্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই উহার সমাধানকল্পে এইরূপ ব্যাকুলতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং উহার সমাধানের জন্য তৎপরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনের পূর্ব্বে তিনি পূর্ব্ববাংলার এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁহার সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, এই সমস্যার সমাধান না হইলে উহা ভারতের আসন্ন স্বাধীনতাকে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত করিবে।

নোয়াখালি যাত্রার পূর্ব্বে তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, প্রেমের স্পর্শে জিঘংসা প্রবৃত্তির যদি বিলোপসাধান ঘটান না যায়, সত্যের স্পর্শে মনুষ্যত্বকে যদি পুনরুদ্ধার করা না যায়, তবে তাহার পরিণাম ভয়াবহ হইতে বাধ্য। যদি প্রতিশোধ প্রবৃত্তিই জয়ী হয় তবে এক সম্প্রদায়ের পাশব অথবা নৃশংস আচরণে অপর সম্প্রদায়ের পাশব প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইবে, হিংসার তাড়নায় জিঘাংসা উত্তরোত্তর জাগ্রত হইয়া উঠিতে থাকিবে। কিন্তু তাহার পর? তাহার পর পূর্ব্ববঙ্গের একটি জেলার কোন একটি অঞ্চলে যাহা ঘটিতেছে, সমগ্র ভারতে আরও বীভৎসরূপে, আরও নগ্ন বর্ব্বরতায় ঐ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের পুনরনুষ্ঠান চলিতে থাকিবে। তাহার ফল হইবে সমাজের ও দেশের সর্ব্বনাশ, জাতির বিপর্য্যয় ও মনুষ্যত্বের মৃত্যু। ভারতকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষার জন্যই তাঁহার এই সাম্প্রদায়িক মিলনসাধনের দুশ্চর তপস্যা সুরু হইয়াছিল। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি এই তপস্যাই করিয়া গিয়াছেন।

দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের অবসান ঘটাইবার জন্য সেদিন তিনি যে সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার অন্তরে ছিল সঙ্কল্পের

দুর্জ্জয়তা। হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক অনৈক্য বিদ্বেষের ও হানাহানির ফলে যে বিষ উদ্ভূত হইযা সমস্ত ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিযাছিল—তাঁহার প্রতিজ্ঞা হয তিনি এই বিষ নিঃশেষে পান করিযা নীলকণ্ঠ হইবেন, নতুবা এই বিষে জর্জ্জরিত হইযা মৃত্যুবরণ করিবেন। ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের যে ভয়াবহ পরিণাম ও পরিণতি তিনি তাঁহার মানসচক্ষুর সম্মুখে দেখিযাছিলেন তাহার প্রতিবিধানের জন্য মহাত্মার পক্ষে ইহা ছাড়া আর গত্যন্তর কি ছিল?

সমবেদনার দ্বারা অত্যাচারিত ও নিপীড়িত নরনারীর দুঃখ মোচন করিবার জন্য এবং প্রেমের দ্বারা হিংসাপ্রবৃত্তিকে দমন করিযা মানুষের নীতিবোধকে জাগ্রত করিবার জন্য তিনি নোযাখালি অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অন্তরে তাঁহার আশা ও আশ্বাস, কণ্ঠে তাঁহার মানবধর্ম্মের বাণী। পথে তাঁহার দর্শনপ্রার্থী জনতাকে উদ্দেশ্য করিযা কোথাও তিনি বলিলেন, "দুর্গত ও লাঞ্ছিতদের অশ্রু মোচন করাইযা তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই আমি নোযাখালি যাইতেছি। যতদিন না সেখানকার হিন্দু ও মুসলমান একযোগে বলিবেন যে আমার আর সেখানে থাকিবার প্রযোজন নাই—ততদিন আমি সেখানে থাকিব।' কোথাও সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বলিলেন, 'আমি তাড়াতাড়ি নোযাখালি ভ্রমণ শেষ করিযা চলিযা যাইবার জন্য আসি নাই। আমি এখানে আপনাদের মধ্যে বাস করিতেই আসিযাছি। প্রযোজন হইলে আমি এখানেই দেহত্যাগ করিব।'

গান্ধীজীর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণের সঙ্কল্প শুনিয়া নোয়াখালির মুসলমানেরা প্রথমে ভীত হইযাছিল। সাধারণ পল্লীবাসী মুসলমানেরা গান্ধীজীকে পুলিশ-বেষ্টিত হইযা গ্রামে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভাবিয়াছিল যে, তিনি হয়ত তাহাদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশবাহিনী লইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু গান্ধীজী পল্লীবাসী মুসলমানদিগকে ক্রমাগতই অভয দিয়াছেন, তাহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিবার ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি

বারংবার বলিয়াছেন যে—আত্মরক্ষার জন্য তিনি নিজে পুলিশবাহিনী চাহিয়া আনেন নাই। কিন্তু বাংলা সরকার তাঁহার নিরাপত্তার জন্য পুলিশবাহিনী তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস যে তাঁহার নিরাপত্তার জন্য পুলিশবাহিনীর কোন প্রয়োজন নাই। মুসলমান ভাইগণের প্রতি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি তাঁহার নোযাখালি-পরিক্রমা সুরু করিয়াছেন। কাহারও প্রতি অবিশ্বাসের ক্ষীণতম রেখাটুকুও তাঁহার মনের মধ্যে নাই।

এইরূপে অভয় দান করা সত্ত্বেও নোয়াখালির পল্লী-অঞ্চলের মুসলমানগণ প্রথম প্রথম গান্ধীজীকে পরিহার করিয়াই চলিত। কিন্তু মুসলমানদিগের হৃদয জানিবার জন্য গান্ধীজীর আগ্রহ ও অসীম ধৈর্য্য শেষ পর্য্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হইযাছিল। তখন মুসলমানগণ দলে দলে তাঁহার প্রার্থনা-সভায যোগ দিযাছেন। বহু মুসলমান পল্লীবাসীর গৃহে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, বহু মুসলমান তাঁহাদের গৃহে গান্ধীজীর আবির্ভাবে নিজেদের ধন্য মনে করিযাছেন।

গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভায় রামধুন গীত হইত—কোরাণ হইতেও আবৃত্তি হইত। তাঁহার প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী কর্ত্তৃক কোরাণ-ব্যাখ্যার প্রতিবাদও কযেকবার হইয়াছিল। গ্রামবাসী নেতৃস্থানীয মুসলমানেরা গান্ধীজীর সহিত দেখা করিয়া প্রার্থনা-সভায় তাঁহার কোরাণ ব্যাখ্যা করা যে মুসলমানদিগের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ নীতি তাহা তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলেরই যুক্তির সারমর্ম্ম এই যে—হিন্দুদিগের প্রার্থনা-সভায় মুসলমানদিগের যোগ দেওয়া মুস্লিম সংস্কৃতি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ। তাঁহারা গান্ধীজীকে হিন্দু-দিগের অবতার বলিয়া মনে করেন। সুতরাং হিন্দু হইয়া মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ ব্যাখ্যা করিয়া মুসলমানদিগকে শুনান তাঁহার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা।

গান্ধীজী এই সকল যুক্তি অসীম ধৈর্য্যের সহিত শ্রবণ করিতেন। কোনরূপ সঙ্কোচ না করিয়া মুসলমানগণ যাহাতে তাঁহাদের অন্তরের পঞ্জীভূত অভিযোগের

সমস্তটুকু তাঁহার কাছে ব্যক্ত করেন এ সুযোগ গান্ধীজী মুসলমানদিগকে দিতেন। কারণ গান্ধীজীর বাসনা—তিনি মুসলমানগণের অন্তরের পরিচয় লাভ করিবেন। তাঁহাদের হৃদয় না জানিলে উহা তিনি জয় করিবেন কি প্রকারে?

মুসলমানগণের অভিযোগের উত্তরে গান্ধীজী বলিয়াছেন—তিনি অবতার বা ধর্ম্মগুরু নহেন। রক্তমাংসে গড়া সাধারণ মানুষ তিনি। গান্ধীজী তাঁহাদের আরও বলেন—বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে ধর্ম্মোপদেশ-সমূহ তাঁহার প্রার্থনা-সভায় আবৃত্তি করা হয়। কোরাণ হইতেও বিশেষ বিশেষ অংশ আবৃত্তি তিনি করিয়া থাকেন। কারণ, বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য আছে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইলেও আসলে ঈশ্বর এক। যিনি খোদা, তিনিই রাম। এক ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। কোরাণ-শরীফেও আছে যে, খোদার নাম গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। সুতরাং প্রার্থনা-সভায় যোগদান করিলে মুসলমানদের ধর্ম্মচ্যুতির কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। তিনি দেখিতে চাহেন হিন্দুরা খাঁটি হিন্দু হউন। মুসলমানেরা খাঁটি মুসলমান হউন।

গান্ধীজীর এই উত্তরে মুসলমান মৌলভী ও নেতৃগণের মধ্যে কেহ কেহ সন্তুষ্ট হন, কেহ বা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। ধর্ম্মান্ধ মৌলভীগণের সকলকার হৃদয় তিনি জয় করিতে না পারিলেও, ধীরে ধীরে তিনি যেভাবে অশিক্ষিত পল্লীবাসী মুসলমানদিগের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন তাহা বিস্ময়ের বস্তু।

দরিদ্র অশিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ই গ্রামের মেরুদণ্ডস্বরূপ। এই উভয় সম্প্রদায় বহুকাল সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গ্রামে বাস করিতেছিলেন। কতকগুলি স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির দুরভিসন্ধি ও দুষ্ট প্ররোচনায় মানুষের অন্তর্নিহিত পশুত্ব জাগিয়া উঠিয়াছিল। মানুষের অন্তরের এই পশুভাব গান্ধীজী কর্ত্তৃক ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বিদূরিত হইয়াছিল। তিনি যে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল মানুষের দরদী বন্ধু, মানুষ-মাত্রেরই কল্যাণকামী—

নোয়াখালির মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহা ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

গান্ধীজী যে গ্রামেই গিয়াছেন সেখানেই সকলের সহিত অবাধে মেলমেশা করিয়াছেন। এই পল্লী-পরিক্রমাকালে মুসলমানদিগের গৃহে তাঁহার আমন্ত্রণের সংখ্যা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি কখনই কাহাকেও বিমুখ ত করেনই ন ই, বরং অত্যন্ত আগ্রহের সহিত মুসলমানগণের আমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছেন। মুসলমানগণের গৃহে গিয়া তাহাদের সুখ-দুঃখের খবর লইয়াছেন। পরম আত্মীয়ের ন্যায় তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন। বাড়ীর শিশু ও বালকবালিকাদিগের সহিত রসিকতা করিযা তাহাদিগের মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাকে প্রদত্ত ফলমূলাদি উহাদিগের মধ্যে বিলাইযা দিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিযাছেন।

পল্লীবাসী মুসলমানেরা গান্ধীজীর সহানুভূতিপূর্ণ অন্তরের পরিচয় পাইযা ক্রমশই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইযাছিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহাদের একজন অন্তরঙ্গ আত্মীয়রূপে মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এইভাবে গান্ধীজীর প্রেম এবং অহিংসা পল্লীবাসী মুসলমানগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিল। প্রার্থনা-সভায় মুসলমানগণ অধিক সংখ্যায় যোগদান করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রার্থনা সভায় ও গান্ধীজীর পল্লীপরিক্রমার পথে 'রাম ও রহিম', 'কৃষ্ণ করিম', 'ঈশ্বর আল্লা' প্রভৃতি নামকীর্ত্তন একসঙ্গে হইত। প্রথম প্রথম ইহাতে মুসলমানগণের প্রতিবাদ ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ প্রতিবাদের সেই তীব্রতা শিথিল হইয়া আসিতেছিল।

গান্ধীজী যেভাবে নোয়াখালির পল্লীপরিক্রমা করিযা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, যে রকম কৃচ্ছ্রসাধন করিযা মিলনের বাণী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রচার করিয়া গিযাছেন তাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। তাঁহার এই অভিযান পৃথিবীর ইতিহাসে তুলনারহিত। ইহাতে কোন মত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ছিল না, কোন বিশেষ ধর্ম্ম প্রচারের আকাঙ্ক্ষা ছিল না, আয়োজনকে চিত্তাকর্ষক করিবার কোন সমারোহ ছিল না। ছিল শুধু

সত্যকে জানিবার, উপলব্ধি করিবার আগ্রহ—সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা।

এই পল্লীপরিক্রমাকালে তিনি হিন্দুদিগকে উপদেশ দিয়াছেন নির্ভীক হইতে, পুনর্বসতির জন্য তাহাদিগকে সাহস সঞ্চয় করিতে বলিয়াছেন এবং নিজে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া পুনর্বসতির উপযোগী আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছেন। মুসলমানদিগের মধ্যে মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন, হিন্দুদিগের মধ্যে সাহস ও বিশ্বাস সঞ্চার করিয়াছেন।

এই সময়ে গান্ধীজীকে বিচিত্র ও বিভিন্ন কর্ত্তব্য পালন করিতে হইয়াছে। তিনি শান্তির বাণী প্রচার করিয়াছেন, গ্রামবাসীদিগের অবস্থার যাহাতে উন্নতি হয় তাহার উপায়ও উদ্ভাবন করিয়াছেন—গ্রামোন্নয়নের জন্য নানা সুনিশ্চিত ও সুপরিকল্পিত পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দেশে তাঁহার অনুগামী শিষ্যগণ গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়া গ্রামের পথঘাটের সংস্কার করিয়াছেন, পুষ্করিণী সাফ করিয়াছেন, অসহায় লোকের ধান কাটিয়া দিয়া তাহাদিগের সহায়তা করিয়াছেন। নোয়াখালি জেলায় গ্রামের পানীয় জলের সমস্যা তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছিল। সেইজন্য পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্যও তিনি পরামর্শ দিযাছেন। চরকা খাদি প্রচারের কার্য্যও তিনি এই সময়ে করিয়াছেন। এক কথায় বলা যায়, এই নোয়াখালি-পরিক্রমাকালে শুধু যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-স্থাপনের জন্য মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সমস্ত চেষ্টাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন তাহা নহে। পল্লী-সমাজকে ক্লেদমুক্ত ও শুভ্র-সুন্দর করাকেও তিনি তাঁহার সাধনার অঙ্গীভূত করিয়া লইযাছিলেন।

মহাত্মাজী তাঁহার পল্লীপরিক্রমার সময়ে হিন্দু-সমাজ হইতে জাতিভেদ প্রথা দূর করিবার জন্যও সনির্ব্বন্ধ উপদেশ দান করিতেন। তিনি বলিতেন—হিন্দু-ধর্ম্মকে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তবে এই সমাজ হইতে জাতিভেদ-প্রথার অবলোপ সাধন করিতে হইবে। তিনি নিজের কথা উল্লেখ করিয়া প্রায়ই বলিতেন—আমি যে হিন্দুর কোন্ জাতিভুক্ত ছিলাম তাহা বহুদিন ভুলিয়া

গিয়াছি। বর্ত্তমানে আমি নিজেকে 'ভাঙ্গী' বলিয়া পরিচয় দিতে এবং তদনুযায়ী কাজ করিতে বড় আনন্দ বোধ করি। স্বাধীন ভারতে এই জাতিভেদ প্রথা অতীতের কাহিনী বলিয়া পরিগণিত হইবে, আমি এইরূপ আশা করি।

গান্ধীজীর মন্ত্রদীক্ষিত কর্ম্মীগণও তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া গ্রামবাসীদের মধ্য হইতে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। এই পল্লী-পরিক্রমাকালে একবার সর্ব্বজাতিকে লইয়া একটি মিলিত ভোজের ব্যবস্থা হইযাছিল। কোন মহোৎসব উপলক্ষ্যে নয়, শুধুমাত্র পংক্তিভোজনের উদ্দেশ্যে। এই ভোজে স্ত্রী-পুরুষ একত্রে বসিয়া আহার করিলেন। পরিবেশন ও রন্ধন করিলেন মালীরা।

মহাত্মার এই ধরণের অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের দৃষ্টান্ত ও পরামর্শে কিছু সুফলও ফলিয়াছিল। জাতিভেদ-প্রথার অর্থহীনতা এবং এই প্রথার ফলে হিন্দু-সমাজের যে অধঃপতন ঘটিযাছে এই বোধ হিন্দুগণের মধ্যে অনেকেই এই সময়ে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিযাছিলেন।

পল্লীপরিক্রমায গান্ধীজীর কর্ম্মসূচী সাধারণতঃ এইরূপ ছিল—নূতন গ্রামে পৌছিয়া তিনি গরমজলে দুই পায়ের কাদামাটি ধুইয়া ফেলিতেন। কঠোর শীতের সকালে খালিপাযে বন্ধুর পল্লীর পথে হাঁটিতে হাটিতে তাঁহার পাযে কালসিটা পড়িয়া যাইত। কিছুক্ষণ তিনি গরমজলে পা ডুবাইয়া বসিয়া থাকিতেন। প্রত্যহ সকালে এই সময়ে তিনি বাংলা শিখিতেন। স্থানীয লোকদিগের সহিত কথাবার্ত্তা বলিযা তাহাদের অন্তরের কথা সম্যকরূপে বুঝিবার অসুবিধা হইত বলিয়া তিনি বাংলা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। প্রতিদিনই তিনি খানিকটা করিয়া বাংলা পড়িতেন ও লিখিতেন। তিনি এই সময়ে বলিতেন—আমি এখন নোয়াখালিবাসী, বাঙ্গালী।

তাঁহার মত বয়সে একটা সম্পূর্ণ নূতন ভাষা শিক্ষা করিয়া তারপর গ্রামের পর গ্রামে ভ্রমণকালে গ্রামবাসীদের মুখ হইতে তাহাদেরই মাতৃভাষায় তাহাদের

দুঃখের কাহিনী শুনিয়া দুর্গতদের দুঃখমোচনের জন্য জীবন পণ করাটা গান্ধীজীর মত মহামানবের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অর্থ বুঝিবার মত বাংলা তিনি শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। সাধুরখিলে স্থানীয মুসলমানগণ বাংলা ভাষায় গান্ধীজীকে উদ্দেশ্য করিযা একটি অভিনন্দন পাঠ করিলে, গান্ধীজী এই অভিনন্দন-পত্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথই উত্তর দান করিলেন।

তাঁহার বাংলা পড়া প্রতিদিন সকালে প্রায আধঘণ্টা চলিত। তাহার পর তিনি স্থানীয় অধিবাসী যাঁহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী হইযা আসিতেন, তাঁহাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনিতেন।

বেলা এগারটার সময়ে তিনি তাঁহার মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপন করিতেন। এই সময়ে একখানি চাপাটি, কিছু দুধ, তরকারি-সিদ্ধ ও একটু গ্লুকোজ— ইহাই তিনি গ্রহণ করিতেন। চাপাটিখানি তৈয়ারী হইত এক ছটাক পরিমাণ তরকারি-সিদ্ধ, তিন ছটাক পরিমাণ আটা ও একটু সোডা ও লবণ সহযোগে।

বেলা বারটায় তিনি শরীরে তৈলমর্দ্দন করিতেন। এই সময়েও সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের সহিত তাঁহাকে আলোচনায প্রবৃত্ত থাকিতে দেখা যাইত।

স্নানের পর তিনি কিঞ্চিৎ ডাবের জল পান করিতেন। বেলা দুইটা হইতে শয্যাগ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিশেষ কর্ম্ম-ব্যস্ততার মধ্যে তাঁহার সময অতিবাহিত হইত। বেলা তিনটার সময়ে হয় তিনি মহিলা-সভায বক্তৃতা করিতেন, নয়ত গ্রামোন্নয়ন ও গঠনমূলক কার্য্য-সম্বন্ধে গ্রাম্য কর্ম্মীদিগকে অথবা স্বীয অনুচর-দিগকে উপদেশাদি দিতেন।

অপরাহ্ণ সাড়ে চার ঘটিকার সময়ে গান্ধীজী প্রার্থনা সভায রওযানা হইতেন। ঠিক পাঁচটার সময়ে সভা আরম্ভ হইত। প্রার্থনার পর স্থানীয অধিবাসীদিগের কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে তাহার উত্তর দিতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করিয়া বক্তৃতা করিতেন। তিনি প্রায় প্রতিদিনকার প্রার্থনা-সভায় বলিতেন···আমি কাহাকেও শাস্তি দিতে বা বিব্রত করিতে আসি নাই।

আমি আসিয়াছি—শান্তি ও মৈত্রী স্থাপন করিতে, হৃদযে হৃদয়ে মিলন ঘটাইতে।

সভা শেষ হইলে গান্ধীজী সভাস্থল হইতেই সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়া গ্রামের পথে কিছুদূর বেড়াইযা আসিতেন। সান্ধ্যভ্রমণের সময়ে প্রায়ই তিনি হিন্দু ও মুসলমান গ্রামবাসীদিগের গৃহে যাইতেন।

রাত্রি ঠিক আটটার সময় তাঁহাকে সংবাদপত্র পাঠ করিয়া শুনান হইত। ইহার পর শয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি স্থানীয় অধিবাসীদিগের সহিত নানাবিধ আলাপ-আলোচনা করিতেন। রাত্রি ঠিক নয়টার সময়ে তিনি শয্যাগ্রহণ করিতেন এবং সূর্য্যোদযের পূর্ব্বেই—অতি প্রত্যূষে, এমন কি শেষ রাত্রেই শয্যাত্যাগ করিতেন।

*　　*　　*　　*

নোযাখালিতে পদার্পণ করিবার পর হইতে প্রায দুই মাস অতিবাহিত হইতে চলিল। এই সময়টা নোয়াখালির বিভিন্ন গ্রামে এবং অবশেষে শ্রীরামপুর গ্রামে তাঁহার কাটিল। এই শ্রীরামপুর গ্রামেই পণ্ডিত জহরলাল প্রমুখ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে কংগ্রেসের ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া তাহারা ফিরিযা যান।

প্রায় দুইমাস কাল ধরিয়া মহাত্মাজী নোয়াখালিতে তাঁহার শান্তি-অভিযান করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে একটা কেমন অতৃপ্তি জাগিতেছিল যে, তাঁহার সাধনা যেন অভীষ্ট ফলদান করিতেছে না। এই সময়টায় তিনি শান্তি ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিতেছিলেন বটে, গ্রামোন্নয়নের অনুপ্রেরণা দিতেছিলেন, গ্রামবাসীদের মধ্য হইতে অস্পৃশ্যতার কালিমা, অন্তরের সঙ্কীর্ণতা দূর করার চেষ্টা করিতেছিলেন সত্য—কিন্তু একটা গভীর অতৃপ্তি তিনি যেন তাঁহার অন্তরের অন্তরালে অনুভব করিতেছিলেন।

এই দীর্ঘ দুই মাস কালের মধ্যে নোয়াখালির পীড়নকারীদিগের চিত্তের

পরিবর্ত্তন যেন আশানুরূপ হইতেছে না ইহা অনুভব করিয়া গান্ধীজী বিচলিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত মানুষ যদি সত্য ও অহিংসার পূজারী হয়, কর্ম্মে যদি তাহার নিষ্ঠার অভাব কোনদিন না থাকে, তবে মানুষের পরাজয় অসম্ভব। তাই তিনি এই সময়ে ঘোষণা করিলেন —"সত্য ও অহিংসার যে সার্থকতার কথা আমি এতদিন বলিয়া এবং বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, তাহা আজ যেন ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রকৃতই তাহা ব্যর্থ হইয়াছে কি না তাহা পরীক্ষা করার জন্য—অর্থাৎ নিজেকে পরীক্ষা করার জন্য আমি আমার চিরসঙ্গীদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছি।

অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার অন্তরাত্মা যেন কর্ত্তব্যের ইঙ্গিত পাইবার আকাঙ্ক্ষায় আকুলি-বিকুলি করিতেছিল। এই সময়ে ভগবানের কাছ হইতে তিনি কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ আশা করিতেছিলেন, গভীর অভিনিবেশ-সহকারে তিনি পথের সন্ধান করিতেছিলেন।

অবশেষে তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যের ইঙ্গিত পাইলেন। তিনি এককভাবে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অভিযান করার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি তাঁহার আশ্রমকর্ম্মীগণকে নোয়াখালি জেলার বিভিন্ন উপদ্রুত এলাকায় কেবলমাত্র আত্মিক শক্তিকে সম্বল করিয়া প্রেরণের নির্ভীক সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। নিজেও সেই সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন,—আমার আশ্রমের নারী ও পুরুষ কর্ম্মীগণকে একক ভাবে এক একটি উপদ্রুত গ্রামে গিয়া তথাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রাণ ও মানের রক্ষকরূপে অবস্থান করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে নিজেদের জীবনের বিনিময়ে তাহা রক্ষা করিতে হইবে। এই দুর্ব্বহ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে যদি কেহ অনিচ্ছুক হন, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে অন্য কোন গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। নিজের সম্বন্ধে মহাত্মাজী দৃঢ় ও নির্ভীক কণ্ঠে বলেন—আমি আমার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য, এই একক সত্যাগ্রহকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য কৃতসঙ্কল্প। হয় আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছাইব নতুবা এইখানেই দেহরক্ষা করিব।

একেবারে নিছক একাকী এই দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপনের সঙ্কল্প—এই একক সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের সঙ্কল্প যেদিন সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইল, সেদিন ইহা সমগ্র দেশকে আশঙ্কাব্যাকুল করিয়া তুলিল। তাঁহার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, অনুরাগী অনুচর ও অন্তরঙ্গগণ এইরূপ অভিযানের আশঙ্কাজনক পরিণতির কথা তাঁহাকে শুনাইলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন যে—তাঁহার এই একক সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত অপরিবর্ত্তনীয়।

আত্মশক্তিতে একান্ত নির্ভরশীল এই মহামানব নিজের আত্মিক শক্তিকে সম্বল করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নিঃসঙ্গ অভিযান সুরু করিতে উদ্যত হইলেন এমন এক ভয়াবহ ও বিপদসঙ্কুল অঞ্চলের অভিমুখে, যেখানকার দুর্গমতা ও ভীষণতা লক্ষ্য করিয়া একদিন সশস্ত্র সেনাবাহিনীও স্তম্ভিত হইয়া আর অগ্রসর হইতে চাহে নাই।

১৯৪৭ সালের ১লা জানুয়ারী মহাত্মাজীর শ্রীরামপুর অবস্থানের শেষ দিন গেল। সেইদিন অপরাহ্ণে তিনি তাঁহার প্রার্থনাসভায় বলিলেন, "এখন হইতে আমি একাকীই গ্রাম হইতে গ্রামে গিয়া ঘরে ঘরে লোকের সংস্পর্শে আসার চেষ্টা করিব।"

এই একক পরিক্রমায় তিনি তাঁহার সঙ্গীরূপে গ্রহণ করিলেন—তাঁহার বাংলা দোভাষী অধ্যাপক নির্ম্মল বসুকে, শর্টহ্যাণ্ড্ লেখক শ্রীযুক্ত পরশুরামকে, মহাত্মার কাজেকর্ম্মে সাহায্য করিবার জন্য দক্ষিণ-ভারতের শ্রীরামচন্দ্রন্ ও তাঁহার ব্যক্তিগত কাজেকর্ম্মে সাহায্য করার জন্য কুমারী মনু গান্ধীকে।

তাঁহার সহিত অন্যান্য যে সকল কর্ম্মী নোয়াখালি গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও তিনি নোয়াখালির বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁহার মতই একক সংগ্রামের দায়িত্বভার প্রদান করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। কর্ম্মীদের তিনি উপদেশ দিলেন—তাঁহাদের মন হইতে মৃত্যুভয় দূর করিতে হইবে এবং যাহারা বিরোধিতা করিবে তাহাদের চিত্ত জয় করিতে হইবে। এই প্রচেষ্টায় হয়ত কয়েকজনকে প্রাণও হারাইতে

মহাত্মা একটি কাঠের পুল পার হচ্ছেন

হইতে পারে। কিন্তু গান্ধীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, প্রেমের দ্বারা শত্রুকে জয় করা যাইবেই।

২রা জানুয়ারী গান্ধীজীর এই ঐতিহাসিক সত্যাগ্রহ সুরু হইল। পৃথিবীর ইতিহাসে শান্তিস্থাপনের জন্য এইরূপ ঐকান্তিক আগ্রহ এবং অভিনব কর্ম্মপদ্ধতি তুলনাবিহীন। মানব-ইতিহাসে পল্লীর গৃহে গৃহে ঘুরিয়া অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত মানবের ক্ষতে প্রলেপ দেওযার জন্য আর কোন মহাপুরুষকে অগ্রসর হইতে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই।

গান্ধীজী পদব্রজে পল্লীপরিক্রমায বাহির হইলেন। তিনি তাঁহার এই পল্লীপরিক্রমাকে তীর্থযাত্রা বলিযা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন বলিযাই তাঁহার এইরূপ পদব্রজে যাত্রা। সুতীব্র শীত, দুর্গম পল্লী, বন্ধুর পল্লীপথ, অনভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে বিপজ্জনক গ্রাম্য বাঁশের বা কাঠের সেতু গান্ধীজীর সম্মুখে প্রসারিত। কিন্তু সমগ্র বদনমণ্ডলে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের দীপ্তি, অন্তরে দৃঢ় পণ —হয় সাম্প্রদায়িকতার বিষ নাশ করিব, নতুবা নোযাখালির মাটিতে প্রাণ ত্যাগ করিব—এই দুর্জ্জয় সঙ্কল্প লইযাই তাঁহার যাত্রা সুরু হইল। হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদাযের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রীর বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান গড়িয়া উঠিযাছিল, মানুষের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক কলুষিত হইযা ভারতের আকাশ যেভাবে মসীলিপ্ত হইয়াছিল তাহার মধ্যে স্বাভাবিকতা ফিরাইয়া আনিবার জন্য গান্ধীজীর অভিযান আরম্ভ হইল।

কণ্ঠে তাঁহার শান্তি ও মৈত্রীর বাণী, অন্তরে সফলতার আশা ও বিশ্বাস দেদীপ্যমান্, মুখমণ্ডলে কঠোর সঙ্কল্পের দীপ্তি। কঠোর পরিশ্রমেও তাঁহার শ্রান্তিবোধ নাই। সর্ব্বদাই তিনি আনন্দময়, সদা হাস্যময তাঁহার মুখমণ্ডল।

এতকাল বিশ্ববাসী দেখিয়া আসিতেছিল ক্ষমতামত্ত রাজশক্তির দম্ভ ও অন্যায় অত্যাচার-উৎপীড়নের বিলোপ সাধন করিয়া মূক অসহায় ভারতবাসীর দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য এই ক্ষীণকায় সত্যাগ্রহীর অভিযান। তখন তিনি এরূপ সঙ্গীহীন ছিলেন না। সেদিন তাঁহার পশ্চাতে ছিল শত সহস্র অহিংস

পদাতিক। কিন্তু এবারকার এই সত্যাগ্রহে মহাত্মাজী চলিয়াছেন একাকী নিঃসঙ্গ হইয়া, বাস্তব পটভূমিকার উপর তাঁহার আজন্ম সাধনার চরম পরীক্ষা করিতে। পল্লীপরিক্রমায় রবীন্দ্রনাথের "একলা চলরে" গানটি তাঁহার প্রেরণার উৎস। *

রোষহীন, ক্ষোভহীন, ভয়লেশহীন উদারমনা মহাত্মার তীর্থযাত্রা আরম্ভ হইল। মানুষের সহিত মানুষের মিলন ঘটাইবার সাধনা, মানুষের হৃদয়ের জিঘাংসা প্রবৃত্তি লোপ করিবার তপস্যা সুরু হইল মহামানব মহাত্মার। তৃণের চেয়েও নিরহঙ্কার, বিশাল বনস্পতির মত সহিষ্ণু ও সঙ্কল্পে দৃঢ় মহাত্মার জীবনের কঠিনতম পরীক্ষার সুরু হইল। এই পরীক্ষায় হয় তিনি জয়লাভ করিবেন, নতুবা মৃত্যুবরণ করিবেন। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকার সাধ তাঁহার নাই।

শ্রীরামপুর হইতে মহাত্মা গান্ধী চণ্ডীপুর নামক গ্রামাভিমুখে যাত্রা করেন। অতঃপর ৩০টি গ্রাম পরিভ্রমণ করার পর ৩রা ফেব্রুয়ারী তাঁহার এই একক পল্লীপরিক্রমার—এই ঐতিহাসিক নিঃসঙ্গ সত্যাগ্রহের—প্রথম পর্য্যায় শেষ হয়।

ইতিমধ্যে ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে গান্ধীজী তাঁহার প্রার্থনাসভায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা প্রচার করিতে গিয়া সুভাষচন্দ্রের কীর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। তিনি বলিলেন, 'নেতাজীর নিকট হিন্দু-মুসলমান ভেদ ছিল না। হিন্দু-মুসলমান ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভারতীয়দিগের

---

* গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাওয়ার সময়ে পথে গান্ধীজী গান শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। যে-কয়টি গান তাঁহার এই পল্লী-পরিক্রমাকালে গাওয়া হইত তাহার মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের

—"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে ত
একলা চলো রে!"

এই গানটি অন্যতম।

ঐক্যের উপর ভিত্তি করিয়া এক 'বীর সেনাদল গঠন করার সঙ্কল্প তাঁহার ছিল এবং সকল সম্প্রদায়ের ঐক্যের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি সেই সেনাদল গঠন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা এক শক্তিশালী বিরুদ্ধ পক্ষের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।'

নোয়াখালি পরিক্রমা শেষ হইলে তিনি ত্রিপুরার কয়েকটি দাঙ্গাবিধ্বস্ত পল্লী-অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া সোদপুরের আশ্রমে ফিরিয়া আসেন। ইতিমধ্যে বিহারে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছিল। সেখানকার দাঙ্গা-পীড়িতদিগকে সান্ত্বনা দিয়া দাঙ্গাকারীদের শুভবুদ্ধি জাগাইবার বাসনায় তিনি নোয়াখালি ত্যাগ করেন।

নোয়াখালি ও ত্রিপুরার এই পল্লী-পরিক্রমায় গান্ধীজীর বিরাট জীবনের এক অতি উজ্জ্বল আলেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিদেশী শাসনে নিষ্পেষিত হইয়া যে জাতি তাহার আত্মমর্য্যাদা ও মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছিল, গান্ধীজীর এই পল্লী-পরিক্রমা দেশবাসীর সেই অবলুপ্ত মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করারই সাধনা এবং অত্যাচারিত মানবের দুঃখকে আপন অঙ্গে গ্রহণ করিবার প্রচেষ্টা। নোয়াখালিতে তাঁহার আরব্ধ এই একক সত্যাগ্রহের ফল অভূতপূর্ব্বভাবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মনে প্রতিক্রিয়া করে। যে পরীক্ষায় তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন তাহাকে অসামান্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠিতে দেখিয়া, গান্ধীজী পরিতৃপ্তি লাভ করেন, সত্যাগ্রহীর এই অভূতপূর্ব্ব সাফল্য লক্ষ্য করিয়া নিজে এবং বিশ্ববাসী মুগ্ধ হয়।

গান্ধীজী যখন নোয়াখালিতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন বিহারেও দাঙ্গা ছড়াইয়া পড়ে। অবস্থা দেখিয়া গান্ধীজীর অন্তর শিহরিয়া উঠিল। বিহারের দাঙ্গাপীড়িতদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য দুই-একবার তিনি আহূত হইলেন। প্রথমটায় তিনি সে আহ্বানে বিহার অভিমুখে রওয়ানা হইবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি বিহারের আহ্বানে স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ছুটিয়া গেলেন বিহারে। নোয়াখালির

নির্য্যাতিত সংখ্যালঘুরা তাঁহাকে পাইয়া যেমন আশান্বিত হইয়াছিল, বিহারের সংখ্যালঘুরাও তাঁহাকে পাইযা আশান্বিত হইল।

এখানেও তিনি শান্তি ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিলেন। নোয়াখালিতে একক সত্যাগ্রহের যে পরীক্ষায় তিনি প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছিলেন, সেই উপাযেই বিহারে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিহার প্রদেশের পল্লী-পরিক্রমা করেন। সীমান্ত গান্ধী খান্ আবদুল গফুর খাঁ এই শান্তি অভিযানে তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে ভারতের রাজনীতিতে দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। এজন্য শান্তি ও অহিংসার বাণী প্রচার করা ভিন্নও গান্ধীজীকে ভারতের সেই রাজনৈতিক জীবনের সন্ধিক্ষণে কংগ্রেসকে নানাবিধ পরামর্শ দিতে হইযাছে, রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁহাকে বিশেষভাবে কর্ম্মব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে।

১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী এ্যাটলী ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ঐ '৪৭ সালের জুন মাসের মধ্যেই ভারত হইতে ব্রিটিশ শাসন-কর্ত্তৃত্ব অপসারিত হইবে—ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবে। এই ঘোষণায় গান্ধীজীর আরব্ধ স্বাধীনতা-সংগ্রামের জযই ঘোষিত হইল, তাঁহার প্রবর্ত্তিত 'ভারত-ছাড়' নীতিও জয়যুক্ত হইল। অবস্থার চাপে পড়িয়া ব্রিটিশ শক্তিকে শেষ পর্য্যন্ত-ভারত ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেই হইল।

গান্ধীজী কিন্তু এই বিজয়ে উৎফুল্ল হইতে পারিলেন না। কারণ তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইযা তাঁহার দেশ ও জাতি যে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছিল, সেই স্বাধীনতা লাভের সংগ্রাম অপেক্ষা, সেই স্বাধীনতা সংরক্ষণের সংগ্রাম তাঁহার কাছে সেদিন আরও কঠিন বলিযা মনে হইযাছিল।

যে সাম্প্রদাযিক হিংসার বীজ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগণের কূট-চক্রান্তে দেশের সর্ব্বত্র উপ্ত হইয়াছিল এবং ভারতকে স্বাধীনতাদানের ঘোষণায়ও সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি সৃষ্টি করিবার যে অভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া গান্ধীজী উৎফুল্ল হইতে পারেন নাই।

বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ঘোষণা করিলেন ভারতবর্ষকে দ্বিধাবিভক্ত করা হইবে —ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থান। এই ঘোষণায়—ভারতবিভাগের এই সিদ্ধান্তে গান্ধীজী সায় দিলেন বটে। কিন্তু চারিদিকের সাম্প্রদায়িক অশান্তি তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। দেশের সাম্প্রদায়িক অশান্তি দমন করিয়া নবলব্ধ স্বাধীনতাকে চিরস্থায়িত্ব দান করিবার জন্য তিনি সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। সাম্প্রদায়িকতার বিষ অপসারিত করিয়া স্বাধীনতা-সংরক্ষণের সংগ্রামে এবং জাতীয় জীবনে অমৃতধারা প্রবাহিত করাইয়া দিবার সাধনায় গান্ধীজী তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নিরত রহিলেন।

বিহারের পর পুনরায় কলিকাতায় দাঙ্গা সুরু হয়। কলিকাতার দাঙ্গার সংবাদে উদ্বিগ্ন হইয়া গান্ধীজী কলিকাতার উদ্দেশ্যে আগমন করেন। কলিকাতায় আসিয়া নগরীর সর্ব্বাপেক্ষা উপদ্রুত এলাকায় বাস করার সঙ্কল্প তিনি প্রকাশ করেন। বেলিয়াঘাটায় হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে এক পরিত্যক্ত মুসলমানের বাড়ীতে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ১৩ই আগষ্ট। মহাত্মাজীর এই শান্তি-অভিযানে বাংলার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দীও যোগদান করিলেন নগরীর শান্তি পুনঃস্থাপিত করিবার প্রচেষ্টায়।

দেখিতে দেখিতে ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস আসিল। ঐ দিবস হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তিতে গান্ধীজীর শান্তি-প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইল। মহানগরীর বুকে একবর্ষব্যাপী যে হিংসার তাণ্ডব রহিয়া রহিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল, শান্তির অগ্রদূতের পাদস্পর্শে হিংসার সেই উন্মত্ততা বিদূরিত হইল। হিন্দু-মুসলমান অসঙ্কোচে বন্ধুভাবে মিলিত হইয়া আনন্দময় উৎসবদিনটিকে সার্থক করিয়া তুলিল। দেশের মানুষ মহাত্মাজীর অলৌকিক শক্তির প্রভাবে কলিকাতার পথে-ঘাটে, পল্লীতে পল্লীতে ভেদবিভেদ ভুলিয়া নাগরিকগণ নিজেদের মিলনের আনন্দাশ্রু দিয়া রক্তের তিলক মুছিয়া দিল। অনুতপ্ত নাগরিকেরা হিংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্র গান্ধীজীর নিকট

সমর্পণ করিল। কঠোর আইন অথবা অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করিয়া, সেনা-বাহিনী নিয়োগ করিয়া যাহা সম্ভব হয় নাই, মহাত্মাজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব মুহূর্ত্তে তাহাকে সঙ্ঘটিত করিয়া দিল। সমগ্র বাংলা হইতে সাম্প্রদায়িকতার লজ্জাজনক তীব্রতা অন্ধকারে মুখ লুকাইল। দেখা দিল ঐক্যের প্রাণস্পর্শী অতলভেদী সূর্য্য। ভারতবাসী আশ্বস্ত হইল। মহাত্মাজীর প্রতি আর একবার মাথা নোয়াইয়া বাংলার নরনারী অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

মহামানব তাঁহার সাধনার অপূর্ব্ব সিদ্ধি দেখিয়া উৎফুল্ল হইলেন—আশীর্ব্বাদ করিলেন, এ মিলন যেন স্থায়ী হয়।

কিন্তু কিছুদিন পরেই সামান্য একটু অশান্তি পুনরায় দেখা গেল মহানগরীর বুকে। গান্ধীজী দেখিলেন, হিন্দু-মুসলমানে মিলন ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু বিদ্বেষের বিষ কোথায় যেন একটু রহিয়া গিয়াছে। তাহার শেষ বিন্দুটুকু শোষণ করার সঙ্কল্প লইয়া তিনি অনশন সুরু করিলেন তাঁহার বেলিয়াঘাটার আশ্রমে ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭। মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হইয়া গেল মহানগরী। বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিতভাবে প্রতিশ্রুতি দিল—কলিকাতার শান্তি তাহারা অক্ষুণ্ণ রাখিবে। গান্ধীজী তাঁহার অনশন ভঙ্গ করিলেন।

মহানগরী কলিকাতায় শান্তি-স্থাপনের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া গান্ধীজী ছুটিলেন দিল্লীতে। ইতিমধ্যে পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে অগণিত আশ্রয়প্রার্থী আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল দিল্লীতে। সেখানেও সুরু হইয়াছিল সাম্প্রদায়িক হানাহানি।

গান্ধীজী আবার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া গেলেন সেখানে—তাঁহার পণ, হয় তিনি এই সাম্প্রদায়িক হিংসার উন্মত্ততা লোপ করিবেন, নতুবা প্রাণত্যাগ করিবেন। চিরদিনকার সেই প্রতিজ্ঞা—'মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পাতন!' দিনের পর দিন তিনি দিল্লীর বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। অগণিত আশ্রয়প্রার্থীর এক শিবির হইতে অন্য শিবিরে গেলেন তিনি। শান্তি সান্ত্বনার প্রতিমূর্ত্তির সান্নিধ্য লাভ করিয়া অত্যাচারিতগণ সান্ত্বনা লাভ করিল।

কিন্তু রাজধানীর এখানে-ওখানে সাম্প্রদায়িক হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে থামিতেছে না ! গান্ধীজী যখন বুঝিলেন যে সমগ্র দেশের মানুষের মন সন্দেহের বিষে ও ভ্রাতৃবিরোধী হিংসার আগুনে নারকীয় পথ পরিগ্রহ করিয়াছে, তখন জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তিনি সুরু করিলেন অনশন (১৩ই জানুযারী ১৯৪৮) । তাঁহার এই অনশন-ব্রত গ্রহণে সমস্ত ভারত সচকিত হইয়া উঠিল। ভারতীয় নেতাগণ দিল্লীতে আসিয়া সমবেত হইলেন। হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তাঁহারা দেশের লোকেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক শুভবুদ্ধি ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। ছয়দিন তাঁহার এই অনশন স্থায়ী হইয়াছিল। ছয়দিন পরে তিনি উভয় সম্প্রদাযের মিলিত প্রতিশ্রুতি পাইয়া অনশন ভঙ্গ করেন।

নোয়াখালির পল্লী-পরিক্রমাকাল হইতে আরম্ভ করিযা জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত গান্ধীজীকে এইভাবে সাম্প্রদাযিক মৈত্রী স্থাপনের জন্য প্রাণপণ সাধনা করিতে হইয়াছে। ভারতের এখানে-ওখানে সাম্প্রদায়িক হিংসার উন্মত্ততায় তিনি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ভাবিযা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছেন। কিন্তু নিরুৎসাহ তিনি হন নাই। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শুভবুদ্ধি জাগাইয়া তুলিয়া তিনি এই সমযে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছুটিযা বেড়াইয়াছেন। সাম্প্রদাযিক শুভবুদ্ধি জাগাইবার জন্য তাঁহার ঐকান্তিকতা, অসীম কর্ম্মশক্তি এবং সাধনার সিদ্ধি সমগ্র জগৎকে স্তম্ভিত ও বিস্মিত করিযাছে।

ঊনষাট

জীবনের শেষ-অঙ্ক

মহাত্মাজীর জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কটি বড় মর্ম্মন্তুদ।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। গান্ধীজী তখন হরিজন-আন্দোলন ও অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের বাণী প্রচার করিতেছেন ভারতের বিভিন্ন স্থানে। তখন ২৫শে জুন, তিনি পুনা গিয়াছেন অস্পৃশ্যতা-বিষ সমাজদেহ হইতে বিদূরিত করিবার কথা প্রচার করিতে। তখন কতকগুলি ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তি বোমা নিক্ষেপ করিয়া গান্ধীজীর জীবননাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। গান্ধীজী সেসময়ে বলিয়াছিলেন যে, 'হরিজনদিগের কাছে আমি শপথ করিয়াছি যে, তাহাদের অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে আমি জীবন দান করিব। আজ যদি আমার জীবন যাইত, তাহা হইলে আমার শপথ যথাযথরূপে পালিত হইত।'

গান্ধীজী যখনই কোন গঠনমূলক কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন তখনই স্থূলদৃষ্টি-সম্পন্ন অদূরদর্শী তাঁহার দেশবাসীর মধ্য হইতে একশ্রেণী তাঁহার কার্য্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন—ইহা তাঁহার জীবনে অনেকবারেই দেখা গিয়াছে। অস্পৃশ্যতার পাপ দূর করিতে গিয়া তিনি যেমন বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, সাম্প্রদায়িক সমস্যা মিটাইতে গিয়াও তিনি তেমনই বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা সুরু হওয়ার পর হইতেই অনেকে এই আন্দোলনকে মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ, মুসলমানদিগের সহিত আপোষমূলক বলিয়া মনে করিতেছিলেন। তাহারই ফলে ১৯৪৮ সালের ২০শে জানুয়ারী তারিখে তাঁহার প্রার্থনা-সভার মধ্যে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয় তাঁহার জীবন-নাশের অভিপ্রায়ে। গান্ধীজী তখন প্রার্থনারত ছিলেন, প্রার্থনা-সভায় মিলনের বাণী প্রচার করিতেছিলেন তিনি। সৌভাগ্যবশতঃ তিনি অক্ষত থাকেন এবং অবিচলিত থাকিয়া, কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া তিনি প্রার্থনা-সভার কাজ সেইদিন যথারীতি সমাপন

করেন। পরদিবস প্রার্থনা-সভায় মহাত্মা সেই বোমা নিক্ষেপকারীর কথা উত্থাপন করিয়া বলেন—যেই এইরূপ করিয়া থাক, আমি তাহার মঙ্গল কামনা করিতেছি……তাহাকে বুঝাইয়া সৎপথে আনা উচিত।

কি অবিচলিত ধৈর্য্য আর সীমাহীন ক্ষমার পরিচয় তিনি দিলেন তাঁহার এই উক্তিটুকু করিয়া!

ইহার পরে যথারীতি তাঁহার শান্তির কার্য্য ও মিলনের প্রচেষ্টা দিল্লীতে চলিতে থাকিল। পাকিস্থান রাষ্ট্রের অন্তর্ব্বর্তী পাঞ্জাবের দুর্গত অঞ্চলে গিয়াও তিনি সেখানকার হিংসা উন্মত্ততার বিলোপ-সাধনের ব্রত গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পাকিস্থান সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করেন এই সময়ে। কিন্তু সে অনুমতি প্রাপ্তির পূর্ব্বেই একেবারে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহাব জীবনাট্যের পরিসমাপ্তি ঘটিল ৩০শে জানুয়ারী ১৯৪৮ সালে।

৩০শে জানুয়ারী। শেষ রাত্রিতে শয্যাত্যাগ করা তাঁহার চিরকালের অভ্যাস। সেই অভ্যাসমত তিনি ভোর না হইতেই উঠিযাছেন। প্রাতঃকৃত্য সমাপন হইয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে তাঁহার প্রার্থনা করা হইযা গেল। তিনি তাঁহার পার্শ্বচরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—আজ সব জরুরী চিঠিগুলি আমাকে দিবে। আমি সারাদিনে সেগুলির কাজ সারিযা ফেলিব।

কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে দিনটি কাটিয়া যাইতেছে। তাঁহাকে জানান হইল আমেরিকার বিখ্যাত সংবাদাতা মার্গারেট বুর্কহোযাইট তাঁহার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

মার্গারেট আসিলেন। তিনি শ্রদ্ধাভরে গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি সব সময়েই বলিয়া থাকেন, আপনি একশ' পঁচিশ বছর বাঁচিবেন। কিসে আপনার এমন আশা হইল?"

ম্লান হাসি হাসিয়া গান্ধীজী উত্তর দিলেন—"সে আশা আমি ত্যাগ করিয়াছি।"

বিস্মিতা মার্গারেট প্রশ্ন করেন—"কেন?"

গান্ধীজী বলিলেন—"সমগ্র বিশ্বে আজ ভয়াবহ ঘটনার ব্যাভিচার ঘটিতেছে।

অন্ধকারের মধ্যে আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাই না।" তাঁহার কণ্ঠস্বরে বেদনা, কথনভঙ্গিতে যেন অভিমান প্রচ্ছন্ন। ক্ষণিক নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন—"আমার সেবার প্রয়োজন যদি থাকে তবে আমি একশ' পঁচিশ বছরই বাঁচিব !"

জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে তাঁহার সেবার, তাঁহার পরামর্শের ও নির্দ্দেশের সত্যই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অদূরদর্শী, স্থূলদৃষ্টিসম্পন্নের কাছে মহাত্মাজীর জীবন ভারতের পক্ষে কতখানি প্রয়োজনীয় ছিল তাহা উপলব্ধি হইল না। ঐ দিবসই (৩০শে জানুয়ারী ১৯৪৮) অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটার সময়ে প্রার্থনাসভায় যাইবার পথে এক নরঘাতকের হাতে গুলিবিদ্ধ হইয়া এই বিরাট পুরুষ মহাপ্রয়াণ করিলেন। সমগ্র বিশ্বে শোকের ছায়া নামিল।

বুদ্ধদেবের অহিংসা, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম, যীশুর ক্ষমা, এই একটি মহা-মানবের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়া যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অহিংসা প্রেম ও ক্ষমার মূর্ত্ত প্রতীক সত্যাশ্রয়ী এই মানব-দেবতা হিংস্র আততায়ীর হস্তে প্রাণ দান করিলেন। সমগ্র বিশ্ববাসীকে এ ঘটনা শুধু শোকবিহ্বল করে নাই, স্তম্ভিতও করিয়াছে।

সমুদ্রমন্থনে সমুত্থিত বিষ পান করিয়া মহাদেব একদিন নীলকণ্ঠ হইয়া সৃষ্টিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। মৃত্যুকে বরণ করিয়া মহাত্মাজীও কি সেই পথ অনুসরণ করিলেন ? হিংসার বিষ কি নিঃশেষে গ্রহণ করিলেন তিনি ?

গান্ধীজীর এই জীবনাবসান ভারতবর্ষের এই বর্ত্তমানকে বহুকাল পূর্ব্বের অতীতের সহিত একসূত্রে গাঁথিয়া দিয়াছে। মহাভারতের যুগে এক ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য যিনি শরীর ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি জীবনের অপরাহ্ণ-কালে স্বজনগণকে পরস্পর-বিধ্বংসী আত্মকলহে মত্ত দেখিয়া মর্ত্ত্যলীলা উপসংহারের সঙ্কল্প করিয়া যোগমগ্ন হন এবং সেই অবস্থায় বাণবিদ্ধ হইয়া মহাপ্রয়াণ করেন। গুর্জরের ভূমিতে দ্বাপরযুগে যাহা ঘটিয়াছিল, যুগান্তরের গুর্জরের যুগাবতারের জীবনে তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিল। প্রায় দুই সহস্র

বৎসর পূর্ব্বে ক্ষমা ও প্রেমের আদর্শ' প্রচার করিতে গিয়া—প্রীতি ও মমতার বাণী প্রচার করিতে গিয়া ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্টের প্রাণবধে যে শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে মহাত্মাজীর জীবনাবসানে তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিল।

১৯২০ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাসে বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত ঘটিয়া গিয়াছে। এই ঘাত-প্রতিঘাত উত্থান-পতনের মধ্যে, সংশয় সঙ্কটের মধ্যে ভারতবাসী তাঁহার নির্দ্দেশের অপেক্ষায় রহিযাছে—নিশ্চিত বিশ্বাসে তাঁহার প্রতি চাহিয়াছে। তিনি প্রতিবারই সত্য ও অহিংসার আলোকবর্ত্তিকার দ্বারা ভারতবাসীদিগের পথ নির্দ্দেশ করিযাছেন। আজ সেই একটিমাত্র ব্যক্তির অভাবে এক বিরাট ও বিপুল শূন্যতার সৃষ্টি হইযাছে।

কিন্তু এই শূন্যতায় আমাদিগের অধীর হইলে চলিবে না। দুর্ভাগ্যের এই দুর্য্যোগতম অন্ধকারে দিক্‌ভ্রান্ত হইলে চলিবে না। গান্ধীজীর শিক্ষা—দুঃখ. বিরোধ, বিপদ, বিঘ্নের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে না। সেই শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হহয়া ভারতকে তাহার ভবিষ্যতের সংশয়-সঙ্কটের মধ্যে পথ দেখিতে হইবে, তাঁহার আদর্শের আলোক অতীতে ভারতের বহু সংশয়-সঙ্কট মোচন করিয়াছে। ভবিষ্যতেও সেই অহিংসা, ক্ষমা, প্রেম, মৈত্রী, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতির আদর্শ যদি আমরা অনুসরণ করি, তবেই আমরা তাঁহার অসমাপ্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করিযা তাঁহার প্রতি আমাদের যথাযোগ্য সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে পারিব, ভারতীয সভ্যতার অমৃতরূপ ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইবে।

ষাট

মর্ম্মাহত মানবসমাজ

বিজ্ঞানের কল্যাণে মহাত্মাজীর জীবন-অবসানের সংবাদ যখন মুহূর্ত্তকালমধ্যে সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িল, তখন নিখিল বিশ্ব শোকে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, বিশ্বের সকল দেশের মনীষী, রাজনীতিক, সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছিলেন অকপটে এবং ঐকান্তিকতার সঙ্গে। তাঁহাদের সেই শ্রদ্ধার বাণীতে এই কথাটাই আমরা বারংবার প্রতিধ্বনিত হইতে দেখিয়াছি যে, এই মহামানব মহাত্মার তিরোধানে শুধু যে ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি হইল তাহা নহে, সমগ্র পৃথিবী তাঁহাকে হারাইয়া যেন সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল।

পৃথিবীর ইতিহাসে, মানব জাতির ইতিহাসে কখনো এত মানুষ একটি মানুষের জন্য এমন করিয়া ক্রন্দন করে নাই। তাঁহার জীবনাবসানে সমস্ত বিশ্বে এই অনুভূতি সেদিন জাগিয়াছিল যে—আধুনিক হানাহানি ও হিংসার যুগে ঐ একটিমাত্র ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তি শান্তির দীপশিখাটিকে অনির্ব্বাণ রাখিয়া বিশ্বকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিবার একাগ্র সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার জীবনাবসনের সঙ্গে সঙ্গে সেই দীপশিখাটি নিভিয়া গেল। তাঁহার তিরোধানে বিশ্ববাসী মুহূর্ত্তে বুঝিয়াছিল যে, কী গভীর প্রভাব ক্ষুদ্রকায় মানুষটি বিস্তার করিয়াছিলেন জগৎবাসীর অন্তরে। তাই তাঁহার অমরলোকে প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে শোকাহত বিশ্ববাসীর মর্ম্মবেদনা স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগে উৎসারিত হইয়াছিল। আমরা এখানে মাত্র কয়েকজন মনীষীর ও রাজনীতিবিদের মর্ম্মবাণী উদ্ধৃত করিয়া এই মহামানবের বিচিত্র ও বহুমুখী সাধনার ইতিবৃত্তের উপসংহার করিতেছি :—

জর্জ্জ্ বার্ণার্ড শ

—ইংল্যাণ্ড

অত্যাধিক ভাল মানুষ হওয়া যে কত বিপজ্জনক, মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুই তাহার প্রমাণ।

পার্ল বাক

—আমেরিকা

মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর হস্তে নিহত হওয়ায় শুধু যে ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা নহে; উপরন্তু জনসাধারণের স্বাধীনতা-সংগ্রামের উপরও আঘাত হানা হইল। সকলে যখন বিশ্বের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবের তিরোধানে শোকাভিভূত তখন স্বাধীনতার শত্রুগণ উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে।

বিশ্বের শান্তি ও মৈত্রীই যাঁহাদের কাম্য তাঁহারা সকলেই এই বিচারবুদ্ধিহীন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য শোকাভিভূত হইয়া উঠিয়াছেন।

মহাত্মাজীর মৃত্যুর পর যে আদর্শাবলীর জন্য তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন, তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়তর সঙ্কল্প লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। মহাত্মাজীর সাম্প্রতিক অনশনের পর * ভারতের মর্য্যাদা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সহীদের প্রতি সম্মান এদেশে গভীর শ্রদ্ধায় পরিণত হইয়াছে। বিশ্বসঙ্কটে যখন গান্ধীজীকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন, ঠিক সেই সময়েই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। এক্ষণে ভারতবাসীর উপর সমস্ত নির্ভর করিতেছে।”

---

* ১৯৪৮ সালের ১৩ই জানুয়ারী সাম্প্রদায়িক শুভবুদ্ধি জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে অনশন।

পার্ল বাক আরও বলিয়াছেন :—

গান্ধীজীকে স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। যে কয়বার ভারতবর্ষে গিয়েছি প্রতিবারেই তিনি ছিলেন বৃটিশ কারাগারে। কিন্তু তিনি আমাদের অতি পরিচিত। আমার ছেলে-মেয়েরা পর্য্যন্ত তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনে। আমাদের কাছে তিনিই একমাত্র মহাপুরুষ—সত্যের পূজারী ও নির্ভীকতার প্রতীক। সত্যের জন্য তিনি আজন্ম যুদ্ধ করেছেন—তাঁর সত্য আজ আমাদের সত্য, জগতের সত্য।

গান্ধীজী আমাদের দেশে কতটা জনপ্রিয়—তা জান্‌তে পারলে ভারতবাসীর গর্ব্বের আর সীমা থাকবে না। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হবার ঘণ্টা-খানেক পরে রাস্তায় একটি কৃষিজীবির সঙ্গে দেখা হ'ল। সে বললে : পৃথিবীশুদ্ধ লোক জানে যে গান্ধীজী একজন মহাপুরুষ, তবে তাঁকে মারলে কেন ?

আমি নীরবে মাথা নাড়লুম, লোকটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে : "যীশু-খ্রীষ্টকেও ত লোকে এমনি করেই মেরেছিল।"

এই লোকটির মন থেকে যে কথার প্রকাশ হলো এইটেই সত্যকথা। গান্ধীজীর মৃত্যুর সঙ্গে ক্রাইষ্টের ক্রুশে প্রাণত্যাগ ছাড়া অন্য কোন ঘটনাই তুলনীয় নয। আজ তাঁর মৃত্যুতে কেবলমাত্র আমাদের গৃহ এই বিষাদপূর্ণ হয়ে যায়নি—সমস্ত পৃথিবী আজ নীরবে অশ্রুমোচন কর্‌ছে।

আজ ভারতবাসীর বোঝবার সময় এসেছে যে, তাদের দেশ আজ পৃথিবীর নিপীড়িত মানবের আশার প্রতীক। যারা স্বাধীনতার শত্রু তারা রটনা করেছে যে পৃথিবীর সব মানুষেরই স্বাধীন হবার অধিকার বা যোগ্যতা নেই। কিন্তু আমার মনে হয় ভারতের ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সর্ব্বহারাদের ভবিষ্যৎ। গান্ধীজীর উপর পৃথিবীর ভরসা ছিল—সকল শান্তিকামীর ভরসাস্থল ছিলেন তিনি। আমরা এই ছোট মানুষটিকে দেবতা বলে জানতুম না—কিন্তু একথা স্থিরভাবে জানতুম যে, এই নগ্নদেহ ছোট্ট মানুষটির কাছে সত্যের রূপ সম্পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গিয়েছে।

মিঃ এ্যাটলী

—ইংলণ্ডের প্রধান

"নৃশংসভাবে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করিবার সংবাদ সকলেই ভীতি-বিহ্বলচিত্তে শ্রবণ করিয়াছেন। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের তিরোধানে জনসাধারণের পক্ষ হইতে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

মহাত্মাজী বর্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব হইলেও, তাঁহাকে ইতিহাসে অন্য যুগের মানুষ বলিয়া মনে হইত।

কঠোর তপশ্চর্য্যায় জীবন যাপন করিতেন বলিয়া, তাঁহার স্বদেশবাসিগণ তাঁহাকে ঐশ্বরিক প্রেরণাসম্পন্ন মহামানবজ্ঞানে পূজা করিত। তাঁহার প্রভাব তাঁহার সমধর্ম্মীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সাম্প্রদায়িক বিরোধে জর্জরিত ভারতবর্ষে তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন।

প্রায় ২৫ বৎসরকাল সর্ব্ববিধ ভারতীয সমস্যা সমাধানকল্পে তিনি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত প্রতীক ছিলেন। কিন্তু তিনি কেবলমাত্র জাতীয়তাবাদীই ছিলেন না, বিদেশী শাসনের বিরোধিতায প্রধান অংশ গ্রহণ ব্যতীত তিনি পাশ্চাত্ত্যের বিরুদ্ধে প্রাচ্যের বিক্ষোভকেও অভিব্যক্ত করেন।

শান্তি ও মৈত্রী-মন্ত্রের উদ্গাতার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। কিন্তু এ বিষযে আমার কোন সন্দেহ নাই যে, তাঁহার আত্মা ভারতীযদিগকে সঞ্জীবিত ও উদ্বুদ্ধ করিবে।"

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান্

—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি

"গান্ধীজীর জীবন ও কার্য্যধারা তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি হইযা থাকিবে। তিনি ভারতের নেতা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আদর্শ ও কার্য্যাবলী বিশ্ববাসীর মনে

গভীর রেখাপাত করিয়াছে। যে শান্তি ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের জন্য মহাত্মা জীবন-পাত করিলেন, অগণিত বিশ্ববাসী তাহা হইতে প্রেরণা লাভ করিবে।"

জেনারেল স্মাট্‌স

—দক্ষিণ আফ্রিকা

"গান্ধীজী আমার সমসাময়িক একজন শ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন এবং আমাদের মধ্যে মত ও পথের পার্থক্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতাম। ৩০ বৎসর অথবা ততোধিক কাল আমাদের মধ্যে পরিচয় ছিল এবং তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ক্রমশই গভীরতা লাভ করিয়াছে।

একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ লোকান্তরিত হইলেন! আমরা ভারতের অপূরণীয় ক্ষতিতে ভারতীয়দিগের সহিত শোক প্রকাশ করিতেছি।"

ডি ভ্যালেরা

—আয়ার

"আমাদের দেশের এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ অধ্যায় প্রায় একইরূপ ছিল। অদ্য ভারতীয়েরা শোকসন্তপ্ত। তাহাদের দুঃখে আমরা সমবেদনা জানাই। যে নেতা তাহাদের জন্য স্বাধীনতা আনিয়াছেন, তাহারা তাঁহাকেই হারাইয়াছে। তাঁহার আত্মত্যাগ ভারতীয়দের মধ্যে সৌহৃদ্য আনয়ন করুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। এই সৌহৃদ্য-বন্ধন স্থাপনাই তাঁহার জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল।"

শ্রীঅরবিন্দ

"যে আলোকবর্ত্তিকা আমাদের স্বাধীনতার পথে পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছে, আমরা ঐক্যবদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা প্রজ্জ্বলিত থাকিবে। আমার একান্ত বিশ্বাস যে, ভবিষ্যতে এই জাতি একটি সুমহান্ ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড জাতিতে পরিণত হইবে। দুঃখবরণের দ্বারা যেভাবে স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইয়াছে, সেই-ভাবেই দেশের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে—শোচনীয় মৃত্যুর পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পরলোকগত সেই নেতার ছিল ইহাই একমাত্র চিন্তার বিষয়। বহু সংগ্রাম ও ত্যাগস্বীকারের দ্বারা আমরা যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছি, তাহা যেভাবেই হউক তাঁহার লক্ষ্যস্থলে আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিবে, স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠিত হইবে, একটি সুমহান্ ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী জাতি হইবে।"

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু

—যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর

"তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের হতাশ হইয়া হতোদ্যম হইয়া পড়িলে চলিবে না। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই শেষ হইয়া গিযাছে ইহা মনে করিলে চলিবে না। আমরাই তাঁহার বিরাট আদর্শের উত্তরাধিকারী। ব্যক্তিগত দুঃখ-প্রকাশের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এখন আমাদিগকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতে হইবে যে, যাহারা মহাত্মা গান্ধীকে অস্বীকার করিয়াছে, আমরা তাহাদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত আছি। আমরাই তাঁহার আদর্শের জীবন্ত প্রতীক, আমরাই তাঁহার সৈন্য। আমরাই পৃথিবীতে তাঁহার পতাকা বহন করিয়া লইয়া চলিব। সত্য, অহিংসা ও আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে আমরা অগ্রসর হইব। আমরা কি আমাদের নেতার পদচিহ্ন অনুসরণ করিব না? আমরা

কি মহাত্মা গান্ধীর সম্পূর্ণ বাণী জগৎকে প্রদান করিব না ? যদিও মহাত্মাজীর কণ্ঠস্বর আর কোনদিন শোনা যাইবে না। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে কি তাঁহার বাণী জগতে প্রচারিত হইবে না ? কেবলমাত্র আমাদের সময়েই নয় ভবিষ্যৎ যুগেও কি মহাত্মা গান্ধীর বাণী প্রচারিত হইবে না ?

মহাত্মা গান্ধীর নশ্বরদেহ ভস্মীভূত হইয়াছে, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু হয নাই। পৃথিবীর জনগণ তাঁহার নির্দ্দেশ ও অনুপ্রেরণা লাভের জন্য তাঁহাকে আহ্বান করায় যীশু খৃষ্টের ন্যায় তৃতীয় দিবসে তাঁহার পুনরুত্থান ঘটিয়াছে। দিল্লীতে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়া ঠিকই হইয়াছে। দিল্লীতে বহু রাজার শেষকৃত্য সম্পন্ন হইযাছে। মহাত্মা গান্ধী রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। অহিংসার পূজারীকে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার সম্মান দিয়া শেষকৃত্যের জন্য লইয়া যাওয়াও ঠিকই হইয়াছে। যে-সমস্ত সেনানায়ক যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদল পরিচালনা করিয়াছেন, তাহাদের সকলের অপেক্ষা এই ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তিটি অধিকতর শক্তিশালী ছিলেন। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহসী ছিলেন। যে বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ তাঁহার পরাধীন দেশকে স্বাধীন করিয়াছেন, দিল্লী তাঁহারই সমাধিক্ষেত্র হইবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছে। তাঁহার পরলোকগত আত্মা উত্তরাধিকারীদিগকে তাঁহার আরব্ধ কার্য্য করিযা যাইবার শক্তি দিন।”

স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার

“গান্ধীজীর প্রতি এই আক্রমণে আমি যে কিরূপ স্তম্ভিত হইয়াছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। একান্ত অবিশ্বাস্য ও অচিন্ত্যনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। এই যুগের এইরূপ নির্ম্মল, উন্নত ও আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তি যে এক উন্মাদের কবলে প্রাণ হারাইলেন, উহা দ্বারা ইহাই প্রামাণিত হয় যে, সক্রেটিসকে বা

যীশু খৃষ্টের যুগ হইতে আমরা বেশীদূরে অগ্রসর হই নাই। সক্রেটিসকে বিষ পান করিতে ও যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ হইতে হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী আর ইহজগতে নাই। তাঁহার দেহের নাশ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে সত্য ও প্রেমের ঐশ্বরিক আলো জ্বলিতেছিল, তাহা নির্ব্বাপিত করা যাইবে না।

মহাপুরুষদের জন্য এই পৃথিবী কবে নিরাপদ হইবে? সমস্ত পৃথিবী আজ এই শিক্ষাই লাভ করুক যে, হিংসা নিষ্ঠুরতা এবং বিশৃঙ্খলা পরিহার করিতে হইলে গান্ধীজীর নির্দ্দেশিত পথ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ নাই।”

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

“যে জ্যোতিঃ আমাদের মাতৃভূমিকে ভাস্বর করিয়া রাখিয়াছিল—সমগ্র বিশ্বের দুঃখ বেদনা ও তমসার মধ্যে সহস্র রশ্মি বিকীর্ণ করিয়াছিল তাহা অকস্মাৎ তিরোহিত হইল। মহাত্মা গান্ধীর এই তিরোধান ভারতের পক্ষে অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক। ভারতের স্বাধীনতার অগ্রদূত আত্মবিশ্বাসী অজাতশত্রু সর্ব্বজনপ্রিয় ও পূজ্য মহাত্মাজী নিজ সম্প্রদায়ের আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছেন—এই কলঙ্ক ও বেদনা রাখিবার স্থান নাই! মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রভাবের শুভ্ররশ্মিজাল কখনই তিরোহিত হইবে না, বরং কালে তাহা অধিকতর ভাস্বর হইয়া উঠিবে।

“আততায়ীর গুলি শুধু যে মহাত্মার নশ্বর-দেহকে বিদ্ধ করিয়াছে তাহা নহে, ইহা হিন্দুত্ব ও ভারতের বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে। স্থিরসঙ্কল্প লইয়া এই সকল হিংসাত্মক কার্য্য দূর করিতে পারিলে, তবেই হিন্দুত্ব ও ভারত রক্ষা পাইবে। দেশের প্রত্যেক স্থিরমস্তিষ্ক নাগরিক ও প্রত্যেক রাজনৈতিক দল একবাক্যে এই বর্ব্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করিবে। আমাদের প্রিয় নেতা অন্তরে যে অবিচল বিশ্বাস লইয়া জীবন যাপন ও জীবনোৎসর্গ করিলেন,

সেই বিশ্বাস লইয়া স্থির ও নির্ভীকচিত্তে আমাদিগকে নিদারুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইবে।

স্বাধীনতার শৈশবে আমাদের জাতীয় জীবনকে ধ্বংস করিতে যে অন্যায় ও অকল্যাণ রন্ধ্রপথ খুঁজিতেছে তাহা দৃঢ়হস্তে নিরোধ ও উচ্ছেদ করিতে হইবে। রাজনীতি ও ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়া সকল প্রকার প্রগতিশীল দলকে আগাইয়া আসিতে হইবে এবং বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করিতে হইবে।”

খান্ আবদুল গফুর খাঁ

—সীমান্ত প্রদেশ

দেশের এই চরম সঙ্কটে গান্ধীজীর মৃত্যু চরম দুর্ভাগ্যের। অন্ধকার এই অন্ধকারের দিনে তিনিই একমাত্র আলোকের পথ-প্রদর্শক ছিলেন। তাঁহার প্রেম সত্য ও অহিংসার বাণী আমাদিগকে পরিচালিত করিবে—আমি এই আশা পোষণ করি।

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

“বন্ধু ও সঙ্গীগণ, আমাদের জীবনের আলোক নির্বাপিত হইয়াছে—চতুর্দ্দিকে আজ অন্ধকার। আপনাদিগকে কি কথা বলিব, কেমন করিয়া বলিব, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের প্রিয় নেতা—আমাদের বাপু আর ইহলোকে নাই। আমরা তাঁহাকে বহু বৎসর ধরিয়া দেখিয়া আসিয়াছি, আর তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাইব না। পরামর্শ চাহিতে তাঁহার নিকট ছুটিয়া

যাইব না, সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিব না—এই ভীষণ আঘাত শুধু আমার নয়, লক্ষ লক্ষ দেশবাসীরও ; আমার বা আর কাহারও উপদেশে এই বেদনার লেশমাত্র উপশম হইবে না।

"আমি বলিতেছি আলোক নির্ব্বাপিত হইয়াছে। না, তবুও আমি ভুল বলিতেছি। এই দেশের উপর যে আলোকরশ্মি বিকীরণ হইয়াছে, তাহা সাধারণ আলো নয—বহু বৎসর ধরিয়া এই আলো দেশকে ভাস্বর করিয়া রাখিয়াছে এবং আরও অনেক বৎসর ধরিয়া রাখিবে। হাজার বৎসর পরেও এই আলোকরশ্মি দেশবাসী তথা বিশ্ববাসী দেখিতে পাইবে—অসংখ্য হৃদয়ে ইহাই সান্ত্বনা দিবে। এই আলো জীবন্ত সত্য ও শাশ্বত সত্য। ইহা আমাদিগকে সত্য পথ স্মরণ করাইয়া দেয—আমরা ভ্রান্ত পথ ত্যাগ করিয়া চলি।

"গত কয়মাস ও বৎসরে দেশে বহু বিষ ছড়াইয়াছে। এই বিষে দেশবাসীর মন জর্জ্জরিত। এই বিষ আমাদিগকে দূর করিতেই হইবে—আমাদের পথে যত বিঘ্ন বাধা আসুক না কেন, সমস্তই দূর করিতে হইবে। আমাদের প্রিয় শিক্ষাদাতা যেভাবে সমস্ত বাধা-বিঘ্নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, সেইভাবেই সংগ্রাম করিতে হইবে—উন্মাদ অথবা নিকৃষ্ট মনোভাব লইয়া নয়। প্রথম কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে—ক্রুদ্ধ হইয়া আমরা অন্যায ব্যবহার করিব না। আমাদিগকে বলিষ্ঠ ও স্থির-সঙ্কল্প মন লইয়া কাজ করিতে হইবে—আমাদের মহাশিক্ষক, শ্রেষ্ঠ নেতা যে নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন তাহা পালন করিব। আমার মনে হয়, আমরা যদি এই কথা স্মরণ রাখিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাই, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন এবং আমরা কোন হীন ব্যবহার না করিলে অথবা হিংসাত্মক কার্য্যে লিপ্ত না হইলে তাঁহার আত্মা শান্তি পাইবে।

"আমরা নিশ্চয়ই কোনোরূপ হিংসাত্মক কার্য্য করিব না। একথার অর্থ এই নয় যে, আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িব ; ইহার ফলে আমরা আরও শক্তিশালী হইব এবং আমাদের ঐক্য আরও সুদৃঢ় হইবে—আমরা সমস্ত সঙ্কটের সম্মুখীন

হইতে পারিব। আজিকার এই দুর্দিনে সমস্ত তুচ্ছ স্বার্থ, অসুবিধা ও দ্বন্দ্ব দূর করিয়া আমরা যেন মিলিত হইতে পারি। এই মহাসঙ্কটে আমরা জীবনের তুচ্ছতা ভুলিয়া গিয়া যেন মহৎ কিছুকে স্মরণ করিতে পারি; তাহা হইলে ভারতের পক্ষে মঙ্গল।

"আমরা যখন প্রার্থনা করিব, তখন যেন এই প্রার্থনাই করি যে, আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে সত্য ও দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য জীবনধারণ ও জীবনোৎসর্গ করিলেন তাহাই যেন আমাদের ব্রত হয়। ইহাই তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। বন্দেমাতরম্ : জয়হিন্দ্।"